Vol. 24 | No. 2 | 1981

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সাময়িকপত্রে সাহিত্যচিন্তা : সওগাত (২য় পর্ব)

Volume	24
Issue	2
Year	1981
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
Published online	June 1, 1981
DOI	10.62328/sp.v24i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v24i2.3
Pages	63-219
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Public ... Estd. 1820

সওগাত
সচিত্র মাসিক পত্র

দ্বিতীয় বর্ষ। | চৈত্র, ১৩২৬ | পঞ্চম সংখ্যা।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য-প্রসঙ্গ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৮। ফেকায়েতোল-মোছল্লিন্।

এখানি মুসলমান ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় পুঁথি। মুসলমানদের নিত্য কর্ম্ম রোজা, নমাজ প্রভৃতির কথা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

পুঁথিখানির আদি আছে কিন্তু শেষ নাই। ১ - ১০৩ ও ১১৬ পাতা বিদ্যমান, তারপর খণ্ডিত। সাদা বালি কাগজের দুই পিঠে লেখা। ১৪ × ১২ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজ। আকার দেখিয়া বোধ হয়, ইহা বড় বেশীদিন পূর্ব্বের নকল নহে। অক্ষরগুলি একটু অদ্ভুত ধরণের। সহজে পড়া যায় না। গ্রন্থের দুর্ব্বোধ্য [illegible] বাঙ্গালা কিনা, সহজে বুঝা কঠিন। তারিখাদি নাই। রচয়িতার নাম (সেখ পরাণ-রতন) হোইতেছে।

আরম্ভ—

বিচমিল্লা হিরহ্‌মা নিরহিম।
আল্লাহ মোহাম্মদ নবি।
আউলে আখেরে জান যাকি প্রকৃতে।
রাব্বইস (আখরাইজ) রাখনা (বসা?)
হোঁয়সে (হোয়ে) রহিত [illegible]।

প্রথমে আল্লার নাম করিলাম আগায়।
সেই জান এক আল্লা ত্রিজগত মাঝ॥
রহমান কবি নাম ধরিছে (ধরিছে) আপনে।
এহি নাম মরহ্ (অর্থ) কহি মূল মর্ম্ম মনে।

ভণিতা— কিপাইত মছল্লিন মন দিয়া মন।
সরবাসে (বরভাসে) কহে সেখ পরাণ-রতন।

আমার "প্রাচীন পুঁথির বিবরণে" ১২৮ ও ৪৭১ সংখ্যক পুঁথিদ্বয়ে এই পুঁথির বিশেষ বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য। খোন্দকার সেমত উল্লা সাহেবের আদেশে ইহা বিরচিত হয়। বলা বাহুল্য, ইহা পারস্য গ্রন্থের অনুবাদ। ইহার পিতাও একজন কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। (১৮ ও ১৯ সংখ্যক পুঁথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

১৯। সও (সত্য?) জ্ঞান-প্রদীপ।

খণ্ডিত ধরণের পুঁথি। মোট ৬১ পৃষ্ঠা। নষ্টপ্রায় তুলোট কাগজের কাগজ। দুই পিঠে লেখা; ধারে গোলা বা গোলত পীর বক্তা, চাঁদ নামক তাঁহার

সওগাতের একটি পৃষ্ঠা

সাময়িকপত্রে সাহিত্যচিন্তা : সওগাত

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

[চব্বিশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশের পর]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব

'সওগাতে'র ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলি প্রধানতঃ ভাষার উৎপত্তি ও গতি প্রকৃতি বর্ণনা, ভাষার ব্যবহার-বৈচিত্র্যনির্দেশ উপভাষা পরিচয়, ব্যাকরণ ও ভাষা-সংস্কারমূলক। মূলতঃ প্রাবন্ধিকদের অভিজ্ঞতা ও অভিমতের ভিত্তিতে রচিত বলে এসব প্রবন্ধ, নানা মাত্রিকতা সত্ত্বেও, সমকালীন ভাষা-চিন্তার পরিচয়-বিধৃত। সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধাবলীতেও প্রসঙ্গতঃ ভাষা-ব্যবহারের কথা উত্থাপিত হয়েছে ; ঐ প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এই পরিচ্ছেদে শুধুমাত্র ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলি উপস্থাপন করছি।

সওগাতে ভাষাবিষয়ক প্রথম প্রবন্ধ লেখেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। ১:৩, মাঘ ১৩২৫ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধের নাম 'চট্টগ্রামের কথ্য (প্রচলিত) উপভাষা'। পরে এ বিষয়ে 'ইসলামাবাদ' শিরোনামে তিনি ধারাবাহিক রচনা প্রকাশ করেন (পৌষ, মাঘ, ফাল্গুণ ও চৈত্র ১৩২৬, কার্তিক ১৩২৭)। প্রবন্ধে মূলতঃ তিনি চট্টগ্রামী উপ-ভাষার শব্দরূপ আলোচনা করেছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন উপভাষার যে দৃষ্টান্ত-পরিচয় তিনি উদ্ধৃত করেছেন (২:৫, চৈত্র ১৩২৬) তা জর্জ গ্রীয়ার্সন অনুসারী। আবদুল করিমের বাংলা উপভাষা-শ্রেণীকরণ তাঁর ভাষায় 'দেশ ভেদে বঙ্গ ভাষার বিভিন্নতা' (২:৪, ফাল্গুণ ১৩২৬)—ও ঐ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হল :

''বঙ্গভাষার বিস্তৃতি।

বঙ্গভাষা একটা সজীব ভাষা। উহা এখন নিয়তই পরিবর্দ্ধনশীল এবং খরপ্রবাহে ধাবিত। রবীন্দ্রনাথের অলোক-সামান্য প্রতিভাবলে উহা আজ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাষা রাজ্যে আসন পরিগ্রহ করিয়াছে। সুতরাং উহার বিরাম কোথায় গিয়া হইবে, তাহা বলা অত্যন্ত শক্ত। ইদানীং ইহা সমগ্র বঙ্গদেশ এবং আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্ট ও কাছাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সকল স্থানে প্রায় ৪১,৬৯৬,৩৪৩ লোকে এই ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন অনেক বঙ্গভাষাভাষী লোক বঙ্গের বাহিরে—ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে বাস করে। তাহাদিগকেও হিসাবে ধরিলে সমগ্র ভারতে বঙ্গ ভাষাভাষীর সংখ্যা ৪২,০৩২,৩২৯ জন পাওয়া যায়।

দেশভেদে বঙ্গভাষার বিভাগ।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদের বঙ্গভাষা একটা বহুদূর-প্রসারী বিরাট ভাষা। এরূপ একটা বিরাট ভাষা যে সব দেশে একরূপ হইবে, ইহা কেবল সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে, অস্বাভাবিকও বটে।

ফলতঃ বঙ্গের বহু জেলার ভাষাই অল্পাধিক বিকৃতি প্রাপ্ত এবং পরস্পর হইতে পৃথক ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অথচ এরূপ পার্থক্যের মধ্যেও কয়েক জেলার ভাষার সহিত অপর কয়েক জেলার ভাষার একটা সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। সেই সমাঞ্জস্য অসামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ দেশভেদে বঙ্গভাষাকে নিম্নলিখিত সাতটি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন :—

১। আদর্শ বাঙ্গালা (Central or Standard dialect.)

শিক্ষিত লোকে সাধারণতঃ যে ভাষায় কথা বলে, তাহাই 'আদর্শ বাঙ্গালা'। কলিকাতা, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুরসিদাবাদ, বর্দ্ধমানের কতক অংশ (কাটোয়া) ও মেদিনীপুরের কতক অংশ (ঘাটাল ও তমলুক)—এই সকল দেশের ভাষা 'আদর্শ বাঙ্গালা' বলিয়া পরিগণিত। বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বাঞ্চলে প্রায় ৩১৯,৫৮৬ লোকে এবং মেদিনীপুর জেলার পূর্ব্ব ও উত্তরাঞ্চলে প্রায় ১,৫০৬,১০টি লোকে এই 'আদর্শ বাঙ্গালা' ব্যবহার করে। এই সকল স্থানে মোট আদর্শ বাঙ্গালা ভাষাভাষীর সংখ্যা ৮,৪০৩,৯৯৬ জন বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

২। পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙ্গালা।

বর্দ্ধমানের কতক অংশ, বাঁকুড়া, বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, সিংভূম, উড়িষ্যার অন্তর্গত ময়ূরভঞ্জ ও কিয়ঞ্জর রাজ্য এবং রাঁচি—এই সকল দেশের বাঙ্গালা, 'পশ্চিম বঙ্গীয় বাঙ্গালা' বলিয়া পরিগণিত। রাঁচিতে যে বাঙ্গালা প্রচলিত, তাহাকে 'খোট্টা বাঙ্গালা' বা 'সরাকী বাঙ্গালা' বলে। মানভূমের দক্ষিণ দিগ্বর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে যে সকল পাহাড়ী জাতি বাস করে, তাহাদের ভাষা 'খাড়িয়া ঠার' বা 'পাহাড়িয়াঠার' নামে কথিত। সাঁওতাল পরগণায় 'মাল পাহাড়িয়া' নামক পার্ব্বত্যজাতির ভাষা 'মাল পাহাড়িয়া ভাষা' নামে পরিচিত। এই সকলস্থানে মোট পশ্চিম বঙ্গীয় বাঙ্গালা ভাষা-ভাষী লোকের সংখ্যা ৩,৯৫২৫৩৪।

৩। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গীয় বাঙ্গালা।

মেদিনীপুর জেলার কতেক অংশের (মধ্যমাংশের) বাঙ্গালা ভাষা 'দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙ্গালা' বলিয়া পরিগণিত। মোট ৩৪৬,৫০২ জন লোকে এই ভাষা ব্যবহার করে।

৪। উত্তরবঙ্গীয় বাঙ্গালা।

রাজসাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, মালদহ (পূর্ব্বাংশে) ও পূর্ণিয়া (পূর্ব্বোত্তরাংশে) এই সকল দেশের বাঙ্গালা 'উত্তরবঙ্গীয় বাঙ্গালা' বলিয়া পরিগণিত। মালদহ জেলাও আবার বহুভাষার সঙ্গম-ক্ষেত্র। তথায় বাঙ্গালা, বিহারী, সাঁওতালী, কোচ-বাঙ্গালী ও অন্যান্য কয়েকটি ভাষা শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ণিয়া জেলার শ্রীপুর পরগণায় যে বাঙ্গালা প্রচলিত, তাহা 'শ্রীপুরিয়া বাঙ্গালা' এবং কিষণগঞ্জে যে বাঙ্গালা ব্যবহৃত, তাহা 'কিষণগঞ্জিয়া বাঙ্গালা' নামে পরিচিত। এখানে বাঙ্গালা বর্ণমালার পরিবর্ত্তে কাইমি বর্ণমালা প্রচলিত। মুসলমান, কোচ ও কুরারিয়া নামক পাহাড়ী জাতি উক্ত ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। প্রাগুক্ত স্থানসমূহে মোট ৬,১০৮,৫৫৩ জন লোকে উত্তর বঙ্গীয় বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করে।

৫। রাজবংশী বাঙ্গালা।

জলপাইগুড়ী, রংপুর, কোচবিহার রাজ্য ও দারজিলিংএর কতক অংশ এবং আসামের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া—এই কয়টি দেশের বাঙ্গালা 'রাজবংশী বাঙ্গালা' নামের অন্তর্গত। রাজবংশীরা মূলতঃ কোচ জাতি। তাহারা ধর্ম্মে হিন্দু। তাহাদের বংশীয়েরা অদ্যাপি কোচ-বিহারে রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন। এক সময়ে তাহারাও রাজবংশীয় ছিল বলিয়া 'বাজবংশী' নামে খ্যাত। তাহাদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান হইয়া গিয়াছে, কিন্ত এখনও তাহাদের সেই 'রাজবংশী' নাম বজায় আছে। কোচেরা ব্রহ্মপুত্র নদ উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া এ দেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। এজন্য তাহাদের ভাষার সহিত পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষার অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, রাজবংশী জাতিরা ব্যবহার করে বলিয়াই তথাকার বাঙ্গালা 'রাজবংশী বাঙ্গালা' নামে খ্যাত। কখন কখন ইহাকে 'রংপুরী বাঙ্গালা'ও বলা হইয়া থাকে। দারজিলিংএর তরাই অঞ্চলে যে বাঙ্গালা প্রচলিত, তাহা 'বাহে বাঙ্গালা' নামে পরিচিত। এই সকল স্থানে মোট রাজবংশী বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা ৩,৫০৯,১৭১ জন।

৬। পূর্ব্ববঙ্গীয় বাঙ্গালা।

ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, বাকরগঞ্জ, ফরিদপুর, নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত সন্দ্বীপ, যশোহর, খুলনা, শ্রীহট্ট ও কাছাড়—এই দেশসমূহের বাঙ্গালা 'পূর্ব্ববঙ্গীয় বাঙ্গালা' বলিয়া পরিগণিত। লোকসংখ্যার অনুপাতে বঙ্গীয়-ভাষা-রাজ্যে ইহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিতে হয়। ফরিদপুর (দক্ষিণাঞ্চল ব্যতীত), যশোর ও খুলনার ভাষা অনেকটা আদর্শ বাঙ্গালার কাছাকাছি, এজন্য এই দেশত্রয়ের ভাষাকে 'পূর্ব্ববঙ্গীয় আদর্শ বাঙ্গালা' বলিলেও বলা যাইতে পারে। এইরূপ ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ৪,৮৫৫,৩১ জন। ময়মনসিংহের অন্তর্গত হাইজঙ্গে যে ভাষা প্রচলিত, তাহা 'হাইজঙ্গ ভাষা' নামে কথিত। ফরিদপুরের দক্ষিণাঞ্চলে খাঁটি পূর্ব্ববঙ্গীয় বাঙ্গালা প্রচলিত। এই সকল স্থানে সাকল্যে ১৬,৯২০,৬০১ জন লোকে পূর্ব্ববঙ্গীয় বাঙ্গালা ব্যবহার করিয়া থাকে।

শ্রীহট্টের পূর্ব্বাঞ্চলে যে ভাষা প্রচলিত আছে, তাহা 'ছিলিটীয়া বাঙ্গালা' নামে পরিচিত। কাছাড়ের ভাষাও তদ্রূপ 'কাছাড়ী বাঙ্গালা' নামে কথিত হয়। নামে যাহাই হউক, এই দুই দেশের ভাষাও পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষার প্রায় অনুরূপ। শ্রীহট্টে বাঙ্গালা বর্ণমালা ব্যবহৃত হয় না। তথায় যে বর্ণমালা প্রচলিত, তাহা 'ছিলটীয়া নাগরী' নামে পরিচিত।

পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান-সংখ্যার আধিক্যবশতঃ তাহাদের কথিত ভাষাকে কেহ কেহ 'মুসলমানী বাঙ্গালা' নামে বিশেষিত করিয়া থাকেন। ঐ নামে যদি সমস্ত বঙ্গের মুসলমানের ভাষা বুঝা যাইত, তাহা হইলেই উহা সুপ্রযুক্ত হইত। কিন্ত তাহা যখন বুঝায় না, তখন ঐরূপ নাম দেওয়া ঠিক নহে। তবে মুসলমান ধর্ম্মের প্রাবল্য হেতু পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় আরবী ও পারসী শব্দের সংমিশ্রণ খুব বেশী, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

৭। দক্ষিণ পূর্ব্ববঙ্গীয় বাঙ্গালা।

নোয়াখালী (সন্দ্বীপ ব্যতীত), চট্টগ্রাম, আকিয়াব (উত্তরাংশে) ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম—এই দেশ চতুষ্টয়ের বাঙ্গালা 'দক্ষিণ-পূর্ব্ববঙ্গীয় বাঙ্গালা' নামের অন্তর্গত।

এই ভাষা বঙ্গের অন্য স্থানবাসী লোকের পক্ষে একান্ত দুর্ব্বোধ্য বিবেচিত হইয়া থাকে। অনেকে চট্টগ্রামের ভাষাকে 'চাটগাইয়া ভাষা' নামে অভিহিত করে, কিন্তু ঐরূপ ভাষা যখন শুধু চট্টগ্রামে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া মেঘনা নদীর মোহনাস্থিত অধিকাংশ দ্বীপে (সন্দীপ ব্যতীত) ও নোয়াখালী জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তখন উহাকে উক্ত নামে আখ্যাত করা ঠিক নহে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের চাক্‌মাদিগের ভাষা চট্টগ্রামের ভাষারই একটা ক্ষুদ্র শাখাস্বরূপ পরিগণিত। মোট ২,৩১০,৭৮৪ জন লোকে এই দক্ষিণ-পূর্ব্ববঙ্গীয় বাঙ্গালা ভাষা ব্যহার করে।''

মোজাম্মেল হকের 'ভাষার উৎপত্তি ও সাহিত্যের গতি' (১:৩, মাঘ ১৩২৫) প্রবন্ধ বাঙালী মুসলমানদের সাহিত্যরচনায় শব্দব্যবহার বিষয়ক আলোচনা। প্রবন্ধের প্রথমাংশ : সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পটভূমি, শেষাংশ মূল প্রাসঙ্গিক। মোজাম্মেল হকের মূল বক্তব্য নিম্নরূপ :

''...সাহিত্যের এক অভিনব যুগ আসিয়া পড়িয়াছে। ভাষার গতি দোটানায় পড়িয়াছে। এক দিকে কতকগুলি লেখক সংস্কৃত ভাষার শব্দ সংযোগে গ্রন্থাদি লিখিয়া ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে প্রস্তুত, অন্য দিকে আর এক দল সাধু ভাষার মধ্যে সাদাসিধে শব্দ ব্যবহার করিয়া এবং কেহ কেহবা চিরপ্রচলিত বানানগুলির মাথা খাইয়া খিচুড়ী পাকাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের এ কথার প্রমাণ স্বরূপ আমরা পাঠকগণকে প্রবাসী ও সবুজপত্র পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। দেখিবেন, অনেক প্রবন্ধে কথিত ভাষার শব্দ কিরূপ অধিক ভাবে প্রবেশ করান হইয়াছে এবং অনেক শব্দের বানান কিরূপ পরিবর্ত্তন ও ব্যাকরণের মাথা খাওয়া হইয়াছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, আমাদের মুসলমান লেখকগণ এই দো-টানা স্রোতের কোন্ দিকে অঙ্গ ঢালিয়া দিবেন? ভাষার এই উভয় গতির কোনটী পসন্দ করিয়া আমাদের গ্রহণ করা উচিত? আমি বলি, ইহার একটীও নহে। তবে প্রথমোক্ত দলের ভাষা কতকটা পসন্দসই বটে, কিন্তু শেষোক্ত দলের ভাবটা একেবারেই না পসন্দ। কেন না ব্যাকরণের নিয়ম-বহির্ভূত শব্দ স্থাপনে বঙ্গ-ভাষার যে মূর্ত্তি হইবে এবং হইতেছে, তাহাতে লিখিত ও কথিত ভাষায় পার্থক্য থাকিতেছে না, মুড়ী মিছ্‌রি এক সঙ্গে মিশিয়া এক বিকট রসের উৎপত্তি করিতেছে ও করিবে। শাসন থাকিবে না। শিক্ষকের শাসন না থাকিলে যেমন ছাত্রেরা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করে, রাখালের শাসন না থাকিলে যেমন গো-পাল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি বঙ্গভাষা অশাসনে পড়িলে যাহার যাহা মনে আসিবে, সে তাহাই লিখিতে আরম্ভ করিবে। তখন লেখা ও বলার ভাষা এক হইয়া যাইবে, মুড়ী মিছুরি, কাঁচ-কাঞ্চন সমান দরে বিকাইবে; তাই বলিতেছি, এরূপ হওয়া কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। কেন না সভ্যজাতিমাত্রেরই ভাষা লিখিত ও কথিত ভেদে দ্বিবিধ। কথিত ভাষার শাসন নাই, লিখিত ভাষা ব্যাকরণের নিয়মে শাসিত। জগতের যে কাজ শাসনের নিগড়ে নিবদ্ধ, তাহাই সুন্দর—সুচারু, শৃঙ্খলা-সম্পন্ন। যদি তাহাই হয়, তবে সাধ করিয়া ভাষাটাকে বিকৃত বা জগা খিচুরী বানান বুদ্ধিমানের কাজ নহে।

তবে এখন আমাদের কোন্ পথ অবলম্বন করা উচিত? একজন মনস্বী পণ্ডিত বলিয়াছেন—'যাহা চলিয়াছে, তাহা চলুক।' যদি কথাটী লিখিত ভাষায় যাহা পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিয়াছে, তাহাই চলুক, এই ইঙ্গিতে বলা হইয়া থাকে, তবে তাহা অনুমোদনীয় হইতে পারে, নতুবা নহে। আমার বোধ হয়, লিখিত ভাষার দিকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার এই ইঙ্গিত। লিখিত বাঙ্গালা ভাষায় আরবী, পারসী ও উর্দ্দু ভাষার যে সকল শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়া আসিয়াছে, এবং যে শব্দগুলি বাঙ্গালা ভাষায় বেশ খাপ খায়, সেই শব্দগুলি

এখন বাদ দিয়া জটিল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে ভাষাকে দুর্ব্বোধ্য করিতে কতকগুলি হিন্দু লেখক যত্নবান। আমার ন্যায় অনেকেই ইহার পক্ষপাতী নহেন। তাই বলিয়া আমি যে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের বিপক্ষ, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। যে সকল সংস্কৃত শব্দ প্রাঞ্জল ও সহজ ভাবপ্রকাশক, যাহা ব্যবহারে ভাষাটা মধুর, কোমল, সুন্দর ও গুরুত্ব-ভরা হয়, সে সকল শব্দ ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমাদের কোন্ পথে চলা উচিত, ইহার উত্তর সকলে অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন। আর এ উত্তর বোধ করি, অনেকেরই অনুমোদিত হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে শেষে একটা কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। আমাদের ইসলামিক শব্দ দিয়া বঙ্গভাষার অঙ্গ-শোভা বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য বোধে কেহ যেন জোর করিয়া অপ্রচলিত আরবী পারসী শব্দ ব্যবহার করিয়া ভাষাকে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের ন্যায় কঠোর বা অশ্রাব্য না করিয়া ফেলেন। ইহাই আমার শেষ নিবেদন।"

মোজাম্মেল হকের এই প্রবন্ধের সূত্রে বিস্তৃততর আলোচনা করেন ও. আলি তাঁর 'পথ কোন্ দিকে' প্রবন্ধে (১:৫, চৈত্র ১৩২৫)। ও. আলির সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ :

"প্রথমত :—বাঙ্গালা ভাষার বর্ণমালায় তালব্য শ দন্ত্য স ও মূর্দ্ধণ্য ষ এই তিন প্রকার সকার দেখিতে পাওয়া যায় এবং বঙ্গ ভাষায় ঐ তিনেরই ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কিন্তু বাঙ্গালীর রসনায় ঐ তিনের বিভিন্ন উচ্চারণ শুনিতে পাওয়া যায় না। কারণ 'তাহাদের রসনা ষত্ব ণত্ব স্বীকার করে না,' এই জন্য হিন্দু লেখকগণ আমাদের ইসলামিক শব্দ-গুলি যে ভাবে মুখে উচ্চারণ করেন, কাগজ কলমেও সেই ভাবে লিখিয়া থাকেন, তাহা যে সম্পূর্ণ ভুল ও সর্ব্বথা পরিত্যজ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। যে সমুদায় ইসলামিক শব্দ ش অক্ষর যোগে উৎপন্ন হইয়াছে, তৎসমুদায় তাঁহারা দন্ত্য স যোগে লিখিয়া থাকেন। যেমন সেক, সাদী, সাহ, বাদসা, চসমা, বদমাইস, সয়তান, সাধক, পেস্কার, সেরেস্তা, খুসী ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের রচনা ত' সেরূপ নয়? তবে কেন আমরা ঐ সকল শব্দ লিখিবার সময় তালব্য শ যোগে লিখিব না? আমাদের রসনা আরবী ভাষার প্রত্যেক অক্ষরের শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে বিশেষ সমর্থ। এতদ্ভিন্ন আমাদের আরবী বা পার্শী অভিধানরূপ কষ্টি পাথর রহিয়াছে, তাহাতে কষিলে শব্দের শুদ্ধতা বা খাঁটিত্ব সহজেই উপলব্ধি হইবে। আমরা ঐ সমুদয় শব্দ শুদ্ধভাবে লিখিলে হিন্দু লেখকগণ আমাদের পথ অনুসরণ করতঃ শুদ্ধ বানান লিখিতে শিখিবেন। আবার যেখানে দন্ত্য স হওয়া উচিত, সেখানে তাঁহারা ষ চালাইয়া থাকেন। যেমন জিনিষ, আসমান, আষবাব ইত্যাদি। ইহা আমাদের অনুকরণীয় নহে। এরূপ স্থলে স ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য, কারণ, প্রকৃত ষ ইস্‌লামিক ভাষায় নাই।

দ্বিতীয়ত :— বঙ্গভাষার অসম্পূর্ণতা বশতঃ অনেকগুলি অক্ষর ইহার বর্ণমালায় নাই। আরবী পারসীতে যেমন ز বা ظ রহিয়াছে অথবা ইংরেজীতে Z যেমন রহিয়াছে, বাঙ্গালায় তেমনটি নাই। অথচ ঐ আরবী ز, ظ বা ইংরেজী Z অক্ষর বিশিষ্ট বহু আরবী, পারসী ও ইংরাজী শব্দ বঙ্গভাষায় বহুদিন হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে এবং সেগুলি 'বেশ খাপ খাওয়া' গোছের হইয়া গিয়াছে! যেমন জমি-জিরাত, বাজার, মতলব, গুলজার ইজ্জত, জখম, কাগজ, রাজি, বজ্জাত, পাজি, হুজুর, হাজির, নজর, নাজির, মোজা ও জল ইত্যাদি আরবী শব্দ, এবং ডজন, সাইজ, প্রাইজ, লজেঞ্জ, জেব্রা, জেপলিন, গেজেট, ব্রঞ্জ ইত্যাদি ইংরাজি শব্দ। এই সকল শব্দ শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে হইলে কেবল মাত্র 'জ' দ্বারা হয় না। এজন্য হিন্দি ভাষায় একটি উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। দেবনাগরী

বা কায়েথী অক্ষরে লিখিত হিন্দি ভাষায় উল্লিখিত রূপ শব্দ প্রয়োগ করিতে হইলে 'জ' এর নিম্নে একটি বিন্দু বা নোক্তা বসাইয়া দেয় এবং পড়িবার সময় সাধারণ জ ও জ এর বৈশিষ্ট্য রক্ষা হয় এবং উচ্চারণও শুদ্ধ হয়। যাঁহারা হিন্দি ভাষা জানেন, তাঁহারা আমার কথার সারবত্তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন

বাঙ্গালা ভাষাতেও আমাদিগকে এরূপ একটা পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। আমার মতে 'জ' এর নিম্ন ভাগে বিন্দু না বসাইয়া উহার উপরি ভাগে বসান উচিত যথা জ। এতদ্বারা কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, উপরি ভাগে যে বিন্দু থাকিবে তাহা চন্দ্রবিন্দুর ভ্রম জন্মাইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় কেবলমাত্র বিন্দু বসাইয়াই চন্দ্র বিন্দুর কাজ সারা হয় না, এতৎ প্রসঙ্গে ق, غ এবং خ র আবদার ও দাবী দাওয়াটাও নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে. তবে উহা আপাততঃ মুলতবী রাখিলেও চলিতে পারে।

তৃতীয়তঃ—যে সকল আরবী শব্দ خ (খ) অক্ষর যোগে সম্পাদিত হইয়াছে, সেগুলি বাঙ্গালার খ স্থানে ব্যবহৃত হইয়া চলিয়াছে যথা—বক্ত, বক্তিয়ার, কমবক্ত, বক্সিস, শেক, তক্তাপোষ, রহিমবক্স ইত্যাদি এরূপ লেখা উচিত নহে, খ দিয়াই লেখা উচিত যথা—বখ্‌ত, বখ্‌তিয়ার, বখ্‌শীশ ইত্যাদি। সেইরূপ ফ স্থানে প চালা [ঠিক] নয় যেমন—মাপ, বেকুব ইত্যাদি না লিখিয়া তৎস্থলে মাফ্, সাফ্, বেকুফ ইত্যাদি লেখা আমাদের উচিত এবং শ্রেয়ঃ।

চতুর্থতঃ—বঙ্গভাষার বর্গ্য জ ও অন্তঃস্থ য এর আকারগত পার্থক্য থাকিলেও ব্যবহার গত অতি অল্প পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সেই জন্য, কাজ, কায, যো, জো, যামী, জামী উভয় প্রকারেই লিখিত হইতে দৃষ্ট হয়। এরূপ স্থলে কেবল জ ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট হয় এবং Consisting থাকে। প্রাকৃত 'কজ্জ' শব্দ হইতে যে 'কাজ' হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

পঞ্চমতঃ—হ্রস্ব ই কার ও দীর্ঘ ঈ কারের স্থায়িত্ব বঙ্গভাষায় দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উহাদের ব্যবহারের নিতান্ত যথেচ্ছাচারিতা পরিলক্ষিত হয়। বেশী, বেশি, বাকি, বাকী, আমদানি, আমদানী, রজনি, রজনী, কি, কী, উভয় প্রকারেই লিখিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালীর রসনা যদিও হ্রস্ব ও দীর্ঘ ই কার উ কারের পার্থক্য স্বীকার করিতে চাহেনা, তবে কেবলমাত্র ই কার চালাইলেই ত বিড়ম্বনা হয় না অথচ পথটাও সরল হয়।''

শেখ বসিরউদ্দিন আহমদের 'স্বদেশীয় ভাষা অনুশীলনের ফল' (২:২, পৌষ ১৩২৬) মাতৃভাষার চর্চার বিকল্পহীনতা বিষয়ক প্রবন্ধ। পৃথিবীর নানা দেশের উন্নতি ও সে ভাষার সাহিত্যসেবীদের প্রসঙ্গ আলোচনা করে উপসংহারে প্রাবন্ধিক লিখেছেন:

''…জগতে যত কবি অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই স্বদেশীয় ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন এবং তদনুশীলনেই তাঁহাদের প্রতিভার জ্যোতিঃ জগন্ময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। অদ্যাবধি কোন কবিই মাতৃভাষানভিজ্ঞ হইয়া পরকীয় ভাষাতে আদর্শ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া দেখা যায় না। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ভাষা অনুশীলন করিয়া তাহার ভাব মাতৃভাষার অঙ্গীভূত করতঃ বিখ্যাত কবিগণ জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। মাতৃভাষা জাতি-হৃদয়ে অতি সহজেই কার্য্যকরী ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে। বেদব্যাস, বাল্মিকী, কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, বাণভট্ট প্রভৃতি কবিবৃন্দ

স্বদেশীয় ভাষাতেই গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। যদি তাঁহারা স্বদেশী ভাষানুশীলনে বিরত থাকিয়া বিদেশীয় ভাষায় গ্রন্থ লিখিতেন, তাহা হইলে কি তাঁহারা অমর হইতে পারিতেন, তাঁহাদের প্রতিভারশ্মি ভুবন আলোকিত করিতে পারিত কি?

স্বদেশীয় ভাষায় যত অল্প কথায় সুললিত ভাবে মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারা যায়; পরকীয় ভাষায় সেরূপ সম্ভবপর নহে। মাইকেল মধুসূদন প্রথমে ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় পিপাসা শান্তিলাভ করিতে পারে নাই; অতঃপর তিনি যখন হইতে স্বদেশীয় ভাষার অনুশীলন করিতে লাগিলেন তখন হইতেই তাঁহার প্রতিভার অপূর্ব্ব বিকাশ আরম্ভ হইল, সাহিত্য-ভাণ্ডারে দরিদ্র বঙ্গবাসী কতকগুলি, অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। তাঁহার বঙ্গভাষা অনুশীলন এদেশে নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছে। এইরূপ বদাউনী ও সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহাতে খ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই। পারস্য সাহিত্যেই তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের বিকাশ হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে স্বদেশীয় ভাষা অনুশীলন দেশের শ্রেষ্ঠতম উন্নতির উপায়।''

সওগাতে মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী ভাষাবিষয়ক যে সব প্রবন্ধ লিখেছেন তার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলো বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

বাঙ্গলা ব্যাকরণ সমস্যা,	৪:৫	কার্তিক	১৩৩৩
বাংলা বর্ণমালার কথা,	৪:৬	অগ্রহায়ণ	১৩৩৩
বাংলা সাহিত্যে পরিভাষা,	৪:৮	মাঘ	১৩৩৩
ঈশ্বর শব্দের ব্যবহার,	৪:৯	ফাল্গুণ	১৩৩৩
বাংলা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দের স্থান	৫:৯	ফাল্গুণ	১৩৩৪

বাংলা ব্যাকরণ সমস্যা ৪র্থ বর্ষ ৫ম সংখ্যা 'সওগাতের' প্রথম প্রবন্ধ রূপে মুদ্রিত হয়েছে। প্রবন্ধের প্রথমাংশে সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক নির্ণয়ের পর সংস্কৃতানুসারী নয়, বাংলা ব্যাকরণ রচনার গুরুত্বের প্রতি প্রাবন্ধিক নির্দেশ করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে এ বিষয়ে তিনি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও রামগতি ন্যায়রত্নের অভিমতের প্রতিধ্বনি করেছেন। প্রবন্ধের উপসংহারে বাংলা ব্যাকরণ রচনার ক্ষেত্রে কি করণীয় সে সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেছেন :

''...আমাদের বাঙ্গলা ভাষারও একটা নিয়ম আছে। আমরা সেই নিয়ম পালন করিয়া থাকি। তাহা যদি না হইত, তবে কাহারও কথা কেহ বুঝিত না। সংসারে সর্ব্বদা কেবল একটা ঘোর কোলাহল ও বিশৃঙ্খলা ঘটিত। ভাষার গতি ঠিক করিবার বা সংস্কার করিবার কোন অধিকার ব্যাকরণের নাই। ইহা কেবল মাত্র বলিয়া দেয় ভাষা কোন পথে গিয়াছে। প্রকৃতি আমাদের প্রকৃত ব্যাকরণ। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' বলেন—'ব্যাকরণ শিশু ও অকৃতীর বাক্‌চেষ্টার শাসন করে, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা চিরপ্রবাহশীল ভাষার গতি স্থির রাখিতে পারেনা। ব্যাকরণকে অগ্রাহ্য করিয়া ভাষা রূপান্তর গ্রহণ করে। ব্যাকরণ যুগে যুগে ভাষার পদাঙ্কস্বরূপ পড়িয়া থাকে। ভাষা যে পথে বহিয়া যায়, ব্যাকরণ তাহার সাক্ষী মাত্র। বিলুপ্ত মহেশ ব্যাকরণের পর পাণিনি, তৎপর বররুচি, পুরন্দর, ইহাদের পর রূপসিদ্ধি, লঙ্কেশ্বর,

শাকল্য, ভরত, কোহল, ভামহ, বসন্তরাজ, মার্কণ্ডেয়, ক্রমদীশ্বর, মৌগদল্যায়ন, শিলাবংশ—ইঁহারা ব্যাকরণ রচনা করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে যাহা ভাষার দোষ বলিয়া কীর্ত্তিত, পরবর্ত্তী যুগের ব্যাকরণে তাহাই ভাষার ব্যাকরণ বলিয়া স্বীকৃত। তাই পাণিণির নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া মহাবংশ ও ললিতবিস্তার শুদ্ধ বলিয়া গণ্য, এবং বররুচির নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়াও চাঁদকবির গাথা কি চৈতন্য চরিতামৃত নিন্দনীয় হয় নাই।'…

…পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাঙ্গলা ব্যাকরণ বাঙ্গলাভাষা হইতে গড়িয়া তুলিতে হইবে। বাঙ্গলাভাষার প্রকৃত ব্যাকরণ এখনও তৈয়ার হয় নাই। ইহার আলোচনার সূত্রপাত মাত্র হইয়াছে। এই ভবিষ্যৎ বাঙ্গলা ব্যাকরণ রচনা করিবার সময় সকলেরই একটা কথা খুব মনে রাখা উচিত। বাঙ্গলাভাষা কেবল হিন্দুরও নহে; কেবল মুসলমানেরও নহে। ইহা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মাতৃভাষা। মুসলমানকে বাদ দিয়া কেবল হিন্দুকে লইয়া ব্যাকরণ রচনা করিলে, ইহা অসম্পূর্ণ থাকিবে। যদি এই বিষয় এখন কেহ লক্ষ্য না করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সকলকেই অনুতাপ করিতে হইবে। এবিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আশা করি, পরিষদ এবিষয়ে একটী সুমীমাংসায় উপনীত হইয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিবেন।

গৌড়ের মুসলমান বাদশাহগণ যে বাঙ্গলা সাহিত্যের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন, একথা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন। আধুনিক লেখক ছাড়া, প্রাচীন মুসলমান কবিগণ বাঙ্গলা সাহিত্যে যাহা দান করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত হেয় নহে। কাহারও কাহারও মতে আমাদের সাহিত্যে ৮000 হাজারের অধিক পুঁথি আছে। ইহা আমাদের কম গৌরবের কথা নহে। এই পুঁথি-সাহিত্যের একখানা ইতিহাস লিখিলে যে দীনেশ বাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' হইতে কোনদিক দিয়া হীন হইবে না, ইহা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে। কেবল যত্ন ও চেষ্টার অভাব। মুসলমানেরা বহুদিন এদেশে বাস করিয়া এদেশকেই নিজের জন্মভূমি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা এদেশে বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। ইহার ফলে মুসলমানী আদব-কায়দা ও সভ্যতার আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানের রাজ ভাষা আরবী ও ফারসী এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। সেই সময় ফারসী না জানিলে হিন্দু মুসলমান কেহই ভদ্রসমাজে মিশিতে পারিতেন না। নদীতে একবার জোয়ার আসিলে ভাঁটার পরও সেই চিহ্ন অনেকদিন পর্য্যন্ত নদীতীরে দেখিতে পাওয়া যায়। আজ মুসলমান রাজত্ব না থাকিলেও, মুসলমানী সভ্যতার সেই ছাপ এমন কি হিন্দুসমাজ পর্য্যন্ত এখনও মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই। এখনও মুসলমানের জামা-জোড়া, পাগড়ী না হইলে লাটসাহেবের সভায় যাওয়া যায় না। এই পোষাকই এখন ভারতের জাতীয় পোষাক বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। এই পোষাক পরিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাকবি রবীন্দ্রনাথ বিদেশ ভ্রমণ করয়া আসিয়াছেন। ভারতের দেশীয় নৃপতিগণের দরবারে সেই বাদশাহী আমলের চালচলন ও আদবকায়দা এখনো বজায় রহিয়াছে। বাঙ্গলাভাষা মুসলমানদের নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছে, এখন তাহা মুছিয়া ফেলিয়াছে।

তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। মুসলমানেরা বাঙ্গলা ভাষায় যাহা দান করিয়াছেন, তাহা ভাষার অস্থি-মজ্জায় বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—'সাত শত বৎসর একত্র বাস করিয়া বাঙ্গলা মুসলমান হইতে অনেক জিনিষ লইয়া ফেলিয়াছে। সে সব জিনিষ বাঙ্গলার হাড়ে মাংসে জড়িত হইয়াছে। এখন তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া কিছুতেই সফল হইবে না। মুসলমানেরা বাঙ্গলাকে যেমন বদলাইয়া দিয়াছে, ভারতবর্ষের আর কোন ভাষাকে সেইরূপ পারে নাই। আমাদের বাঙ্গলার বিভক্তি 'রা' ও 'দের' মুসলমানদের কাছ হইতে লওয়া। সে বিভক্তি তুমি ভাষা হইতে উঠাইয়া দিবে কি করিয়া?'…

"...বাঙ্গলা ভাষার 'দের' ও 'রা' বিভক্তি ফারসী হইতে আসিয়াছে। পূর্ব্বে বাঙ্গলা সাহিত্যে 'আমাদের' ও 'আমারদিগের' ব্যবহৃত হইত। এখন 'আমারদিগের' পরিবর্ত্তিত হইয়া 'আমাদের' হইয়াছে। যথা :—

আমার + দিগর (ফার্সী—দিগর) = আমারদিগের = আমাদের।

আমি + রা (ফার্সী—রা) = আম + রা = আমরা।

বাঙ্গলার বহুবচনের চিহ্ন 'গণ' (যথা—রাজা = রাজাগণ) ফার্সী—'গান' হইতে আসিয়াছে। যথা —

রাজা + গাণ = রাজেগাণ।

বাঙ্গলাভাষার—দার, গর, গার, কার, ঈ, ওয়ালা, চা, বে, আনা, ওয়ার, আক্ প্রভৃতি ফারসী ও উর্দ্দু প্রত্যয়যোগে বাঙ্গলা অনেক শব্দ গঠিত হয়।

যথা :—দার্—জমীন + দার = জমীনদার বা জমীদার।
মজ্মা + দার = মজ্মাদার বা মজুমদার।
গর্—যাদু + গর = যাদুগর।
কার + গর = কারগর বা কারিগর।
কার—পেশ + কার = পেশকার।
শাস্ত্র + কার = শাস্ত্রকার।
ওয়ালা—দুধ + ওয়ালা = দুধওয়ালা।
"কাবুলী + ওয়ালা = 'কাবুলীওয়ালা।'
(রবীন্দ্রনাথ-গল্পগুচ্ছ)

ঈ—জাপান + ঈ = জাপানী।
সাহেব + ঈ = সাহেবী।
গার—খেদমত + গার = খেদমতগার।
গোনাহ + গার = গোনাহগার।
বে—বে + চারা = বেচারা।
বে + কোফ = বেকোফ বা বেকুফ।
বান—দার + বান = দারবান।
ওয়ার—উমেদ + ওয়ার = উমেদওয়ার।
আনা—বাবু + আনা = বাবুয়ানা।
রোজ + আনা = রোজআনা।
খানা—কার + খানা = কারখানা।
আক্—খোর + আক্ = খোরাক।
পোষ + আক্ = পোষাক।

খরিদ-বিক্রী, গমনাগমন প্রভৃতি পদ ফারসী 'হাছিলেমস্‌দর' 'খরিদফরোখ্‌ত্' ও আমদরফ্‌ত্' হইতে আসিয়াছে। আর অধিক দৃষ্টান্ত দিয়া পুঁথি বাড়াইবার আবশ্যক নাই। আমার উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা বাঙ্গলা-ব্যাকরণ রচনায় হাত দিয়াছেন বা ভবিষ্যতে দিবেন, তাঁহারা যেন আরবী-ফারসী মিশ্রিত এই বিভক্তিপ্রত্যয় প্রভৃতির কথা স্মরণ রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন।"

মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরীর পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'বাংলা বর্ণমালার কথা' (৪:৬)। প্রাবন্ধিক লক্ষ্য করেছেন :

"আধুনিক উন্নত জীবিত সাহিত্য সমূহের মধ্যে আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় যত অধিক বর্ণমালা, অন্য কোন ভাষায় তত নাই। উর্দ্দুতে—৩৫টি ; ফারসী—৩২ ; আরবী—২৮ ইংরাজী-২৬; প্রাচীন হিব্রুতে-২২টী অক্ষর ; আর আমাদের জাতীয় ভাষার ৫৪টি অক্ষর (অং, অঃ, ক্ষ ; সমেত মোট ৫৭টি)। বাংলা বর্ণ মালা—উর্দ্দু বর্ণমালার দেড় গুণ, ইংরাজীর দ্বিগুণ, আরবীর দ্বিগুণ এবং হিব্রুর আড়াই গুণ। বাংলা ভাষায় অত্যধিক বর্ণমালা আরব্য উপন্যাসের বৃদ্ধের ন্যায় বাঙ্গালী শিশুগণের ঘাড়ে চাপিয়া রহিয়াছে। ইংরাজীতে ২৬টি অক্ষর'ও বাংলায় ৫৪টি। ইংরাজী বর্ণমালার দ্বিগুণের চেয়ে অধিক। একটী ইংরাজ-শিশুর ইংরাজী বর্ণমালা শিখিতে যে সময় লাগিবে, একটী বাঙ্গালী-শিশুর বাংলা বর্ণমালা শিখিতে তাহার দ্বিগুণ সময় লাগিবে।"

এই সমস্যার সমাধানের জন্য আহবাব চৌধুরী বিস্তৃত আলোচনা করে তাঁর সংস্কার প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন। তাঁর আলোচনার মূল অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হল :

"স্বর-বর্ণ

যে সকল বর্ণ অনায়াসে অন্য বর্ণের সাহায্য ব্যতিরেকে উচ্চারিত হয়, তাহাই স্বরবর্ণ। এই নিয়ম অনুসারে আমরা কেবল মাত্র পাঁচটি স্বরবর্ণ দেখিতে পাই। যথা—অ, ই, উ, এ, ও। ঋ, ৠ, ঌ, দীর্ঘঌ, ঐ, ঔ যদিও স্বরবর্ণ শ্রেণীভুক্ত, কিন্তু এগুলিকে প্রকৃত পক্ষে স্বরবর্ণ বলা যায় না। তবে কি কারণে যে ইহারা স্বরবর্ণ শ্রেণীভুক্ত হইল, তাহার ইতিহাস আমরা অবগত নহি। ঋ, ৠ, ঌ, দীর্ঘঌ বিশ্লেষণ করিলে আমরা তাহাদের মূর্ত্তি অন্য প্রকারের দেখিতে পাই। যথা : র্+ই=ঋ ; ল্+ই=ঌ, অ+ই=ঐ ; অ+উ=ঔ। এমত অবস্থায় আমরা দেখিতে পাই কয়েকটি বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হয় না। একটি স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিতে যদি স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ উভয়ের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, তবে এই তথাকথিত স্বরবর্ণগুলিকে স্বরবর্ণ শ্রেণীভুক্ত করা বৈজ্ঞানিক-ভাবে যুক্তিসঙ্গত নহে। আমরা যতদূর বুঝিতে পারি উল্লিখিত পাঁচটি ছাড়া অন্য কোন স্বরবর্ণকে প্রকৃত পক্ষে স্বরবর্ণ বলা যাইতে পারে না।

স্বরবর্ণ চৌদ্দটি (অং, অঃ সমেত ১৬টি) :- অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, দীর্ঘঌ, এ, ঐ, ও, ঔ।

ঌ, দীর্ঘঌ—বাংলা বা সংস্কৃত সাহিত্যে দীর্ঘ ঌ কারের কোন ব্যবহার নাই। বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যে এক 'ক্লীপ' ধাতু ছাড়া ঌ হ্রস্ব লীর আর কোন ব্যবহার নাই।...

ঌ হ্রস্ব লীর কাজ ল দ্বারাই চলে। যখন ইহাদের অস্তিত্ব ক্রমেই লোপ পাইতেছে, তখন এ সম্বন্ধ বিশেষ আলোচনার দরকার মনে করি না।

ঐ—এখন পর্য্যন্ত অনেক স্থলে 'ঐ'র ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে 'ঐ' না বলিয়া 'অই' লিখিয়া থাকেন। 'ঐ দেখ' বলিলে আমরা 'ঐ' না লিখিয়া 'অই' লিখিতে পারি। আমরা শৈশব, বৈশাখ, না লিখিয়া শইশব, বইশাখ, লিখিতে পারি। সুতরাং ঐ উঠাইয়া দেওয়া একান্ত দরকার।

ঔ—"ঐ"র মত "ঔ"র লেখায় ও কথায় অনেক প্রভেদ। ঔর কাজ অ+উ দ্বারাই চলে। ঔষধ, পৌষ লিখিতে যদিও আমরা ঔ কার দিয়া লিখি, কিন্তু উচ্চারণের সময় "উ" বলিয়া থাকি। "ঔষধ, পৌষ", না বলিয়া "অউষধ, পউষ" বলিয়া থাকি। ঔকারের কাজ যদি উ দ্বারা চলিল, তবে ঔকার থাকার কোন দরকার নাই।

ঋ, ৠ—ৠ অতি পূর্ব্বেই বর্ণপরিচয় হইতে লুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং "ৠ" কারের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখন "ঋ" কারের সংস্কার আবশ্যক। "ঋ" এবং "র" কারের উচ্চারণ একই প্রকার। "ঋ" কারের কাজ "র" দ্বারাই চলে। ঋণ লিখিতে আমরা 'ঋণ' না লিখিয়া "রিণ" লিখিতে পারি। আমরা আরও দেখিতে পাই "রিপু" লিখিবার সময় ঋপু লেখা হয় না। "রিপুর" রি এবং "ঋণের" ঋ উচ্চারণে একই প্রকার। সুতরাং "রিপু" লিখিতে যদি "র" দিয়া লেখা গেল, তবে অন্যান্য শব্দ লিখিতে আমরা "র" দিয়া লিখিতে পারিনা কেন? এইরূপ আমরা "রিষি," রিপু, রিণ প্রভৃতি শব্দ র দিয়া লিখিতে পারি।

ঈ, ঊ—"ইকার ও উকারের যেমন হ্রস্ব দীর্ঘ আছে, তেমনি বাংলার অপর সকল স্বরশব্দেরই হ্রস্ব দীর্ঘ আছে, কিন্তু সে স্বরের জন্য স্বতন্ত্র অক্ষরের অভাবেও কাজ বেশ চলে যাচ্ছে। তাতে দেখা যায় যে, ঈ, ঊ অক্ষর বাহুল্য। এমন কি ইকার, উকারের আলাদা হ্রস্ব, দীর্ঘ চিহ্ন না থাকিলেই ভাল হ'ত। কারণ বাংলার বানান চলে একদিকে উচ্চারণ চলে অপর দিকে, তাতে করে বাংলা ছাত্রের মাথা খারাপ করা ছাড়া এ ফাজিল চিহ্নগুলি আর কোন কাজে লাগে না। আমরা লিখি তিন, বলি তীন (ইকারের হ্রস্বত্ব ইং tin শব্দে খাঁটি পাওয়া যায়), লিখি সতী, বলি সতি, লিখি কূল, বলি কূল, (হ্রস্ব উকার কাকে বলে তা হিন্দী কুল শব্দে পরিষ্কার শোনা যায়); লিখি মুহূর্ত্ত, বলি মুহুর্ত্ত।

এ—হ্রস্ব—একটু, বেদানা।
দীর্ঘ—বেদ, উদ্দেশ।

ও—হ্রস্ব—লোহা, বোঝা।
দীর্ঘ—রোগ, শোক।

অ—হ্রস্ব—কত, কথা।
দীর্ঘ—ছল, দল।

'ই'কার ও 'উ'কারের যেমন হ্রস্ব, দীর্ঘ আছে তেমনি এ, ও, অ, কারের হ্রস্ব, দীর্ঘ আছে। হ্রস্ব উকার, দীর্ঘ ঊকার যেমন বাংলায় পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ আছে; তেমনি "হ্রস্ব এ, দীর্ঘ এ, হ্রস্ব ও, দীর্ঘ ও; হ্রস্ব আ, দীর্ঘ আ" বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ নাই। কিন্তু আমরা এ, ও, অ কারের উচ্চারণে পৃথক্ পৃথক্ হ্রস্ব দীর্ঘ না থাকা সত্ত্বেও যখন স্বভাবতঃ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া থাকি, তখন দীর্ঘ ঈকার, দীর্ঘ ঊকার পৃথক্ পৃথক্ না থাকিলেও হ্রস্ব, দীর্ঘ উচ্চারণ করিতে পারিব নিঃসন্দেহ। সুতরাং দীর্ঘ ঈ, ও দীর্ঘ ঊ উঠাইয়া ফেলাই শ্রেয়ঃ।

আমরা আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, স্বরবর্ণ হইতে আটটি বর্ণ বাদ দিয়া ছয়টি বর্ণ দিয়া কাজ চালাইতে পারি। যথা:—অ, আ, ই, উ, এ, ও। প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপিতেও আমরা স্বরবর্ণে ছয়টি অক্ষর দেখিতে পাই। যথা :—

অ, আ, ই, উ, এ, ও।

ইংরাজীতে এক 'A' দ্বারা অ, আ, এ তিন কাজ চলে। যথা:—Ball—অ, Balm—আ, Bag—এ। মানুষের অল্প আয়ুর দিনে সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ অমিতব্যয়িতা নিতান্ত অসঙ্গত। সংসারে যত কমে কাজ চলে, ততই ভাল।

স্বরবর্ণে যেরূপ ব্যঞ্জনবর্ণেও সেইরূপ অনেক বেকার অক্ষর জায়গা জুড়িয়া আছে মাত্র। সেগুলির সংস্কার সাধন একান্ত আবশ্যক। শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর মহাশয় 'সরল বাঙ্গালা রচনা শিক্ষা'র ২য় পৃষ্ঠায় বলেন—'সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার মধ্যেও উচ্চারণের বৈষম্য আছে। সংস্কৃতে 'জ' ও 'য', 'ব' ও 'ব', 'ন' ও 'ণ', 'শ, ষ, স' স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় উহাদের উচ্চারণের কোন বৈষম্য নাই। সংস্কৃত শব্দের অন্তে হ্রস্ব 'অ'কার থাকিলে তাহা উচ্চারিত হয়, বাঙ্গালায় প্রায়ই তাহার উচ্চারণ হয় না; অথবা অতি হ্রস্বভাবে উচ্চারণ করা হয়। সংস্কৃতে হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘ পৃথকভাবে উচ্চারিত হয়, বাঙ্গালায় তাহা হয় না; 'গুণী' ও 'গুণি' বাঙ্গালায় প্রায় একইভাবে উচ্চারিত হয়।'

শ, ষ, স,—বাঙ্গালা সাহিত্যে এই তিন ''স''ই যত গণ্ডগোলের মূল। এই তিন ''শ''য়ের ধাঁধা মিটাইতে অল্পবয়স্ক শিশুদিগের মাথা ঘুরিয়া যায়। এমন কি, অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণের লেখাতেও এই তিন ''স''য়ের ভুলদৃষ্ট হয়। তিন ''স''য়ের পার্থক্য কেবল লেখায় দেখান হয় সত্য, কিন্তু কাজের বেলায় কিছুই হয় না। দন্ত 'স'ও মূর্দ্ধণ্য 'ষ'র উচ্চারণ একই প্রকার। 'বিষে'র 'ষ' ও 'সদরে' 'স'র মধ্যে উচ্চারণে কোন প্রভেদ নাই। তালব্য শর মেজাজ একটু উগ্র, কিন্তু বাংলার আবহাওয়ায় নম্র হইয়া তিনি 'স'তে পরিণত হইয়াছেন। 'শয়তান, শোক, শব' লিখিতে যদিও আমরা 'শ' দ্বারা লিখিয়া থাকি, কিন্তু 'পর, শ্রম, বিশ্রাম, প্রশ্ন'র উচ্চারণ 'শ'র মত না করিয়া ''ছ'র মত করি। আমাদের উচ্চারণ চলে একদিকে আর বানান চলে অপরদিকে। এই তিন 'স'য়ের মধ্যে 'শ, ষ' উঠাইয়া দিয়া কেবল দন্ত্য ''স'' রাখা শ্রেয়ঃ।

ব, ব,—বর্গীয় 'ব' ও অন্তঃস্থ 'ব'র মধ্যে বাঙ্গালায় উচ্চারণগত কোন পার্থক্য নাই। একটা বেকার বর্ণ অনর্থক বাঙ্গালা অভিধানের পাতা জুড়িয়া আছে মাত্র। সংস্কৃতে বর্গীয় 'ব' ও অন্তঃস্থ 'ব'র মধ্যে পার্থক্য আছে সত্য, কিন্তু বাঙ্গালায় তাহা নাই। যথা—(বর্গীয়) ব—ব কারঃ। স চ ত্রয়োবিংশ ব্যঞ্জন বর্ণঃ। তস্যোচ্চারণস্থানং ওষ্ঠঃ। ইতি ব্যাকরণম্। (শব্দকল্পদ্রুমঃ, পৃষ্ঠা—১২০৩)। অন্তঃস্থ ব—'ব'কারঃ। স চ ব্যঞ্জনস্য উনত্রিংশ বর্ণঃ। য বর্গশ্য চতুর্থ বর্ণশ্চ। অস্যোচ্চারণ স্থানং দন্তঃওষ্ঠশ্চ। ইতি। ব্যাকরণম্। (শব্দকল্পদ্রুমঃ, পৃষ্ঠা—১৭৫৩)। কিন্তু বাঙ্গালার 'বালক, বহু ও বলী'র বর্গীয় 'ব' এবং 'বংশ, বংশী, বকার অন্তঃস্থ 'ব'র মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। এই দুই 'ব'র মধ্যে এক ''ব'' উঠাইয়া দেওয়া উচিত।

ন, ণ,—দন্ত্য 'ন' ও মূর্দ্ধণ্য 'ণ'র মধ্যে উচ্চারণে কোন প্রভেদ নাই। সংস্কৃত 'ণ' বাঙ্গালার 'ন' হইয়াছে। যথা :—শ্রবণ—শোনা, গৃহিণী—গিন্নি, নিমন্ত্রণ—নেমন্তন, ঘৃণা—ঘেন্না হইয়াছে। সুতরাং মূর্দ্ধণ্য 'ণ' উঠাইয়া কেবল দন্ত ন' রাখাই উচিত।

জ, য,—'জ' ও 'য' স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান হইতে উচ্চারিত হইলেও সংস্কৃত শব্দের 'য' অনেক সময় বাঙ্গালায় অপভ্রংশে 'জ' হইয়াছে। 'কাজ' ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পুয—পুঁজ হইয়াছে, ধৈর্য্য—ধৈরজ হইয়াছে (কবিতায়)। (বানান সমস্যা, পৃষ্ঠা-২১, ল, কু, বঃ)। এই দুই 'জ'র মধ্যেও উচ্চারণে কোন প্রভেদ নাই। প্রাচীন পুথি সাহিত্যে কবিগণ 'জ', 'য'র মধ্যে কোন প্রভেদ না করিয়া কেবল উচ্চারণের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন। অতএব অনর্থক দুই 'জ' না রাখিয়া এক 'জ' রাখা উচিত।

ঞ—আজকাল 'ঞ'র কোন ব্যবহার বাঙ্গালায় নাই। বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে 'ঞ' এক প্রকার বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। এখন 'ঞ'র কাজ 'ই'দ্বারাই চলে। আমরা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে কোন কোন জায়গায় 'ঞ'র ব্যবহার দেখিতে পাই। যথা :—

নবদ্বীপ সম গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি।
যথা অবতীর্ণ হইলা চৈতন্য গোসাঞি।।

কিন্তু পরক্ষণে আবার উক্ত বৈষ্ণব সাহিত্যের 'চৈতন্য-ভাগবতে' গোসাই, নাই, মুই প্রভৃতি দেখিতে পাই। পক্ষান্তরে 'ঞ' ইর মত উচ্চারিত না হইয়া অনেক সময় ন-র মত উচ্চারিত হয়। যথা–বাঞ্ছা, যাজ্ঞা। আমরা দেখিতে পাই ঞ-র নিজের কোন অস্তিত্ব নাই। অন্য অক্ষরের চাপে, কখন ই র মত আবার কখন ন র মত উচ্চারিত হয়। এই 'ঞ'র কাজ 'ই' ও 'ন' দ্বারা খুব চলে। সুতরাং অনর্থক এই ঞ থাকিবার কি আবশ্যক? ইহা লুপ্ত হওয়াই উচিত।

ঁ—চন্দ্রবিন্দু সাধারণতঃ তাহার, উহার উপর সম্মান দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাঁশ, হাঁস, প্রভৃতি লিখিতে অনেকেই চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তব জীবনে কেহই অতি কষ্ট করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া চন্দ্রবিন্দু উচ্চারণ করিতে রাজী নহেন। এই চন্দ্রবিন্দুর বাহুল্য কেবল 'বর্ণশিক্ষা' প্রথম ভাগেই দেখা যায়। মৃত ব্যক্তির নামের অগ্রেও চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুসলমানেরা চন্দ্রবিন্দুর পরিবর্তে 'মরহুম' লিখিয়া থাকেন। হিন্দুরা অনেকে চন্দ্রবিন্দু না লিখিয়া স্বর্গীয় লিখিয়া থাকেন। সাহিত্যিক বাদানুবাদ ছাড়া 'শ্রী'র মত অন্য কোন বাধা থাকিলে আমাদের বলিবার কোন কথা নাই। কিন্তু চন্দ্রবিন্দু না লিখিয়া যদি স্বর্গীয় দ্বারা কাজ চলে, তবে চন্দ্রবিন্দু একেবারে উঠাইয়া ফেলা যুক্ত সঙ্গত।

ৎ-হসন্ত ত'র কোন দরকার বাংলায় নাই। আমরা বৎস লিখিতে 'বৎস' না লিখিয়া 'বত্‌স' লিখিতে পারি। ৎ র কাজ ত্‌ দ্বারাই চলে। সুতরাং ৎ উঠাইয়া দেওয়া হউক।

ঃ—বিসর্গ খাস সংস্কৃত। ইহার সহিত বাংলার কোন সম্পর্ক নাই। জোর করিয়া বাংলা ভাষায় ইহাকে প্রবেশ করান হইয়াছে। 'দুঃখ বলিতে আমরা ঃ বিসর্গর উচ্চারণ না করিয়া বলি 'দুক্ক্'। 'বিদ্যাসাগরের আমলে 'শ্রেয়ঃ' 'স্রোতঃ' প্রভৃতি বিসর্গ দিয়ে বানান করা হ'ত, এখন সাবালক ব্যাঙাচীর মত 'স্রোত' বিনা ল্যাজে বেশ চলেছে। তবে আর কেন? আপাতত, 'ক্রমশ' প্রভৃতি বিসর্গগুলিকে কালের স্রোতে ভেসে যেতে দেওয়া শ্রেয়।' (সবুজপত্র—১৩২৪ বাং পৃষ্ঠা—৪৭৬)।

ঙ-ং—আজকাল 'ঙ' ও ং র মধ্যে অনেক মনোমালিন্য দেখা যায়। কেহ কেহ 'ঙ'র পক্ষপাতী, কেহ কেহ আবার ং র পক্ষপাতী। পক্ষান্তরে কেহ কেহ 'ঙ্গ' র পক্ষপাতী। বাংলা রং চং প্রভৃতি লিখিতে তিন দল তিন প্রকার বানান করেন। প্রাচীন দল 'ঙ্গ' লিখেন এবং নব্যদল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া কেহ কেহ ং লিখেন আবার কেহ ঙ লেখেন। প্রাচীন 'ঙ্গ'র পক্ষপাতী আজকাল অনেক কম। 'ঙ্গ'র প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। শেষের দুই দলের মধ্যে অনেক অনেক বড় বড় লোক আছেন। এখনও ইহার ফয়সলা হয় নাই। দেখি কি হয়। আমরাও আপাতত এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলাম না।

ড়, ঢ়—নূতন সংস্করণের কোন কোন 'প্রথম ভাগে' ঢ় উঠিয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র প্রাচীন ধরনের কয়েক খানি বর্ণশিক্ষা প্রথমভাগে বর্ণমালার ফিরিস্তে ঢ় অতি নিম্নে

সঙ্কুচিত ভাবে পড়িয়া আছে। 'ড়,ও 'ঢ়'র মধ্যে উচ্চারণগত বিশেষ কোন প্রভেদ না থাকায় কেহ কেহ 'ডয় শূন্য ড় ও ঢয় শূন্য ঢ়' বলিয়া পৃথক্ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই পার্থক্য কৃত্রিম, স্বাভাবিক নহে। 'পড়' র 'ড়' এবং মূঢ় র 'ঢ়' মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। সুতরাং ড় রাখিয়া ঢ় উঠাইয়া দেওয়া উচিত।

অ, য়—আমরা অ, য় এই উভয় বর্ণের উচ্চারণে প্রভেদ করি না, সেইজন্য স্বরের অ, অন্তস্থ য় নাম দিয়া প্রভেদ জানাই। ইহার ফলে, অনেকে অ ও আ না লিখিয়া য়া লিখি। (বানান সমস্যা-পৃষ্ঠা ১৮। লঃ কুঃ বঃ)। অ, ও য়'র মধ্যে যখন কোন প্রভেদ নাই, তখন য় উঠাইয়া দেওয়া হয় না কেন? আমরা শিয়াল না লিখিয়া শিআল, গোয়াল না লিখিয়া গোআল এবং দুয়ার না লিখিয়া দুআর লিখিতে পারি। ইউরোপ লিখিতে অনেকে য়ূরোপ লিখিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা মনে করি য়ূ না লিখিয়া ইউরোপ লেখাই শ্রেয়।

খ, ক্ষ—আজ কাল খ, ও 'ক্ষ'র মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না। কেহ কেহ সেইজন্য খ উঠাইয়া দিতে উৎসুক। কিন্তু আমরা বাংলা সাহিত্যে খ রাখিবার জন্য বিশেষ সুপারিশ করি। কেননা আজকাল অনেক ফারসী, আরবী শব্দ যথা—খাহেশ, মখদুম, খোদা প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করিতেছে। ফারসী বা আরবীর 'খে'র (খ) মত কোন অক্ষর বাংলায় নাই। ফারসী 'খে'র উচ্চারণে আমাদের 'খ' দ্বারাই করা উচিত। সুতরাং 'খ' উঠাইয়া দিলে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গহানি হইবার সম্ভাবনা।

এইরূপ আমরা বর্ণমালার যে প্ল্যান করিয়াছি, তাহার মুসাবিদা নিম্নে দেওয়া গেল :—

স্বরবর্ণ—অ, আ, ই, উ, এ, ও।

ব্যঞ্জনবর্ণ—ক, খ, গ, ঘ, ঙ। চ, ছ, জ, ঝ। ট, ঠ, ড, ঢ। ত, থ, দ, ধ, ন। প, ফ, ব, ভ, ম। র, ল, স, হ, ড়। মোট ৩৪।"

বাংলা সাহিত্যে পরিভাষা প্রবন্ধে (৪:৮) মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী যুক্তিবাদী। বিদেশী পরিভাষিক শব্দ অনুবাদের বদলে তিনি বাংলা হরফে তা গ্রহণের পক্ষপাতী। তাঁর মতে দুর্বলকে যেমন পদগোলক করার প্রয়াস নিরর্থক তেমনি বিচিত্র বিদেশী ভাষার পারিভাষিক শব্দ যা বাংলায় প্রচলিত হয়েছে সে সবের অনুবাদ প্রয়াস অর্থহীন। আবার বাংলায় এক শব্দে নানা অর্থ প্রকাশ হলে পরিভাষার ক্ষেত্রে যে জটিলতা সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কেও সচেতনতা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে আহবাব চৌধুরীর বক্তব্য :

"আমরা বাংলা ভাষায় Editor ও Secretary-র অনুবাদ করি সম্পাদক দ্বারা। কিন্তু Editor Secretary অর্থ যে সম্পূর্ণ পৃথক উহা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। এক সম্পাদক দ্বারা এই দুই ভাব প্রকাশ করা সুকঠিন। আমরা Manager, Proprietor, Superintendent, Principal এর অনুবাদ করি—অধ্যক্ষ। একটী কারখানার অধ্যক্ষ (ম্যানেজার) ও কলেজের অধ্যক্ষের (প্রিন্সিপাল) কাজ যে এক নহে তাহা জানিয়াও অনেকে এইরূপ ভুল করিয়া থাকেন। সেদিন 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় কোন একজন লেখক মহাত্মা গান্ধীর 'Young India' সাপ্তাহিক পত্রের নাম 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' না লিখিয়া ইহার নামের অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন—'তরুণ ভারত' আবার কেহ কেহ "New India Servant" প্রভৃতির নামা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া 'নব্য ভারত', 'সেবক' প্রভৃতি লিখিয়া থাকেন। কিন্তু 'নব্য ভারত' ও

'সেবক' নামে দুই খানা স্বাধীন স্বতন্ত্র পত্রিকা বাংলা ভাষায় আছে। তরুণ ভারত নামেও একখানা পৃথক পত্রিকা বাংলা ভাষায় আছে। সুতরাং Young India বা Servant এর অনুবাদ তরুণ ভারত ও সেবক না করিয়া 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' ও 'সার্ভেণ্ট' লেখাই উচিত। সংবাদপত্রের নাম একটা সর্ব্বনাম বিশেষ। পত্রিকার নাম যে ভাষায় আছে, অন্য ভাষায় লিখিতে হইলে ইহার অনুবাদ না করিয়া ঠিক সেই ভাষাতেই লেখা যুক্তি সঙ্গত।

আজকাল আমাদের সাহিত্য মহলে ইংরেজী Nation ন্যাশন শব্দ লইয়া বড়ই আলোচনা চলিতেছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ জাতি না বলিয়া নেশন ব্যবহারের পক্ষপাতী। তিনি "শান্তি নিকেতন" পত্রিকা এই শব্দের বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া ইহা দেখাইয়াছেন। আমরা তাহার প্রস্তাব সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করি। কারণ-"বাংলা ভাষায় জাতি শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা বলি স্ত্রী জাতি, পুরুষ জাতি; হিন্দু জাতি, মুসলমান জাতি; সাঁওতাল জাতি, নাগা জাতি, ব্রাহ্মণ জাতি, কায়স্থ জাতি; ইংরেজ জাতি, জার্ম্মান জাতি; ইত্যাদি। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, জাতি কথাটা ইংরেজী sex, religion, body, tribe, caste, nation প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

'নেশ্যনের মানে কি? একদেশে, রাজ্যে বা রাষ্ট্রে, এক শাসনতন্ত্রের অধীনে ভৌগোলিক সান্নিধ্যে সংহত বা জমাট ভাবে যাহারা বাস করে, তাহাদের সমষ্টিকে নেশ্যন বলে।' (প্রবাসী)।"

আহবাব চৌধুরীর মতে বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ যেহেতু প্রধানতঃ সর্বনাম বাচক সেহেতু তা হুবহু গ্রহণে কোন আপত্তির কারণ নেই। ভাষার সমৃদ্ধির স্বার্থেই অন্য ভাষার ঋণগ্রহণ অপরিহার্য। আহবাব চৌধুরীর ভাষায়:

"অন্য কোন ভাষার সাহায্য ছাড়া দুনিয়ার কোন ভাষারই উন্নতি সম্ভবপর নহে। ইংরেজ জাতি যেমন একদিকে দেশ বিদেশে বাণিজ্য-জাহাজ পাঠাইয়া নানাদেশ হইতে ধন সংগ্রহ করিয়া নিজ জন্মভূমিকে সমৃদ্ধিশালীনী করিয়াছেন, তেমনি সেই সঙ্গে সঙ্গে জগতের বিভিন্ন দেশের জ্ঞান আহরণ করিয়া ও নানাবিধ শব্দরাশি চয়ন করিয়া নিজ মাতৃভাষাকেও পৃথিবীর একটা শক্তিশালিনী ভাষারূপে গঠন করিয়াছেন। ইংরেজির মত এত উন্নতভাষাও ল্যাটিন গ্রীক, জার্ম্মান, ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় এবং ভাষা, আরবী ফারসী সংস্কৃতের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে কোন দিন লজ্জা বোধ করে নাই। কেবল ইংরেজি ভাষা নহে, দুনিয়ার প্রাচীন ও আধুনিক সকল ভাষাই অপর ভাষা হইতে এই বিনা-সুদী ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন।"

মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী 'ঈশ্বর শব্দের ব্যবহার' (৪:৯) প্রবন্ধে তুলনামূলক ধর্ম আলোচনার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় ঈশ্বর ও আল্লাহ শব্দ ব্যবহারের পার্থক্য প্রদর্শন করেছেন।

'বাঙ্গলা সাহিত্যে আরবী-ফার্সী শব্দের স্থান' (৫:৯) প্রবন্ধে আহবাব চৌধুরী যে সমস্ত আরবী-ফার্সী শব্দ দীর্ঘ দিনের ব্যবহারে বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হয়েছে তা অব্যাহত প্রয়োগের সমর্থন করেছেন। এ ক্ষেত্রে মতান্তরসমূহ খণ্ডন করে তিনি বাঙালীমুসলমান সাহিত্যিকদের কর্তব্য নির্দেশ করেছেন। প্রবন্ধের উপসংহারে আহবাব চৌধুরী লিখেছেন:

"...মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—'আমাদের পণ্ডিত মহাশয়েরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাহারা মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করিবেন না। 'কলম' মুসলমানী শব্দ। তাঁহারা কলমের বদলে 'লেখনী' শব্দ ব্যবহার করিবেন, অথচ লেখনীর

অর্থ উড়েদের তালপাতায় আঁচড় কাটিবার লোহার খন্তি,—তাহাতে কালি লাগে না। কলম ও লেখনী একেবারে বিভিন্ন জিনিষ। 'দোয়াত' মুসলমানী কথা। 'দোয়াত' লেখা হইবে না, 'মস্যাধার' লিখিতে হইব। 'পাট্টা' মুসলমানী কথা। 'পাট্টা' লিখিবেন না, 'ভোগবিধায়ক পত্র' লিখিবেন। 'আদালত' লিখিবেন না,—লিখিবেন 'বিচারালয়'। এইরূপে তাঁহারা বাঙ্গালাকে শুদ্ধ বা মার্জ্জিত করিতে চান। তাঁহাদের সে-চেষ্টা কখনই সফল হইবার নয়।'

১৩২৮ (বাং) আশ্বিন মাসের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে প্রাচীন ভারতে 'আগ্নেয়াস্ত্র' নামক প্রবন্ধে বিমলকান্তি মুখোপধ্যায় মহাশয় বন্দুক, কামান ও বারুদের কিম্ভূতকিমাকার প্রতিশব্দ বাহির করিলেন—শতঘ্নী, ভূষণ্ডী, অগ্নিচূর্ণ।

বাঙ্গলা ভাষায় এই সকল আবর্জ্জনা বাড়াইবার কি আবশ্যকতা আছে, বুঝিতে পারি না। তাই খ্যাতনামা যোগেশচন্দ্র মহাশয় বাস্তবিকই বলিয়াছেন—'যিনি কেবল সংস্কৃত ভাষাকেই বাঙ্গালা ভাষা করিতে বলেন, তিনি অজ্ঞাতসারে বাঙ্গলা ভাষাকে মৃত ভাষায় পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন।'

কোন কোন মুসলমান লেখকও হিন্দু লেখকগণের অনুকরণে নমাজ না লিখিয়া উপাসনা, রোজার পরিবর্ত্তে উপবাস, আল্লার পরিবর্ত্তে ঈশ্বর বা ভগবান, বেহেশ্‌ত্‌-দোজখের বদলে স্বর্গ-নরক, এবং মস্‌জিদের বদলে মন্দির বা উপাসনালয় প্রভৃতি লিখিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাদের কোন প্রতিশব্দ দুনিয়ার অন্য কোন ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই সকল আরবী-ফারসী শব্দকে কোন অদল বদল না করিয়া ঠিক তেমনি ভাবে বাঙ্গলা ভাষায়ও ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, কোন কোন খ্যাতনামা মুস্‌লিম সাহিত্যিক আরবী-ফারসী শব্দ প্রচলনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সাহিত্য গঠনের বড়ই বিঘ্ন ঘটাইতেছেন।

জনাব আবদুল মজিদ সাহেব 'কোরাণে নারীর মূল্য' নামক প্রবন্ধে 'আয়াত' ও 'রুকু'র তরজমা করিয়াছেন 'শ্লোক' ও 'অধ্যায়।' কিন্তু তাহা হইতে পারে না। শ্লোক বলিতে সাধারণতঃ আমাদের চাণক্যশ্লোকের কথাই মনে পড়ে, কোরাণ-শরিফের আয়াত কখনও বুঝায় না। অধ্যায় দ্বারা রুকুর বিশেষ অর্থ প্রকাশ পায় না। সুরা, আয়াত, সিপারা, রুকু, সজিদা প্রভৃতি শব্দগুলি খাস কোরানের সম্পত্তি।

জনাব মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌ সাহেব একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক। তিনি গত আষাঢ় মাসের 'সওগাতে' 'হাল ও মোকাম' (সূফীতত্ত্ব) নামক প্রবন্ধে ব্রহ্ম, সনাতন-ব্রহ্ম, জীবাত্মা, পরমাত্মা, সৎ, চিৎ ও আনন্দ প্রভৃতি বৈদান্তিক শব্দের ব্যবহার করিয়া তস-উফ সাহিত্যকে অত্যন্ত খাটো করিয়া দিয়াছেন। জনাব বরকতুল্লাহ্‌ সাহেব তসউফ আলোচনা করিতে গিয়া হিন্দু বেদান্ত হইতে শব্দ ধার করিয়া আনিয়া কেবল যে নিজের ভাব-প্রকাশের অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন, এমন নহে,—অ-মুসলমানের নিকট তিনি সূফী-সাহিত্যকে একেবারে হাল্‌কা করিয়া দিলেন।

এই ভাবে ধারাবাহিক আলোচনা করিলে প্রবন্ধ অত্যন্ত সুদীর্ঘ হইয়া পড়িবে ভাবিয়া আমি এইখানেই ক্ষান্ত রহিলাম। বর্ত্তমান মুস্‌লিম বাঙ্গলা-সাহিত্য কি-ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে, আমি উপরে ইহার একটা Principle ও আভাষ দিলাম।"

'সংস্কৃত ও পারস্য ভাষার পরস্পর সম্বন্ধ' নির্ণয় করেছেন জসিমউদ্দীন আহমদ (৫:৬, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪)। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংখ্যা, আত্মীয়, পশুপাখী, চন্দ্রসূর্য, দৈনন্দিন ব্যবহার্য বস্তু ইত্যাদি বাচক শব্দ তুলনা করে লেখক উভয় ভাষার সাদৃশ্য নির্দেশ করেছেন :

১। লোকে বাল্যকাল হইতেই শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নামের সহিত পরিচিত হয়। আর্য্যগণ আদিম আবাসভূমি ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিলেও কাল-ক্রমে ঐ সকল নামের বড় বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। সংস্কৃত ও পারসীতে ঐ সকল নামের কতকগুলি প্রায় একই রূপ রহিয়া গিয়াছে। যথা:——

সংস্কৃত	পারসী
শির (মাথা)	সের
চক্ষু	চশম
ভ্রূ	আব্রু
দন্ত	দন্দ্
হস্ত	দস্ত্
পাদ	পা
জানু	জানু
পৃষ্ঠ	পুশ্ত্
অঙ্গুষ্ঠ	আঙ্গুস্ত

২। শিশুগণ বাল্যকাল হইতেই নিজ নিজ ভাষায় সংখ্যা গণনা করিতে শিক্ষা করে। আর্য্যগণ যে-ভাবে গণনা করিতেন, তাহা সংস্কৃত ও পারসীতে প্রায় অবিকল রহিয়া গিয়াছে। যথা :—

সংস্কৃত	পারসী
এক	এক
দ্বি	দু
ত্রি	ছে
চতুর্	চার বা চাহার
পঞ্চ	পাঞ্জ
ষষ্	শশ
সপ্ত	হপ্ত্
অষ্ট	হাশ্ত
নব	নোহ্
দশ	দাহ্
শত	সদ্

৩। পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজন নিজ নিজ ভাষায় কোন্ কোন্ নামে অভিহিত হয়, তাহা মানুষ মাত্রেই বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করে। আর্য্যগণ আদি আবাসভূমি ত্যাগ করিয়া নূতন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিলেও আত্মীয়-স্বজনকে তাঁহারা যে-নামে অভিহিত করিতেন, তাহার বড় বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। যথা :—

সংস্কৃত	পারসী
পিতৃ	পেদর্
মাতৃ	মাদার্
পুত্র	পুর
দুহিতৃ	দোখ্তর্
ভ্রাতৃ (ভ্রাতা)	বেরাদর্
শ্বশুর	খস্থর্

৪। পশুচারণ ও ভূমিকর্ষণ আর্য্যদিগের প্রধান উপজীবিকা ছিল। স্থতরাং যে-সকল গৃহপালিত জন্তু ও বন্য পশুপক্ষীর নামের সহিত তাঁহারা পরিচিত ছিলেন, তাহা-দের কতকগুলি সংস্কৃত ও পারসীতে প্রায় একরূপ রহিয়াছে। যথা :—

সংস্কৃত	পারসী
গো	গাও
মেষ	মেশ্
অশ্ব	আস্প্
খর (গাধা)	খর্
উষ্ট্র	উশ্তর্
শ্বন্ (কুকুর)	সগ্
শৃগাল	শোগাল্
কাক্	কোলাগ

৫। আর্য্যগণ সৃষ্টিকর্ত্তা, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য ও অন্যান্য যে-সকল প্রকৃতিক পদার্থের নামের সহিত পরিচিত ছিলেন, সংস্কৃত ও পারসীতে তাহাদের কতকগুলির সাদৃশ্য দেখুন :—

সংস্কৃত	পারসী
ধাতা	খোদা
মিহির (সূর্য্য)	মেহের
সূর্য্য	হুর্
মস্(চন্দ্রমস্)	মাহ্ (চন্দ্র)
তারা	তারা (সেতারা)
শর্ব্বরী	শব্
সায়ং	শাম্
ক্ষিতি (পৃথিবী)	গিতি
ভূমি	বুম্
অপ্ (জল)	আব্
মেঘ	মেঘ্

৬। দৈনন্দিন জীবনের আবশ্যক ও ব্যবহৃত কতকগুলি জিনিসের নাম উভয় ভাষাতে প্রায় একরূপ। যথা :—

সংস্কৃত	পারসী
হুতাশন	আতশ্
গোধূম (গম)	গন্দম্
যব	যও
বৃহতী (বেগুন)	বিরিঞ্জ
ক্ষীর (দুগ্ধ)	শির্
কার্পাস	কার্পাস্
চর্ম্ম	চরম্
শাখা	শাখ্

৭। কতকগুলি শব্দ সংস্কৃত ও পারসীতে অবিকল একরূপ রহিয়া গিয়াছে, কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই: ইহাই আশ্চর্য্য বটে। যথা :—

সংস্কৃত	পারসী
আহার (খাদ্য)	আহার্
নাম	নাম্
নীল	নীল্
হলাহল (বিষ)	হলাহল্
কাম (ইচ্ছা)	কাম্(ইচ্ছা)
আরাম	আরাম
নর (পুরুষ)	নর (পুরুষ) ইত্যাদি

৮। আরও কতকগুলি শব্দ দেখুন।

সংস্কৃত	পারসী
মর্ত্ত (পুরুষ-লোক)	মরদ্
জনি (স্ত্রীলোক)	জন্
মুষিক	মুশ্
শ্বন্	সগ্
মক্ষিকা	মগস্

ইহা ছাড়া সংস্কৃত ও পারসী ভাষার ব্যাকরণেও দুই একটি সাধারণ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে Adjective এর Comparative ও Superlative degree-তে সংস্কৃত ভাষায় "তর" ও "তম" যোগ করা হয়। পহলবী

ভাষায় ঠিক এই "তর" ও "তম" (তুম) ব্যবহৃত হইত। এই পহ্লবীই আধুনিক পারস্য ভাষার জনক। কিন্তু আধুনিক পারস্য ভাষায় Comparative degreeর "তর" ঠিক রহিয়াছে ; কেবল Superlative "তম" স্থলে "তরিন্" যোগ করা হয়। ইহা আধুনিক পারস্যের নূতন উদ্ভাবন বটে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে সংস্কৃত ও পারসী একই ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে সামানী-বংশের রাজগণের সময়ে পারস্য ভাষার প্রকৃত অভ্যুদয় আরম্ভ হয়। তাঁহাদের সভার প্রসিদ্ধ কবি রুদ্‌গী পারস্য ভাষাকে উচ্চাসনে স্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারস্য ভাষা সেই "ইজ্জত" প্রাপ্ত হইয়াছিল বিশ্ব-বিশ্রুত কবি ফের্দ্দৌসীর নিকট হইতে। প্রকৃতপক্ষে ফের্দ্দৌসীই আধুনিক পারস্য-ভাষার জনক।

পুরাতন পারস্য ভাষা (Old Persian) ও পহ্লবীর সহিত সংস্কৃত ভাষার অনেক মিল আছে। Old Persian হইতেই পহ্লবী ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই উভয় ভাষাই সংস্কৃতের মত রূপান্তরবহুল ছিল। কিন্তু আধুনিক পারস্য ভাষা উহাদের অনাবশ্যক রূপান্তরগুলি পরিত্যাগ করায় একটি সরল ও মধুর ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, আরবী ভাষার প্রভাবে ইহার মধুরতা ও ইজ্জত শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।"

একই প্রসঙ্গ আলেচনা করেছেন মোহাম্মদ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী (৫:১০ চৈত্র, ১৩৩৪)। আলোচনা বিভাগে 'সংস্কৃত ও পারস্য ভাষার পরস্পর সম্বন্ধ' নিবন্ধে আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী লেখেন :

"সেমিটিক, চীন, তুর্কী ও আর্য্যভাষা এই চারিটিকে ভাষা-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ মৌলিক ভাষা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা গ্রীক, লাটিন, জার্ম্মাণ, সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় সমার্থক, সমানাকৃতিক ও সমপ্রাকৃতিক বহু শব্দ দৃষ্টে এবং অন্যান্য বহু ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারা ইহাও স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ঐসব ভাষাভাষী লোকেরা অতি প্রাচীনকালে একই মূল আর্য্য ভাষা ব্যবহার করিত এবং তাহারা একই আর্য্যজাতিসম্ভূত। সুতরাং প্রাচীন পার্সী ও সংস্কৃত যে একই আর্য্য ভাষার সন্তান, ইহা নূতন গবেষণা নহে। কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিদেরা অন্যান্য ভাষায় এ-বিষয়ে আলোচনা করিলেও বাঙ্গলা ভাষায় এপর্যন্ত কেহ সংস্কৃত ও পারস্য ভাষার ঐক্য ও সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়া প্রবন্ধ বা পুস্তক লিখিয়াছেন কিনা, জানি না। বোধ হয় কেহ এ-কার্য্যে পুরাদস্তুর হস্তক্ষেপ করেন নাই। সম্প্রতি মৌলভী জসিমউদ্দীন আহ্মদ সাহেব বাঙ্গলা ভাষায় এ-বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম।

সে যাহা হউক, ৫।৭ বৎসর হয়, আমরা সমার্থক ও পরস্পর সাদৃশ্য জ্ঞাপক বহু সংস্কৃত ও পার্সী শব্দ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। নানা অনিবার্য্য কারণে আমরা এতদিন ঐগুলি প্রবন্ধাকারে লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারি নাই। বলিতে কি, আমরা ঐ শব্দগুলির কথা এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। মৌঃ জসিমউদ্দীন আহ্মদ যে-সব শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার ৮।১টী ব্যতীত আর সবই আমাদের সংগৃহীত শব্দাবলীর মধ্যে ছিল। আমাদের শব্দ তালিকার মধ্য হইতে তাঁহার প্রদত্ত শব্দগুলি বাদ দিয়া নূতন শব্দের একটা তালিকা নিম্নে প্রদান করিলাম। সময়ের অল্পতার জন্য আমরা শব্দগুলিকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাজাইতে ও আলোচনা করিতে সমর্থ হই নাই। আশা করি, জসিমউদ্দীন সাহেব কিংবা অপর কেহ আগামীতে এতদ্বিষয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনা করিবেন।

এ-স্থলে বলা আবশ্যক, প্রাকৃতিক অবস্থান, আবহাওয়ার প্রভাব, এবং সম্প্রসারণ ও বিপ্রকর্ষণ দরুণ কতকগুলি শব্দের আকৃতি ও উচ্চারণ-বৈষম্য ঘটিয়াছে। এমন কি, সংস্কৃত যেটা বিশেষ্য, পার্সীতে সেটা বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার পার্সীতে যেটা বিশেষ্য, সংস্কৃতে সেটা বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সংস্কৃত	পারসী	সংস্কৃত	পারসী
কপোত	কবুতর	ব্যারাম	বিমারী
ফর্ফর	ফর্ফর	কটি	কোমর
গদা	গোর্জ্জ	বল্গা	লাগাম
মাস	মাশ	মৎস	মাহি
সপ্তাহ	হাপ্তাহ	জ্ঞাতি	এগানা
অসুর	অহুর	দূরবীক্ষণ	দূরবীন
স্থান	স্তান	বাসী	বাশিন্দা
কুঞ্জী	কেলিদ	মারী	মর্গ
বর্ষণ (বৃষ্টি)	বারান	মাস	মাহ
বাত	বাদ	ভার	বার
বদন	বদন	ভুজ	বুজ
বন্ধ	বন্দ্	বিংশতি	বিস্ত্
পাঞ্চি	পাশ্না	পক্ক	পোখ্ত
পালক	পর্	পূর্ণ	পোর
প্রতাপ	পর্তাব	পশ্চাৎ	পাস্
স্তন	পিস্তান	যুবন্	যুয়ান
প্রস্রাব	পেশাব	পরিমাণ	পয়মাদান
তাপ	তাব	ত্রাস	তরস
তৃষ্ণা	তিষ্না (বিণ)	তপ্ত	তফ্তহ্
তীর	তীর	ছত্র	চাত্র
চক্র	চর্খা	আবর	বারিদ
দারু	দার্	দ্বার	দার
দুর্মনাঃ	দুষ্মন	দুর্নাম	দুষ্নাম
দূর	দূর্	রঞ্জন	রঞ্জিদান
রঙ্গ	রঙ্গ	ছায়া	সায়া
শক্ত	সখ্ত	সৃষ্টি	স্রেষ্ত
সর্ষফ	সর্শফ	স্বর	সরোদ
শর্করা	শক্কর	কর্পূর	কাফুর
কুজ্	কুজ	লক্ষ	লাক

মুষ্টি	মোষ্ত্	নারিকেল	নার্জিল
তাম্বুল	তাম্বুল	নখ	নাখোন
নারঙ্গ	নারঙ্গ বা নারঙ্	নব	নও
ন	না	শিশুমার	যোস্মার
শ্রবণ	শানিদান	মর্দ্দন	মলিদান
দান	দাদান	বার	বার
অনাহার	নাহার	জঙ্গল	জঙ্গল
তনু	তন্	কফ	কফ
কারু	কার	চারণ	চারিদান
দৈত্য	দেও	ভূত	বোত
পূজা (সপর্য্যা)	পরস্তি		

ব্যাকরণের দিক দিয়াও সংস্কৃতের সঙ্গে পারসীর কতকগুলি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃতের যেমন শব্দের পূর্ব্বে উপসর্গ এবং শব্দ বা ধাতুর পরে বিভক্তি ও প্রত্যয় যুক্ত হয়, পারসীতেও ঠিক এরূপ কতকগুলি উপসর্গ বিভক্তি বা প্রত্যয়জ্ঞাপক শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। নীচে কয়েকটি নমুনা দিতেছি।

সংস্কৃত	পারসী
বি (বিমনাঃ)	বে (বেঈমান্ বেপর্ওয়া)
প্র (প্রতাপ)	পর্ (পর্তাব)
মট (পঞ্চম)	ম (পঞ্চম)
কার—কৃ+অণ(কর্ম্মকার)	কার (চরমকার)
কর—কৃ+অ (কর্ম্মকার)	গর (খেদমতগার, কারিগার)
আলু নিদ্রালু	আলু (খায়াবআলু)
দুঃ বা দুষ্ (দুর্ণাম দুষ্প্রাপ্য)	দুষ্ (দুষ্মন)
মতুল (বুদ্ধিমান, শ্রীমান)	মন্দ (আকেলমন্দ, নেজামমন্দ)
বতুল (লক্ষ্মীবান)	বান (মেহেরবান, বাগবান)

এতদ্ব্যতীত সংস্কৃতে যেমন দুই এর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইলে শব্দের উত্তর তম হয় পারসীতেও তদ্রূপ। এ সম্বন্ধে জসিমউদ্দীন আহ্মদ সাহেবও বলিয়াছেন। আমরা এখানে কয়েকটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেছি।

Pas.	Cour.	Sup.
খোস	খোসতর	খোসতম্ (আধুনিক খোসতারিন)
খোবী	খোবীতর	খোবীতম্ (,, কমতারিন)
কম	কমতর	কমতম্ (,, কমতারিন)

'ভাষাজ্ঞান ও চিন্তাশীলতা' প্রবন্ধে আবুল ফজল (৭:৯-১০, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭) বাঙালী মুসলমানের বাংলা ভাষাচর্চা প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তাঁর আলোচনার প্রধানাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হল :

''ইংরেজীর বিরুদ্ধে আমাদের কোন রকমের সংস্কার নাই, বরং আমরা বিশ্বাস করি ইংরেজ আমাদের দেশ ছাড়িয়া গেলেও ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের সংযোগ রাখিতে হইবে। আমাদের কথা—আমাদের শিক্ষাবিভাগ ইংরেজীর প্রতি জোর দিতে যাইয়া আমাদের স্বকীয় ভাষার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন এবং তাহার ফলে দেশীয় ভাষায় ফলপ্রসু শিক্ষার কোন সুবন্দোবস্ত হইতেছে না। ইহাতে আমাদের জাতীয় জীবনের অমঙ্গল সাধিত হইতেছে। আমাদের চিন্তায় এবং প্রকাশে যে দৌর্ব্বল্য পরিলক্ষিত হয়, তাহার অন্যতম কারণ বোধ হয় আমাদের পরিপূর্ণ ভাষা-জ্ঞানের অভাব। এই দিক দিয়া বাংলার মুসলমানদের জীবন অত্যন্ত শোচনীয়। সুদূর অতীতে এবং বর্ত্তমানে বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসে এমন কোন চিন্তাশীল লোকের নাম শুনা যায় না, যাহাকে লইয়া একটা জাতি গৌরব করিতে পারে। জাতির ইতিহাস এমন ভাবে ব্যর্থ হইতে বড় একটা দেখা যায় না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মুসলমানদের মধ্যে নাম করিবার মত লোকের অভাব নাই। মুসলমান আমলে এবং পরবর্ত্তী যুগে ঐ সমস্ত প্রদেশে বহু শাস্ত্রকার, ঐতিহাসিক ও কবির জন্ম হইয়াছে।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই হইতেই দেশে আরও অসংখ্য স্কুল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সব স্কুল মাদ্রাসা হইতে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ বা শিবলী নো'মানীর মত একজন লোকও বাহির হয় নাই, অথবা মৌলানা আবদুল হক, মৌলানা কেরামত আলী, মৌলানা আশরফ আলী প্রভৃতির ন্যায় শাস্ত্রকারেরও নাম শুনা যায় না। অথচ বাংলা দেশে মাদ্রাসা ও মৌলবী-মৌলানার সংখ্যা করা যায় না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের সঙ্গে বাংলার মুসলমানদের বড় পার্থক্য ভাষা সম্পর্কে। অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানেরা উর্দ্দুকে তাঁহাদের মাতৃ-ভাষা এবং সঙ্গে সঙ্গে কাল্‌চার-এর ভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলার মুসলমান বহু দিন পর্য্যন্ত কোন ভাষাকেই তাহার কালচার-এর ভাষা বলিয়া গ্রহণ করে নাই। অভিজাত পরিবারের মুসলমানেরা উর্দ্দুতে কথা বলিয়াছেন, কিন্তু বাংলাদেশে ভিন্ন আবেষ্টন ও পরিপার্শ্বিকতার মধ্যে তাঁহারা উর্দ্দুর কৃষ্টিসম্মত একটা আবহাওয়া (cultural atomsphere) গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই এবং বাহিরের উর্দ্দু কাল্‌চার ও চিন্তা জগতের সঙ্গেও নিজেদের সংযোগ রাখিতে পারেন নাই। এই না-পারার প্রধান কারণ বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতা। আজ লণ্ডন-প্রবাসী বাঙ্গালীরা যদি সঙ্কল্প করেন—আমরা লণ্ডনে ইংরেজী সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিব ; সে শুধু হাস্যকর ব্যাপার হইবে। উর্দ্দুভাষী মুসলমানেরা বাংলায় বসিয়া পদে পদে অনুভব করিয়াছেন বাংলার প্রয়োজনীয়তা, কিন্তু আভিজাত্যাভিমানে তাঁহারা উর্দ্দুকে ছাড়িয়া বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই দোদুল্যমান জীবন যাত্রার ফল হইয়াছে, তাঁহারা চিন্তার জগতে শুধু ফাঁকি দিয়াছেন।

ইংরেজী শিক্ষিত সাধারণ বাঙালী মুসলমান বাড়ীতে বাংলা বলিলেও এতদিন কিন্তু বাহিরে উর্দ্দুর ওকালতী করিয়াছে। কাজেই বাংলা ভাষাকে সে তাহার কালচার-এর ভাষা বলিয়া গ্রহণ করে নাই। রাজকার্য্যের জন্য সে ইংরেজী শিখিয়াছে, ধর্ম্ম হারাইবার ভয়ে সে আরবী, পারসী, উর্দ্দু পড়িয়াছে এবং ব্যবহারিক জীবনের সুবিধার জন্য বাংলাও তাহাকে কিছু কিছু পড়িতে হইয়াছে (কিন্তু সে শুধু বাধ্য হইয়া) ইহাতে তাহার ইহ-পরকালের জীবন যাত্রার একরকম চলনসই সুবিধা হয়তো হইয়াছে কিন্তু চিন্তা ও

কাল্চারের দিককে সে একেবারে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ইংরেজী, আরবী, পার্সী ও উর্দ্দু তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ বৈদেশিক ভাষা, কাজেই তাহার ভাব, চিন্তা ও প্রেরণার বাহন ঐ সব ভাষা হইতে পারে না—হইতে পারে নাই। এক হইতে পারিত বাংলা কিন্তু বাংলাকে সে এতদিন গ্রহণ করে নাই। তার উপর এতগুলি ভাষা যাহাদের শিখিতে হয় কোন ভাষার উপরই যে তাহাদের পরিপূর্ণ দখল হয় না, এ অতি সহজ কথা। কোন ভাষার উপর যে জাতির পরিপূর্ণ দখল নাই, সে জাতির চিন্তা-জগত যতখানি ফাঁকা থাকা উচিত, বাঙালী মুসলমানের চিন্তার জগত ততখানি ফাঁকাই রহিয়া গিয়াছে।

আজ বাঙালী মুসলমান বাংলা ভাষাকে তাহার মাতৃভাষা ও কালচার-এর ভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছে সত্য কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে বাংলাভাষা শিক্ষার সুবন্দোবস্ত এখনো হয় নাই। 'মুস্‌লিম বাংলা' এখনো মাদ্রাসাঘেঁষা; কিন্তু মাদ্রাসা ও মক্তবগুলিতে এখনো বাংলাশিক্ষার সুবন্দোবস্ত হয় নাই। যাহা হইয়াছে তাহাও অত্যন্ত ভুল-ভ্রান্তিজনক। এই ভুল ভ্রান্তি তিন কারণে। প্রথমতঃ, বর্ত্তমান মাতৃভাষা-শিক্ষা প্রণালী মোটেই আদর্শ-স্থানীয় নয়। ইহাতে ছাত্রদের মনে ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি কোন রকমের দরদের সৃষ্টি হয় না। দ্বিতীয়তঃ, অনুপযুক্ত শিক্ষক। যাঁহারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে মোটেও পরিচিত নন, বর্ত্তমানে তাঁহারাই মাদ্রাসা ও মক্তবে বাংলা শিক্ষক। (কোন জুনিয়ার মাদ্রাসার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বাংলা পড়াইবার সময় 'সধবা'র উল্টা 'ধবা' বলিতেও শুনিয়াছিলাম।) তৃতীয়তঃ, কুলিখিত পাঠ্য বই। সাধারণতঃ অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিরা, যাঁহারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে মোটেই পরিচিত নন—এবং বাহিরের জ্ঞান-রাজ্যের কোন খবরই রাখেন না, তাঁহারাই ঐ সমস্ত পাঠ্য বইয়ের লেখক। বইগুলিতে না আছে জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রতি ইঙ্গিত, না আছে পুষ্ট ভাষা, না আছে সুন্দর বর্ণনা। অনেক বইএর ভাব ভ্রমপূর্ণ—বানান পর্য্যন্ত বিশ্রী। এই প্রকারে গোড়াতে যে ভুল ভাষা শিক্ষা হয়, তাহা ছাত্রদের সারাজীবন থাকিয়া যায়। আজ মুসলমান-সাহিত্যের প্রতি তাকাইলে ইহার ভয়াবহ পরিণতি বুঝা যাইবে। আজ মুসলমানদের সাহিত্য-সেবার আগ্রহ জাগিয়াছে, উহা সুখের বিষয়; কিন্তু দুঃখ হয় যখন দেখা যায়, অনেকের ভাষা বিশুদ্ধ নয়, নানা ভুলত্রুটীতে পূর্ণ; অনেকে বাংলা লিখিতে গিয়া ভাষাকে অপূর্ব্ব খিচুড়ী করিয়া তোলেন। অনেকের চিন্তার আগাগোড়ায় মিল নাই;—সমস্ত লেখাটি পড়িলে মনে হয় আবোল-তাবোল বলিতেছেন। আমাদের মনে হয়, এ সব ভাষা জ্ঞানের অভাবে,—ভুল ভাষা শিক্ষার পরিণতি এ। গোড়াতেই বলিয়াছি, ভাষাই চিন্তার জন্মদাতা ও বাহন;—সেই ভাষা যখন ত্রুটীপূর্ণ হয়, তখন চিন্তাও গোলমেলে না হইয়া পারে না। বাংলার মুসলমান সমাজে যে আজ পর্য্যন্ত কোন বড় চিন্তাশীল লোকের জন্ম হয় নাই, তাহার অন্যতম কারণ নির্দ্দেশ করা যায় ভাষাজ্ঞানের তথা পরিপূর্ণ চিন্তা-ক্ষেত্রের অভাব।

আরবী পার্সীতে সুপণ্ডিত লোক বাংলার মুসলমান সমাজে বিস্তর আছেন। কিন্তু ঐ সব ভাষা এবং সাহিত্য তাঁহাদের অন্তরের ভাষা এবং জীবনের খাদ্য হইতে পারে নাই। তাই তাঁহাদের শিক্ষা এবং কালচার কোন সময় পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। তাঁহা-দের হাসি এবং অশ্রুর—বোধ এবং অনুভূতির যে ভাষা সে বাংলা ভাষাই;—অথচ সেই বাংলা ভাষাকে তাঁহারা উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। ফলে বাঙালী মুসলমানদের চিন্তা-জগত একেবারে ফাঁকা রহিয়া গিয়াছে। ভয় হয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে যদি আমরা আমাদের কালচার এর ভাষা ও আমাদের জাতীয় সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ না করি এবং তাহা শিক্ষা করিবার জন্য, আয়ত্ত করিবার জন্য ভালরূপ বন্দোবস্ত না করি, তাহা হইলে সুদূর ভবিষ্যতেও আমাদের চিন্তা-জগত এমনি ফাঁকা থাকিয়া যাইবে,—আমাদের মধ্যে কোন চিন্তাশীলের, কোন বড় স্রষ্টার জন্ম সম্ভবপর হইবে না।"

আনোয়ার হোসেনের 'ভাষার জন্মকথা' (৯:১, আশ্বিন ১৩৩৯) মানবসমাজে ভাষার উৎপত্তি ও বিস্তার সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা করেছেন। পরস্পর সাদৃশ্য সন্ধানের সাহায্যে ভাষার শ্রেণীকরণের ও গোষ্ঠী নির্দেশের ঐতিহাসিক পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি সংক্ষেপে মন্তব্য করেছেন।

এ. কে. এম. হাবীবুল্লাহ-র 'বাঙ্গলা ভাষার বিবর্তন' (২৬:৫, চৈত্র ১৩৫০) ঐ প্রসঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ। বাংলাভাষার বিভিন্ন স্তর এখানে নির্দেশিত হয়েছে।

'বাংলা ভাষার সংস্কার' প্রবন্ধে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (২৭:৩, মাঘ ১৩৫১) সংস্কার মুক্ত মনে অগ্রসর হবার পরামর্শ দিয়েছেন। তার প্রবন্ধটির মূল অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হল :

"অনিয়ম আমাদের ভাষায় রয়েছে বানানের দিক দিয়ে ; অভাব রয়েছে প্রথমতঃ ইসলামী সংস্কৃতির বিশেষ বিশেষ ভাবব্যঞ্জক শব্দের দিক দিয়ে এবং দ্বিতীয়তঃ সাধারণ ও পারিভাষিক বিদেশী শব্দের তরজমার ক্ষেত্রে সঠিক বাংলা পদ নিরূপণ বা নতুন শব্দ গঠন নিয়ে ; আর বাহুল্য রয়েছে বানান ও বর্ণমালায় কতকগুলো পরিহার্য অক্ষর সম্পর্কে। আরো একটা বাহুল্যের কথা এই বলা যায় যে, যে-সব বিদেশী বা নতুন চিন্তা বা ভাব একটু সতর্ক ও অধ্যবসায়শীল হ'য়ে নির্ব্বাচন করলে আমরা প্রচলিত সাধু বা গ্রাম্য শব্দ দিয়ে প্রকাশ করতে পারি, তার জন্যে নতুন শব্দই সাধারণতঃ তৈরী করে নিই, অসুবিধা দেখলে বিদেশী শব্দগুলোই হয়তো বাংলা হরফে লিখে দিই। বিশৃঙ্খলার এতো-সব দৃষ্টান্তের ওপরেও আরো একটা উদাহরণ এই দেওয়া যায় যে, আমরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অর্থব্যঞ্জক কতকগুলো বিদেশী শব্দের তরজমা করতে গিয়ে একই বাংলা শব্দ কাজে লাগাই।

এ সমস্তেরই যথাসম্ভব প্রতীকার হওয়া সঙ্গত। সাহিত্যিকরা নিরঙ্কুশ হওয়ার গৌরব নিয়ে থাকলেও ভাষাকে সব দিক দিয়ে—যতোটা পারা যায়—সুশৃঙ্খল, বাহুল্যবর্জিত অথচ পরিপূর্ণ অবয়বে নিয়ে যেতে কারুরই আপত্তি হওয়া ঠিক নয়। একটা শব্দকে কেউ লিখবেন 'কোন', অন্যে লিখবেন 'কোনো', আবার কেউবা লিখবেন 'কোনোও,' এর সত্যিই কী প্রয়োজন থাকতে পারে? অপর একটা শব্দকে কেউ লিখবেন 'হল', কেউ 'হলো', কেউ বা 'হোল', আবার কেউবা লিখবেন 'হোলো'—এমন অব্যবস্থার গরজটা আমাদের কী? এই রকম দৃষ্টান্ত ঢের দেওয়া যেতে পারে। আমি ভাবি, এই অনিয়ম নিয়ে নিরঙ্কুশ হওয়ার শ্লাঘা আমরা করতে যাই কেন? ব্যক্তিগত অভিমান বা খোশ-খেয়াল এই ভাবে চরিতার্থ করে মাতৃভাষাকে কতোটুকু গৌরব আমরা দিতে পারি? একজন অবাংলাভাষী যদি বাংলা শিখতে এসে এই ধরনের অনিয়মের ভেতর পড়েন, তিনি কি বিশ্রী মতই না পোষণ করবেন আমাদের সুন্দর ভাষাটির সম্বন্ধে! আমি বাংলার সাহিত্যিকদের দরবারে এই প্রশ্নটী আজ দাখিল করি যে, তাঁরা কি অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয় ও পুস্তক-প্রকাশক সমিতির সহযোগিতা নিয়ে বাংলার প্রধান প্রধান খ্যাতনামা সাহিত্যিক-দের একটা সম্মেলন ডেকে এ সম্বন্ধে কোনো মত স্থির করতে পারেন না? সাহিত্যিকরা যদি অবুঝ না হন, তাঁদের এ সম্পর্কে একটা সর্বজনগৃহীত সিদ্ধান্ত মেনে না চলবার কোনো কারণই থাকতে পারে না। সাহিত্যে রস বা সৌন্দর্য সৃষ্টি নিশ্চয়ই বানান সম্পর্কে স্বেচ্ছাচারের ওপর নির্ভরশীল নয়। তা'হলে এ ব্যাপারে সাহিত্যসেবকদের মোটামুটি একমত হয়ে চলতে আপত্তি কি?

অবশ্যি বাংলা বানান সম্পর্কে এর চাইতেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য বা প্রস্তাব বাজারে চালু হ'য়েছে। আমাদের ভাষাটীর অক্ষর বাহুল্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে পরে সে

বিষয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করছি। এখানে অনিয়মের পর আমাদের ভাষার অভাব সম্বন্ধেই বলি।

ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী সংস্কৃতির বিশেষ বিশেষ ভাবদ্যোতক বিদেশী শব্দ এমন অনেকগুলো রয়েছে, বাংলায় যার তরজমা করতে গেলে তাদের সম্পূর্ণ ভাব রক্ষা পায় না। নামাজ (আরবী সালাত), রোজা (আরবী সিয়ম), হজ, জাকাত, ফিতরা, কলেমা, কোরবাণী ইত্যাদি বহু শব্দ ইসলাম ধর্মের সঙ্গে জড়িত। এগুলোর বাংলা অনুবাদ হওয়া সম্ভব নয়, সঙ্গতও নয়। সম্ভব নয় এইজন্যে যে, মুসলিম সমাজ ছাড়া বাংলার আর কোনো সমাজে এ-সব অনুষ্ঠান কোনো দিনই প্রচলিত ছিল না এবং ভবিষ্যতেও হবে না। আর সঙ্গত নয় এই কারণে যে, এ-সবের পরিপূর্ণ ও বিশিষ্ট অর্থবোধক শব্দ বাংলায় তৈরী হতে পারে না ; এবং তৈরী করতে গেলেই তাতে ইসলামাতিরিক্ত ব্যঞ্জনা ঢুকে পড়বে। সেটা অনাবশ্যক এবং অবাঞ্ছনীয়।

এ ছাড়া আরো অনেকগুলো ইসলামী শব্দ রয়েছে, যা বাংলায় গৃহীত হওয়া সঙ্গত। একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায় 'শহীদ' শব্দটী, যার ইংরেজী তরজমা হতে পারে—martyr. বাংলায় 'নিবেদিত প্রাণ' বা 'উৎসৃষ্ট প্রাণ' বললে 'শহীদ' বা martyr এর মতো সুন্দর ও সম্পূর্ণ ক'রে কথাটা বলা হয় না। এইরকম সাধারণ ও অসাধারণ আরো অনেক কথা রয়েছে, যা বাংলায় ব্যবহৃত হ'লে আমাদের ভাষার প্রকাশশীলতা বেড়ে যাবে। সাধারণ কথার একটা দৃষ্টান্ত ইংরেজী uuderstanding শব্দটী। বাংলায় এর অনুবাদ করা হয় চুক্তি, আপোষ ইত্যাদি কথা দিয়ে। কিন্তু ইংরেজী pact শব্দটীরও তরজমা এই সব কথা দিয়ে করা যায় এবং করা হয়। কাজেই প্রথমোক্ত (understanding) কথাটীর অনুবাদ আমরা হিন্দুস্তানী বা উর্দু 'সমঝোতা' শব্দ দিয়ে করতে পারি এবং করলেই ভালো হয়।

এইভাবে বাংলার প্রকাশশীলতা ও সৌন্দর্য বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কিছু অপ্রচলিত আরবী, পারসী ও উর্দু বা হিন্দুস্তানী শব্দ আমরা নিয়ে নিতে পারি। এতে আমাদের হিন্দু ভ্রাতারা আপত্তি না করলেই বাংলার কল্যাণ হবে। এবারকার প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাস ও সংস্কৃত শাখার সভাপতি ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এটা স্বীকার করেছেন দেখে খুশী হওয়া গেলো। বাংলার হিন্দু সাংবাদিক ও সাহিত্যিকরা এ পর্য্যন্ত এদেশী মুসলিমদের অনেক নামও শুদ্ধভাবে লিখতে বা বলতে শেখেন নি, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার। এক্ষেত্রে তাঁদের অজ্ঞতা বা ঔদাসীন্য কতোখানি শোচনীয়, তা বুঝতে পারা যায় এইটুকু ভেবে দেখলে যে, যাঁরা—স্বয়ং সুনীতিবাবুর মতেই কিছু সংখ্যক অপ্রচলিত আরবী, পারসী ও উর্দু শব্দ শিখে নিতে পারলে ভালো হয়, তাঁরা প্রতিবেশী মুসলিমদের সাধারণ ও অত্যন্ত প্রচলিত নামগুলোই আজ পর্য্যন্ত আয়ত্ত করলেন না।

এরপর আসে বাংলায় পারিভাষিক শব্দের অভাবের কথা। এ সম্বন্ধে ঢের কথা বলাবলি হয়ে গেছে এবং ম্যাট্রিকুলেশনে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান, ভূগোল, বীজগণিত, জ্যামিতি প্রভৃতি বিষয় শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এপক্ষে উদ্যোগী হয়েছেন। বস্তুতঃ আজকাল কোনো কোনো অভিধান-গ্রন্থে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিষয়ের সচরাচর ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলোর অনুবাদ হিসেবে বাংলা শব্দের ফিরিস্তিও ছাপা হয়ে গেছে। তবে এই তালিকা সম্পূর্ণ কি না এবং ঐ সব বিষয়ে বাংলা বই লিখিয়েরা ঐ ফিরিস্তি দেখে শব্দ ব্যবহার করেছেন কি না, তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে মোটামুটী এটা হয়তো বলা যায় যে, আমাদের লেখকরা

খোশখেয়াল বা ব্যক্তিগত অভিরুচির যতোখানি ভক্ত এবং স্বপ্রধান হ'তে যতোখানি ইচ্ছুক তাতে ঐ ফিরিস্তির ওপর খোদকারি কিছু না কিছু নিশ্চয়ই চলছে। যাহোক, এসম্পর্কে আমার বক্তব্য বেশী কিছু হওয়া সঙ্গত নয়। তবে এ ছাড়া আর একটী কথা আমি জোরের সঙ্গে এই বলতে চাই যে, পারিভাষিক শব্দ নির্বাচন বা নতুন তৈরী করতে গিয়ে আমরা কঠিন ও দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দের দিকেই খুব বেশী নজর দিয়েছি। প্রচলিত সহজ শব্দগুলোকে আমরা এক্ষেত্রে একেবারেই আমল দিতে চাই নি; অথচ এমন কিছু কিছু সহজ বা কথ্য গ্রাম্য শব্দ নিশ্চয়ই পাওয়া যায়, সেগুলো নিয়ে মিলে ব্যবহারের গুণে তাদের এক একটা পারিভাষিক অর্থ পাঠকদের কাছে পরিস্কার হয়ে যাবেই। এটা করা দরকার আরো এই কারণে যে, অধুনা বাংলা ভাষার মোটামুটী প্রবণতা সহজের দিকে, দুর্বোধ্য কঠিনের দিকে নয়। আমাদের ভাষার এই প্রবণতা নষ্ট হ'তে দেওয়া যায় না; দিলে তার সঙ্গে অল্প শিক্ষিত পাঠক সাধারণের যে যোগটা ক্রমশঃ স্থাপিত হচ্ছে, তা ফের কেটে যাবে। কেউই এমন কথা বলতে পারবেন না যে, সেটা কোনো-রকমেই বাঞ্ছনীয়। এবং তা যদি বাঞ্ছনীয় না হয়, তাহ'লে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ইত্যাদি বিষয়ের বইয়ের ভাষা বা তাতে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ যতোখানি সম্ভব সহজ হওয়াই কি উচিত নয়? আমার সন্দেহ হয়, ভাষার সহজ রূপের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা নিয়ে কেউ এদিক দিয়ে কথাটা ভেবে দেখতে চান নি। এটা অবশ্যই স্বীকার করি যে, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক বা অনুরূপ অন্যবিধ বিষয়ের বই সাধারণতঃ আনাড়ী পাঠক সাধা-রণের খাদ্য নয়, কাজেই এক্ষেত্রে ভাষা তাঁদের বোধ্য কি অবোধ্য সেটা বেশী করে না দেখলেও চলে। কিন্তু এটাও স্মরণ রাখা দরকার যে, বিশেষ বিশেষ বিষয় নিয়ে লেখা বইগুলোও আমাদের সাহিত্যের অঙ্গ হ'য়েই থাকবে, এবং সে হিসেবে তাদের ভাষা এবং আমাদের সাহিত্যের সাধারণ ভাষা মোটামুটি একই রকম না হ'লে বিদেশী ভাষায় লেখা বই এবং সেগুলো শিক্ষার্থীর বা পাঠার্থীর পক্ষে প্রায় একই রূপ অপাচ্য, অন্ততঃ দুষ্পাচ্য, হ'য়ে পড়বে। আশা করি, কেউই একথা বলবেন না যে, তাতে আমাদের ভালোই হবে।

এরপর বাহুল্যের দিকে মনোযোগ দেওয়া যেতে পারে। অক্ষর এবং বানান প্রণালীর ভেতরেই আমাদের ভাষার বাহুল্যটা দেখবার মতো। এদিকে এর আগে থেকেই অনেকে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং সংস্কার-প্রস্তাবও উপস্থিত করেছেন। কিন্তু সে সব প্রস্তাব আজো কার্যতঃ মেনে নেন নি, দেখা যায়। আমাদের একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক এ বিষয়ে সম্প্রতি নতুন একখানা বই লিখেছেন এবং তাতে এসম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন (বাংলা ভাষার সংস্কার : মৌলবী আবুল হাসানাৎ)। তাঁর আলোচনার পদ্ধতি সুন্দর এবং বৈজ্ঞানিক।

তাঁর অধিকাংশ বক্তব্যই এমন শক্ত যুক্তির ওপর খাড়া করা হয়েছে যে, তা ফেলে দেবার উপায় নেই। অবশ্যি তাঁর সব কথা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়; সংক্ষেপে কিছু বলা যেতে পারে।

প্রথমে আমাদের স্বরবর্ণ মালাটীর বিচার করা যা'ক। পূর্বে দীর্ঘ ঋ, এমন কি দীর্ঘ ৯, আমাদের স্বরবর্ণে ছিল। এখন এ দু'টী আপদ চুকেছে; কিন্তু আরো কতকগুলো রয়ে গেছে। ৯ অক্ষরটার সত্যিই কোনো দরকার বাংলায় নেই; সুতরাং এটাকে স্বচ্ছন্দে বাদ দেওয়া চলে। তারপর ঈ, ঊ, ঐ, ঔ,—এই চারটী হরফ না হ'লেও কি আমাদের চলে না? অনেকের এবং উপরোক্ত সমালোচকের মতে খুব চলে। বাংলায় প্রকৃত প্রস্তাবে ই-কার থেকে ঈ-কারের এবং উ-কার থেকে ঊ-কারের কোনো স্বতন্ত্র উচ্চারণ আমরা করি না। কাজেই ই এবং উ-এ দু'টী হরফ নিয়েই আমরা খুশী থাকতে পারি, ঈ এবং

উ'র ঝামেলার কোনো দরকার করে না। একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ নিতে বহু দৃষ্টান্তেই যখন আমাদের আপত্তি নেই, তখন একই 'দিন' শব্দটীর অর্থ কোনোখানে দিবস, কোনো স্থলে দরিদ্র ধ'রে নিলে কিছুই আসে যায় না। আবার 'ভূত' শব্দটাকে 'ভুত' লিখলেও মানের কোন তারতম্য হবে না। অতএব, ঈ এবং উ-টাকে বাদ দিয়ে আমরা স্বরবর্ণের সংখ্যা কমাতে পারি।

ঐ এবং ঔ হরফ দু'টীও বাদ দেওয়া চলে, কেননা এরা কোনো মৌলিক স্বর-ধ্বনি নয়, মিশ্রধ্বনি মাত্র। ঐ এবং ঔ হরফ দু'টীর উচ্চারণ অই ও অউ। কাজেই এদেরে ত্যাগ করেও বিভিন্ন শব্দে এদের ধ্বনি বজায় রাখা যায়। 'শৈশব'কে 'শইশব' এবং 'মৌলিক'কে 'মউলিক'রূপে লিখলেও শব্দধ্বনিতে কোনো উল্লেখযোগ্য তারতম্য হয় না। অবশ্য এতে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণগত নিয়ম বাংলায় অচল হ'য়ে পড়বে; কিন্তু এজন্যে মনে খুঁতখুতি না আনলেও চলে, কেননা বাংলা সংস্কৃতের লেজুড় হ'য়ে থাকবে, এমন কোনো কথা নেই।

এটা অবশ্যি 'বাংলা ভাষার সংস্কার' পুস্তকখানির লেখক মৌলবী আবুল হাসানাৎ সাহেবের যুক্তি। এটা মান্‌তে আপত্তি নেই; তবে সংস্কৃত ব্যাকরণের সমস্ত নিয়ম পরিত্যাগ করতে চাইলে নতুন বাংলা শব্দ গঠনে—অন্ততঃ পয়লা পয়লা বিস্তর অসুবিধা হবে বলেই মনে হয়। কিন্তু এই বাধা অনতিক্রমণীয় নয়, এবং শুধু এর জন্যেই বাংলায় অক্ষর-বাহুল্য থাকা সঙ্গত হবে না।

ঋ হরফটীও অপরিহার্য নয়। 'ঋতু'কে 'রিতু' আকারে লিখলেও শব্দটা আমরা পেতে পারি। তবে এ অক্ষর নিয়ে তর্ক চলতে পারে। তা আমরা এখানে উত্থাপন করতে চাই না। আপাততঃ শুধু এই বলেই খুশী থাকা যাক যে, ঋ অক্ষরটি বাদ দিয়েও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কারবার চালানো যেতে পারে।

এরপর আসে ব্যঞ্জনবর্ণের কথা। ঙ, ঞ, ণ হরফ তিনটী না হ'লেও আমাদের আটকায় না। বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ ব'র উচ্চারণে বাংলায় কোনো তফাৎ নেই। কাজেই ব দু'টী না নিয়ে একটা নিয়েই খুশী থাকা চলে। শ, , স—এই তিনটী অক্ষরের উচ্চারণে বাংলায় কদাচিৎ পার্থক্য করা হয়। শরণ, আষাঢ়, সমান—এই তিনটী শব্দ শরণ, আশাঢ়, শমান—এই ভাবে লিখলেও বাংলাতে উচ্চারণের তারতম্য হয় না। আবার শ্রোতা ও স্রোত-এ দু'টী শব্দেও শ ও স'র উচ্চারণ বাংলায় একই রকম। এর থেকে মৌলবী আবুল হাসানাৎ সাহেব এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, মাত্র শ দিয়েই আমাদের কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। আমার মতে অন্ততঃ একটী জায়গায় এতে আটকাবে। 'প্রস্তাব' শব্দটাকে 'প্রশতাব' আকারে লিখলে বাঙালী পাঠক আসল উচ্চারণটা করতে চাইবে না। এক্ষেত্রে মৌলবী সাহেব 'প্রছ্‌তাব' আকারে কথাটা লিখতে বলতে পারেন। এ নিয়ে তর্কের অবতারণা এই প্রবন্ধে করতে চাই না। মৌলবী সাহেবের কথা মানলে 'শ' রেখে 'ষ' ও 'স' বাদ দিতে হয়। না মানলে বড়ো জোর 'শ' ও 'স' রাখতে হয়। 'ষ'র কোনো প্রয়োজনই নেই।

য ও জ'র উচ্চারণে বাংলায় তফাৎ করা হয় না। কাজেই এক জ দিয়েই আমাদের চলতে পারে। ঢ়'র উচ্চারণ বাংলায় আমরা প্রায়ই করি না। আষাঢ় শব্দটাকে আষাড় উচ্চারণই করে থাকি। অবশ্যি রূঢ় কথাটাকে রূড় বলি না; কিন্তু এই রকম দু'একটা শব্দের জন্যে বর্ণমালায় একটা অতিরিক্ত অক্ষর না রেখে অন্য উপায়ে কাজ চালিয়ে নিতে পারি, যেমন রূঢ় শব্দটীর উচ্চারণ বিশুদ্ধ রাখবার জন্যে রূড়্‌হ্‌ লিখতে পারি।

মৌলবী আবুল হাসানাৎ সাহেব ँ (চন্দ্রবিন্দু চিহ্ন) ও খণ্ড (বা হসন্ত) ৎ-ও বাংলা থেকে তুলে দিতে চান। খণ্ড ৎ'র বেলায় প্রস্তাবটা সোজাই ; কিন্তু চন্দ্রবিন্দুর বেলায় ঢের প্রশ্ন উঠবে। যে সমস্তের জবাব তিনি তাঁর বইয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। অনু-সন্ধিৎসুদের তা জ্ঞাতব্য।

মোট কথা, এটা না মেনে উপায় নেই যে, আমাদের বর্ণমালায় কতকগুলো অক্ষর রয়েছে অনাবশ্যক বাহুল্যর মতো। সেগুলো বাদ দেওয়া যেতে পারে।

এ ছাড়া বাংলায় সংস্কৃত ভাষার মতো অতো সংখ্যক যুক্তাক্ষর না থাকলেও যা রয়েছে তাতেই মুদ্রণ ও টাইপরাইটিং ভয়ানক কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুতঃ আমরা ইচ্ছা করলে যুক্ত হরফ বর্জন ক'রেও বাংলা ভাষা লিখতে পারি, বাংলা বই ছাপতে পারি ; এবং পাঠক সমাজ অল্প কিছুদিন রপ্ত করলেই তা পড়তে পারবেন এবং পড়তে সোয়াস্তি বোধ করবেন। আর আজ যদি আমরা যুক্তাক্ষর একদম ছেড়ে দিই, ভবিষ্যতের পাঠকরা তো আমাদেরে রীতিমতো আশীর্বাদই করবেন, মনে হয়। এসম্বন্ধে আমাদের মৌলবী আবুল হাসানাৎ সাহেব তাঁর বইটাতে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সে সমস্তই চিন্তাশীলদের প্রণিধানযোগ্য।

এরপর আমাদের ভাষার বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে ক'টী কথা ব'লে প্রবন্ধের উপসংহার করবো। প্রথম বিশৃঙ্খলা আমাদের ভাষার ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের যোগের বেলায়। আ-কার আমরা বসাই হরফের ডা'ন ধারে, কিন্তু ই-কার বসাই বাঁ-ধারে। ঈ-কার বসাই ফের ডান পাশে, এ-কার দিই ফের বাঁ-দিকে। উ-কার ঊ-কার দিই বেশীর ভাগ হরফের নীচে, আবার দু'এক স্থলে ডান পাশে বা হরফের মাথায়। ঋ-কারের বেলাতেও তাই। ও-কার এবং ঔ-কারের খানিকটা বসাই ডান ধারে। মানে, ব্যাপার একেবারে পাগলামির মতোই। এতে প্রথম শিক্ষার্থীর অসম্ভব ক্লেশ হয়, মুদ্রাকর ও টাইপিষ্টদেরও বিষম অসুবিধা। এ-পাগলামি ইচ্ছা করলে আমরা ছাড়তে পারি। ঈ, ঊ, ঐ, ঔ ইত্যাদির ব্যবহার যদি আমরা তুলে দিই, সমস্ত স্বরযোগই প্রয়োজনীয় স্থলে স্বর চিহ্নের আকৃতি বদ্‌লিয়ে ব্যঞ্জনের ডান ধারে আনা যেতে পারে। তাতে লিখন, মুদ্রণ ও টাইপরাইটিং যে কতো-খানি সোজা হ'য়ে পড়বে, তা কল্পনা করতেও আনন্দ বোধ হয়। কিভাবে এটা করা যায়, তা আমরা প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করতে চেষ্টা পাবো। আজ এ সম্পর্কে মৌলবী আবুল হাসানাৎ সাহেবের বইটার বরাত দিয়েই খালাস পেতে চাই।

দ্বিতীয় বিশৃঙ্খলা আমাদের ভাষায় রয়েছে অপারিভাষিক সাধারণ বিদেশী শব্দের তরজমার বহু দৃষ্টান্ত। দু'একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দিয়েই শেষ করি। পত্রিকার কার্যকারককে ইংরেজীতে বলা হয় এডিটার (Editor) এর বাংলা অনুবাদ হয়েছে সম্পাদক। কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যকারককে ইংরাজীতে বলা হয় সেক্রেটারী (Secretary); এও বাংলা অনুবাদ সম্পাদক। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি না হ'য়ে কোনো ব্যক্তিবিশেষের সেক্রেটারি হ'লে তাঁকে আজো বাংলায় সম্পাদক আখ্যা দেওয়ার রেওয়াজ হয়নি। কোনো মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশান বা কোনো কম্পানি প্রতিষ্ঠান হ'লেও সভাসমিতি নয় ; সম্ভবতঃ এই কারণেই কর্পোরেশান বা কম্পানির সেক্রেটারি-উপাধিক কর্মচারীকে বাংলায় সম্পাদক বলা হয় না। তাহ'লে ব্যক্তিবিশেষের বা কর্পোরেশানের বা কম্পানির সেক্রেটারিকে বাংলায় কি নাম দেওয়া যাবে ? আর একটী দৃষ্টান্ত ইংরেজী পাবলিক (Public), জেনারেল (General) ও কমন (Common) শব্দ তিনটী। পাবলিক'কে বাংলায় 'সাধারণ' বলা হয়। জেনারেল সেক্রেটারিও বাংলায় সাধারণ সম্পাদক ; আবার কমন প্যাশচারও (common

pasture) সাধারণ গোচারণ ভূমি। এক 'সাধারণ' শব্দটাকে এতো কাজে লাগালে কিছুটা গোলযোগ সৃষ্টি হয় বই কি?

এই ধরনের দৃষ্টান্ত আরও ঢের দেওয়া চলে। কিন্তু তা দিয়ে প্রবন্ধের কলেবর বাড়ানো নিষ্প্রয়োজন।

মোট কথা, নানা দিক দিয়ে আমাদের মাতৃভাষাটার সংস্কার হওয়া বাঞ্ছনীয়। রাষ্ট্র স্বাধীন ও স্বাদেশিক হ'লে এ পক্ষে চেষ্টা অনেকখানি সহজ-সাধ্য হতো। কিন্তু পরা-ধীনতার ভেতরেও এ বিষয়ে আমাদের হাত গুটিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকার কারণ আছে, মনে হয় না। পূর্বেই বলেছি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও পুস্তক প্রকাশক সমিতি পত্রিকা সম্পাদক সংঘের প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের নিয়ে যদি এ সম্পর্কে উদ্যোগ করেন, সংস্কারের কাজ অন্ততঃ কিছুটা অগ্রসর হ'তে পারে। ভাষাতে যতোটা সম্ভব শৃঙ্খলা আনয়ন এবং তাকে যথাসম্ভব সহজ সরল করাই একাজে আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। নইলে গোঁড়া পণ্ডিতরা যদি মনে করেন বাংলাকে সংস্কৃতের লেজুড় ক'রে রাখাই তাঁদের ধর্ম, হিন্দু যদি মনে করেন বাংলায় আরবী, পারসী, উর্দু শব্দ দু'টার জায়গায় চারটা আমদানি হ'লেই ভাষাটার জা'ত যাবে, পূর্ব বঙ্গবাসী যদি ভাবেন বাংলাকে বেশী রকম সোজা করতে গেলে তাতে পশ্চিম বাংলার কথ্য বা গ্রামজ শব্দ এসে তাঁদের অসুবিধা বা অপমান ঘটাবে, তাহ'লে আমাদের ভাষার গতি কি হবে, তার কোনো ঠিকানাই থাকবে না। আমাদের সামনেটা এতোখানি অনিশ্চিত রেখে লাভ কি?''

মিজানুর রহমানের 'বাংলা ভাশার সংস্কার' (২৭:৬, বৈশাখ ১৩৫২) প্রবন্ধের শিরোনামেই প্রাবন্ধিকের সংস্কার প্রবণতা উপলব্ধি করা যায়। তিনি হরফ কমানো ও যুক্তাক্ষর বর্জনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

অন্যদিকে আবুল মনসুর আহমদ ('বাংলা ভাষার সংস্কার', ২৭:১২, কার্তিক ১৩৫২) জোর দিয়েছেন হিন্দু ও মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গির উপর। তার মতে :

''কাজেই হিন্দু ভাইরা যদি বাংলা ভাষার বর্তমান হিন্দু আঙ্গিক ত্যাগ করে মুসলিম আঙ্গিক গ্রহণ করেন, তবে এক সাথে দুটো লাভ হবে। এক, বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের এক ভাষা ও এক সাহিত্য থাকবে। দুই, বাংলা ভাষা উর্দু ও হিন্দীর সাথে বাজী রেখে চলতে পারবে। হিন্দী ও উর্দ্দু লম্বা দৌড়ে নিজেদের বিস্তারিত ও প্রসারিত করে সারা ভারত গিলতে চেষ্টা করছে। তার জন্য তারা নিজেদের আঙ্গিক বা ফরমকে সারা ভারতীয় করবার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। আমরা যদি উর্দ্দু ও হিন্দী ভাষা থেকে বাংলা ভাষার সাহিত্যকে হেফাজত করতে চাই, তবে বাংলা ভাষার আঙ্গিককে সারা ভারতীয় করে তুলতে হবে। সেটা করতে হলে বাংলা ভাষার মুসলিম আঙ্গিককে হিন্দু ভাইদের গ্রহণ করতে হবে।

আর তা যদি হিন্দু ভাইরা না করেন, তবে হিন্দু বাংলা ও মুসলিম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পৃথক হয়ে পড়তে বাধ্য। শুধু বানান ও লিপি-সংস্কারে এ সম্ভাবনা রোধা যাবে না।''

'সওগাত'-এর ভাষাবিষয়ক আলোচনার সমকালীন উত্তাপ এভাবে ধরা পড়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সাহিত্যসম্মেলন : অভিভাষণ

'সওগাত' প্রথমাবধি বিভিন্ন সাহিত্য সম্মেলনের সংবাদ ও বিবরণ প্রকাশ করেছে। প্রথম বর্ষেই প্রকাশিত হয়েছিল চট্টগ্রাম সম্মেলনের সচিত্র বিবরণ ('মহামিলন', ১:৩, মাঘ ১৩২৫)। পরবর্তীতেও এই রীতি অব্যাহত থেকেছে। 'সাহিত্য সংবাদ' পরিচ্ছেদে তার কিছু সংকলিত হবে (পরে দ্রষ্টব্য)।

তবে শুধু সম্মেলনের সংবাদ ও বিবরণই নয়, সওগাতে প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সম্মেলনের প্রধান প্রধান অভিভাষণ। এ সব অভিভাষণ একদিকে যেমন বক্তার অভিমত অন্যদিকে তেমনি সমকালীন সাহিত্যচিন্তার প্রতিনিধি। মুদ্রিত বিভিন্ন অভিভাষণের মধ্যে যেগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তার তালিকা নীচে দেয়া হল :

১.	মুসলিম সাহিত্যসমাজ, তসাদ্দুক আহমদ,	চৈত্র	১৩৩৩
২.	মুসলিম সাহিত্যসমাজ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	বৈশাখ	১৩৩৬
৩.	অভিভাষণ, কাজী কাবদুল ওদুদ,	পৌষ	১৩৩৯
৪.	সাহিত্যের স্বরূপ, কাজী আবদুল ওদুদ,	পৌষ	১৩৪৪
৫.	অভিভাষণ, খান বাহাদুর আজিজুল হক,	জ্যৈষ্ঠ	১৩৪৬
৬.	বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্যিক জাগরণ, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ,	জ্যৈষ্ঠ	১৩৪৬
৭.	সাহিত্যের লক্ষ্য, এস. ওয়াজেদ আলি,	বৈশাখ	১৩৫২

২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ রবিবার অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার মুসলিম সাহিত্যসমাজের 'বার্ষিক সম্মিলন'। জনাব আবুল হুসেনের আমন্ত্রণে এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব তসাদ্দুক আহমদ। সভাপতির অভিভাষণে তসাদ্দুক আহমদ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেন যে বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা। তিনি মুসলিম সাহিত্যিকগণের কর্তব্য সম্পর্কেও সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেন। অভিভাষণে তসাদ্দুক আহমদ বলেন (৪:১০, চৈত্র ১৩৩৩) :

''মাতৃভাষার এমনি মহিমা যে, কথা বলাটাই যেন আনন্দের বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গলা যে আমার মাতৃভাষা সে কথাটা আপনাদের সমক্ষে জোর গলায় বলিতে আমার একটুও দ্বিধা বোধ হয় না। কারণ তাহা না হইলে আমার নিজের মা-কেই অস্বীকার করিতে হয়। এতটা অধোগতি আপনাদের আশীর্ব্বাদে এখনও আমার হয় নাই। এই বাঙ্গলা দেশে এমনও অনেক মুসলিম আছেন যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষাকে তাঁহাদের মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা বা অপমান বোধ করেন। তাঁহারা বলেন 'শরিফ' অর্থাৎ সদ্বংশজাত মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে মাতৃভাষাটাকে না বদ্‌লাইলে চলিবে না। আপনারাই পাঁচজনে বিচার করুন শিক্ষকতা করি বলিয়াই কি নিজের মা-কেও বেত্র হস্তে তাড়না করিব, 'অতঃপর তুমি তোমার ভাষা বদ্‌লাইয়া ফেলিবে, নতুবা তোমাকে মা বলিয়া স্বীকার করা আমার পক্ষে অপমান-জনক হইবে?' এই বাঙ্গলা দেশের লোক সংখ্যা ৪,৭৫,৯২,৪৬২ তার মধ্যে ২,৫৪,৮৬,১২৪ জন মুসলিম নরনারী। বন্ধুগণ, ভাবিয়া দেখুন এই এতগুলি মুসলিম নরনারীর ঘর, বাড়ী কাটিয়া, খাট, বিছানা, বাক্স, তোরঙ্গ, জমি জরাত সিন্দবাদের ন্যায় স্কন্ধে লইয়া 'মরাক্কো হাজোম' করিবার জন্য যেখানে বাঙ্গলা ভাষা নাই এরূপ প্রদেশে উঠিয়া গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করা কি

সম্ভবপর ? অপর পক্ষে উর্দ্দু ভাষাকে বাঙ্গলাদেশের পল্লীগ্রামসমূহে কলমের জোরে চালাই-বার যে নিষ্ফল প্রয়াস কিছুদিন পূর্ব্বে হইয়াছিল, তাহাও বোধ হয় আপনাদের অনেকের নিকট অবিদিত নহে।

এক সম্প্রদায় বলেন, 'আমরা বাঙ্গালী মুসলমান যে ভাষায় কথা বলি তাহা ঠিক বাঙ্গলা নয়; উর্দ্দু, পারসী, আরবী-বহুল এক মিশ্র ভাষা। সেই ভাষাই আমাদের সাহিত্যের ভাষা হওয়া উচিত।' কথাটা মন্দ নয়, কিন্তু তাহার মধ্যে একটা মস্ত গলদ রহিয়া গিয়াছে। আমির হামজা বা হাতেম তাইয়ের পুঁথি, কাসাসুল-আম্বিয়া বা সোনাভানের পুঁথি যে ভাষায় রচিত তাহা আমাদের সমাজে বহুতর ব্যক্তির আদরের জিনিষ হইতে পারে কিন্তু তাহা সাহিত্য হিসাবে পৃথিবীর লোকের নিকট আদরণীয় বা অনুকরণীয় কোন কালেই হয় নাই। তাহা হইলে আজ শুধু বটতলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া তাহা পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত।

সাহিত্য জিনিষটা কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে; সকলেরই তাহাতে সমান অধিকার। এই বাঙ্গলা দেশে আমরা হিন্দু মুসলিম দুইটি বৃহৎ সম্প্রদায় বহুকাল যাবৎ একত্র বাস করিয়া আসিতেছি। সাহিত্যকে গঠন করিবার জন্য ও পুষ্ট করিবার জন্য আমাদের উভয়েরই সমান অধিকার। কিন্তু বলিতে লজ্জা বোধ হয়, আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমরা এতদিন সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলাম। যখন বাঙ্গলা সাহিত্য হিন্দু সমাজের বহু কৃতী সন্তানের দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ গঠিত, পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতেছিল তখন আমরা কেবল সমরখন্দ ও বোখারা, আরব ও ইস্পাহানের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম আমলে যেমন অদূরদর্শী জননায়কগণের প্ররোচনায় পড়িয়া আমরা 'কাফের' হইবার ভয়ে ইংরাজী ভাষাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম, বাঙ্গলা ভাষার উদ্বোধনকালেও আমরা সেইরূপ দূরে দাঁড়াইয়া নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছি, আর পরের গালি খাইয়া নীরবে হজম করিয়াছি। আমি এখানে সেই হোসেনশাহী যুগের মুসলিম কবিগণের কথা উত্থাপন করিতেছি না, কারণ যদিও তাঁহারা এখন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের খোরাক যোগাইতে-ছেন, তথাপি সমাজের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিবার জন্য আমাদের সাহিত্য জীবনকে কতদূর কর্ম্মঠ ও বলিষ্ঠ করিয়াছেন, তাহা আমাপেক্ষা আপনারাই নিশ্চয় ভাল বুঝিবেন। আসল কথা, প্রধানতঃ যে উপাদান দিয়া জাতীয় জীবন গঠিত হয় তাহা নির্দ্ধারণ করিতে আমাদের বহু কালক্ষয় হইয়াছে; এখনও সম্যক উপলব্ধি হইয়াছে কিনা সন্দেহ। তবে আশা হয় আপনাদের ন্যায় অনুষ্ঠানের যতই বৃদ্ধি হইবে, ততই পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আমরাও জনসমাজের অপর দশজনের ন্যায় আদৃত, সম্মানিত হইতে থাকিব।

মানুষ সংসারে একাকী বাস করিতে পারে না। সঙ্ঘ বা সমাজবদ্ধ হইয়া থাকাই তাহার অভ্যাস। সমাজের উত্তরোত্তর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, তাহার অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গের সম্বন্ধ নানা প্রকারে ক্রমে জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠে। এই সম্বন্ধ নির্ণয় ব্যাপারে মানুষ ভাষার দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে এবং অপরের নিকট নিজেকে বোধগম্য করে। মনের ভাবকে মূর্ত্তরূপে প্রকট করিবার জন্য মানুষের কী প্রচেষ্টা! সঙ্গীতে, কাব্যে, চিত্রে, অর্থবোধক শব্দের আকারে, নানা উপায়ে মানুষ স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত করে। সুতরাং ব্যাপক অর্থে যে যে উপায় দ্বারা মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে তাহাই সাহিত্য। যে জাতির এই সকল উপায় যত কম সেই জাতি সাহিত্য হিসাবে তত দরিদ্র। এই মাপকাঠি দিয়া দেখিলে বাঙ্গালী মুসলিম সমাজ আজ পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজ অপেক্ষা কত দরিদ্র! সাহিত্য আমাদিগকে জ্ঞান দান করে, আনন্দ দান করে, কর্ম্মের জন্য প্রেরণা সঞ্চার করে। আমরা এমনি হতভাগ্য যে আমাদের না আছে জ্ঞান লাভ করিবার

শক্তি, না আছে আনন্দ উপভোগ করিবার ক্ষমতা, না আছে কর্ম্মের জন্য উৎসাহ। যে সাহিত্যের অমৃতধারা আমাদিগকে নানা জ্ঞানে পুষ্ট করিতে পারিত, নূতন বলে বলীয়ান করিতে পারিত, কর্ম্মে উৎসাহিত করিতে পারিত, আমরা অর্ব্বাচীনের ন্যায় তাহা অবহেলা করিয়া আসিয়াছি। আজ আমরা অপরাপর সম্প্রদায়ের উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হই, কিন্তু আমাদের দুরবস্থার জন্য যে আমরাই প্রধানতঃ দায়ী তাহা এক বাতুল ব্যতীত আর কে অস্বীকার করিবে?

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, আমাদের সাহিত্যের প্রকৃতি কি হইবে? বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি আমাদের আবহমান কালের অবহেলার জন্য তাহা ভিন্ন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক এরূপে গঠিত হইয়াছে যে তাহাতে আমাদের নিজস্ব কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের পূর্ব্বতন ইতিহাস, আমাদের সমাজ, আমাদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, বাঙ্গলা সাহিত্যের অপর উপাসকগণের হইতে বিভিন্ন। অথচ বাঙ্গলা সাহিত্যই আমাদের একমাত্র সাহিত্য। এই অবস্থায় সেই সাহিত্যকে আমাদের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে না পারিলে আমাদের বাঁচিবার উপায় কি? আমার মনে হয় যে দেশে আমরা বাস করি, যে দেশের আবহাওয়ায় আমরা প্রতিপালিত, সে দেশের অপরাপর সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত থাকিয়াও আমরা আমাদের ব্যক্তিত্ব (Individuality) রক্ষা করিতে সক্ষম। যদি আমরা আমাদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলি, তাহা হইলে আমরা মুসলিম বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য নহি। সাহিত্য যখন সকলেরই সম্পত্তি তখন সকলেই তাহার কলেবর বৃদ্ধি করিবার সমান অধিকারী এবং সেজন্য সমান দায়ী। আমি আমার অংশটুকু দিলাম, আপনি আপনার অংশটুকু দিলেন, এই ভাবেই সাহিত্য বাড়িয়া উঠিবে। হিন্দু ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের অংশ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দিয়াছেন এবং দিতেছেন; আমরা আমাদের অংশ দিই নাই। এখন দিতে আরম্ভ করিয়াছি। ক্রমেই আমাদিগকে অধিকতর পরিমাণে দিতে হইবে। তখন আমরা বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলিম দুই ভাই একই ভাষা-জননীর পীযুষধারা পান করিয়া বলীয়ান হইব।

তারপর দেখুন, চেনা পরিচয় হইলেই তবে আত্মীয়তা হয়। সাত শত বৎসরের উপর হইয়া গিয়াছে আমরা একত্র বাস করিতেছি কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় এই দুই সম্প্রদায় পরস্পরকে কতটুকু চেনেন। বরং মুসলিম হিন্দুকে কিছু চেনেন কিন্তু হিন্দু মুসলিমের সম্বন্ধে খুবই কম জানেন। ইহার জন্য তাঁহাদিগকে দোষ দিতে পারি না। কারণ আমরা আমাদের পরিচয় এতদিন দিই নাই। এখন দিতে হইবে। নহিলে দেশের ভয়ানক অকল্যাণ হইবে। এই বাঙ্গলা সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের প্রকৃত পরিচয় দিব। তখন দেখিবেন পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রীতি কত বাড়িয়া যাইবে। যদি আমাদের মধ্যে বাস্তবিক কোন গুণ থাকে, যদি আমাদের ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম তাঁহারা অবগত হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানিবেন সৌহৃদ্য ও সখ্যভাব স্থাপিত হইতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব হইবে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের বিরোধ থাকিতে পারে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের অনৈক্য থাকিতে পারে, কিন্তু যদি আমরা সকলেই প্রকৃত মনুষ্য-পদ-বাচ্য হই তাহা হইলে সুপরিচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একের অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির অভাব দূর হইবে। এই মিলন সাহিত্যের ভিতর দিয়াই সাধন করিতে হইবে। রাজনৈতিক Pact এর দ্বারা কখনও সম্ভবপর হইবে না।

আমাদের সাহিত্য কি করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহাই এখন ভাবিবার বিষয়। বন্ধুগণ, অতীতকালে আমরা নবাব ছিলাম, বাদশাহ ছিলাম, সেই স্বপ্ন দেখিতে আমি আপনাদিগকে বলিতেছি না। সেই স্বপ্নের নেশায় এতদিন ভরপুর ছিলাম বলিয়াই আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। পারিপার্শ্বিক জগতকে বিস্মৃত হইয়া যখন মানুষ কেবল অতীত

কালেই বাস করিতে চায়, তখন সংসারপথে তাহাকে কেবল ঠক্করই খাইতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া অতীতকে একবারে ভুলিতে পারি না। মনুষ্যজীবনে, সমাজ-জীবনে অতীতের অনেক রেখাপাত থাকিয়া যায়, সেগুলিকে মুছিয়া ফেলা যায় না; মুছিয়া ফেলা সমীচীনও নয়। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সম্বন্ধ বড় ঘনিষ্ঠ। অতীতকে বিস্মৃত হইবার উপায় নাই, কারণ তাহা বর্ত্তমানের সহিত এক সূত্রে অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত। আমরা অতীত হইতে আমাদের inspiration (প্রাণশক্তি) গ্রহণ করিব। অতীতের শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, কাব্য সাহিত্য, ইতিহাস, কলাশিল্পকে বর্ত্তমান কালোপযোগী করিয়া জগতের সমক্ষে আমাদের গৌরব-পতাকা উড্ডীয়মান করিব। আমাদের নাই কি? ছিল না কি? যে ধর্ম্মে হজরত রসুল করিম মহম্মদ মোস্তফার ন্যায় নেতা পথপ্রদর্শক, উপদেষ্টা আছেন, যে ধর্ম্মে কোরাণ-মজিদের ন্যায় অমূল্য গ্রন্থ বিদ্যমান, সেই ধর্ম্মাবলম্বীগণের দুনিয়ার পাথেয় সংগ্রহ করিবার জন্য আবার চিন্তা?

মানুষ স্বভাবতই অনুকরণ প্রিয় এবং সেই অনুকরণ সে তাহাকেই করিতে চায় যাহার প্রতি তাহার ভক্তি ও শ্রদ্ধা বিশেষভাবে বিদ্যমান। হজরত মহম্মদ মোস্তফাকে অনুকরণ করিতে না চায় এমন কোন্ ভক্তপ্রাণ মুসলিম আছে? এইখানে বোধ হয় ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আমাদের সমাজে যে, 'মিলাদ' পাঠের ব্যবস্থা আছে তাহার ন্যায় বড় প্রহসন আর কিছু হইতে পারে কিনা সন্দেহ। আমরা ভক্তিভরে হজরত মহম্মদের নাম শ্রবণ করি, চোখে 'বোসা' (চুম্বন) দিই, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত জীবনী সম্বন্ধে কয়জন খোঁজ রাখি? নানা প্রকারের অলৌকিক, আজগুবি গল্পের অবতারণা করিয়া তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত পাঠ করিয়াই আমরা মিলাদ সমাপন করি। শিরণী (মিষ্টান্ন) বস্ত্রপ্রান্তে বাঁধিয়া হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিয়া যাই। যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলে আমাদের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার হইত তাহা আমাদের নিকট চিরদিন লুক্কায়িত থাকিয়া যায়। বন্ধুগণ, ধর্ম্ম জিনিষটা গৃহকোণে উঠাইয়া রাখিবার জিনিষ নয়। আবশ্যক মত তাহাকে সম্ভ্রমের সহিত উচ্চাসন হইতে নামাইয়া, করণীয় অনুষ্ঠানের সমাপ্তির পর পুনরায় সেই আসনে উঠাইয়া রাখিলেই কর্ত্তব্য শেষ হয় না। ধর্ম্ম দৈনন্দিন জীবনের ভিতর দিয়া সদা প্রবহমান। কথাবার্ত্তা, কাজকর্ম্ম, প্রত্যেক বিষয়েই ধর্ম্মাচরণ আবশ্যক। তাহার জন্য হজরত মহম্মদের ন্যায় আদর্শ ও মহামূল্য কোরাণের উপদেশাবলী থাকিতে আমাদিগকে অন্যত্র যাইবার আবশ্যক কি? 'মুসলিম' বলিয়া শুধু গগনভেদী চীৎকার করিলেই জীবনটাকে 'সেরাতুল মোস্তাকিম' (সরল পথে) চালিত করা সম্ভবপর হইবে না। আমাদের সমাজে একদল লোক আছেন, যাঁহারা বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান প্রতিপালনে পাকা মুস্‌লিম, কিন্তু ইসলামকে তাঁহারা বড় সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখেন; ইসলামের সার্ব্বভৌমিক উদারতা তাঁহাদের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারে না। সামান্য কারণেই তাঁহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। তাঁহারা মনে করেন যে, ইসলাম এমনি ক্ষণভঙ্গুর যে, ব্যক্তি বিশেষের সামান্য ভুলচুকেই ইসলামের সর্ব্বনাশ হইবে, ইহা রসাতলে যাইবে। আর এক সম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা মুসলিম বলিয়া পরিচয় দেন; মুসলিমের ন্যায্য গণ্ডা আদায় করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন কিন্তু ইসলামের অবশ্য করণীয় হুকুমগুলি মানিয়া চলা দুর্ব্বলতার চিহ্নস্বরূপ মনে করেন; মুসলিম বলিয়া পরিচয় দিয়াই সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইবার দাবী করেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, বাক্যে এবং কার্য্যে সামঞ্জস্য না থাকিলে অপরের শ্রদ্ধা সহজে পাওয়া যায় না। যাহা বিশ্বাস করি বলিয়া মুখে প্রচার করি তাহা যদি কার্য্যে পরিণত করিতে পরান্মুখ হই, তাহা হইলে আমি চরিত্রবান বলিয়া শ্লাঘা করিতে পারি না। Reformed Hindus এর ন্যায় Reformed Muslims হইতে পারি কিন্তু খোদ্ ইসলামকে সংস্কার করিতে গেলে ভিত্তিটাই শিথিল হইয়া যাইবে। তাহার উপর সৌধ স্থাপনের চেষ্টা করা বৃথা হইবে। জীবন সংগ্রাম বলুন, বিজ্ঞান বলুন, শিল্প বলুন, সাহিত্য বলুন, সবই একটা আদর্শের (ideal) অপেক্ষা করে। সেই আদর্শ না

থাকিলে সাধনায় স্পৃহা হয় না ; আবার সাধনা না থাকিলে সিদ্ধি লাভও হয় না। আমাদের সাহিত্যকে ইসলামের আদর্শে গড়িয়া তুলিতে হইবে ; প্রকৃত ইসলাম দ্বারা তাহাকে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। ইসলামের সঞ্জীবনী সুধায় সিঞ্চিত হইয়া আমাদের সাহিত্য অমর হইবে। প্রত্যেক মুসলিম নরনারী সেই সাহিত্য সুধা পান করিয়া অমর হইবে। প্রত্যেক মুসলিম বালক-বালিকার শিরায় শিরায় তন্তুতে তন্তুতে সেই শক্তিতাড়িত-প্রবাহের ন্যায় কার্য্য করিবে। সাহিত্যকে এরূপ গড়িতে হইলে অক্লান্ত পরিশ্রম আবশ্যক, প্রকৃত সাধনা আবশ্যক, আলস্যতা পরিহার আবশ্যক। এই নিগৃহীত, অনাদৃত অবজ্ঞাত বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের আপনারাই ভবিষ্যৎ কর্ণধার, ভবিষ্যৎ আশাস্থল। এটুকু আশা করা কি অন্যায় হইবে যে আপনারা ইসলামের সেই উচ্চ আদর্শকে বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজেরাও বরণ্যে হন, মুসলিম সমাজকেও ধন্য করেন?

প্রাতঃস্মরণীয় সার সৈয়দ আহমদ, মৌলানা শিবলি, হালি, নজির আহমদ, বেলগ্রামী, মোহসেনুলমুলক, এক্‌বাল, গালেব প্রমুখ মনিষীগণ উর্দ্দু সাহিত্যকে পৃথিবীর মধ্যে এক অতি উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। আমাদের বাঙ্গালী মুসলিম সমাজেও এইরূপ লোকের আবির্ভাব আবশ্যক। আপনাদের ন্যায় নবীন কর্ম্মীর দল যতই পুষ্ট হইবে, ততই সে আশা পূর্ণ হইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইবে সন্দেহ নাই।

ইসলামের ভাবধারা ও অনুপ্রাণনা আপাততঃ আরবী, পারসী এবং উর্দ্দু ভাষার মধ্যেই নিবদ্ধ। সাধারণের মধ্যে এই সব ভাষার প্রচলন আমাদের বাঙ্গলা দেশে তত বেশী নাই। ইহার কোনটিকেই, দেশবাসীর মাতৃভাষা বা জাতীয় ভাষা করাও সম্ভবপর নহে। সুতরাং এই সকল ভাষাবিদগণের নিকট আমাদিগকে বহুদিন পর্য্যন্ত ইসলামের ভাবধারার জন্য ঋণী থাকিতে হইবে। যাঁহারা ঐ সকল ভাষা জানেন তাঁহাদিগকে বাঙ্গলা ভাষায় ইসলামের আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। আবশ্যক মত ইসলামী ভাবাপন্ন শব্দাদী ধীরে ধীরে বাঙ্গলা ভাষায় প্রচলন করিতে হইবে। তাহাতে হিন্দু সাহিত্যিকগণ প্রথম প্রথম আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন কিন্তু আপনাদের শব্দের প্রযুজ্যতা বা ভাবের মহত্ত্বতা উপলব্ধি করিলে তাঁহারা তাহা গ্রহণ না করিয়া পারিবেন না। ভাষা ও সাহিত্য এইরূপেই শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হয়। জীবিত ভাষামাত্রেই এইরূপে তাহার বর্ত্তমান সম্পদ লাভ করিয়াছেন। আমাদের কোন কোন নবীন কবির আরবী ও পারসী শব্দ-বহুল পদ্য সাহিত্য আপাততঃ টীকা, টীপ্পনী সম্বলিত হইলেও সেই সময় সুদূর পরাহত নয় যখন সেগুলি সাহিত্যের বুকে বেমালুম স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া বসিবে। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। সমাজে বলুন, সাহিত্যে বলুন, এমন কি মানব-শরীরেও যখনই কোন নূতন কিছু প্রবেশাধিকার লাভ করিতে চায় তখনই বিষম দ্বন্দ্ব, তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় কিন্তু কালে সেই নূতনই পরম পুরাতন পরম মিত্র হইয়া দাঁড়ায়। আজ যদি টেবিলকে পীঠিকা, থিয়েটারকে রঙ্গমঞ্চ, সিনেমাকে চলচিচত্র প্রদর্শনী, আদালতকে ধর্ম্মাধিকরণ বলিতে যাই, তাহা হইলে আপনারা প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও মনে মনে নিশ্চয়ই হাসিবেন। সেরূপ নিপুণ শিল্পীর ন্যায় আপনি যদি ইসলামী বা উক্ত ভাব সম্বলিত বৈদেশিক শব্দসমূহ সহজ সরল ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করান, তাহা হইলে ভাষা বা সাহিত্যের উপর নিশ্চয়ই কোন অত্যাচার করা হইবে না। তাই বলিয়া ইদানীং মক্তব ও মাদ্রাসার জন্য মধ্যে মধ্যে যে একপ্রকার অস্বাভাবিক সাহিত্য দেখিতে পাই, তাহাতে সাহিত্যের পুষ্টি সাধন না হইয়া বরং অনিষ্টই হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। এ সম্বন্ধে আমার মত এই যে, এই কার্য্য অত্যন্ত নিপুণতার সহিত করিতে হইবে এবং যিনি এবিষয়ে তত সিদ্ধহস্ত ন'ন তিনি যদি এ চেষ্টা না করেন তাহা হইলেই ভাল হয়। যাঁহারা এ কাজে পাকা, তাঁহারাই করুন ; আমরা সকলে তাঁহাদের অনুসরণ করি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বলিয়া পারিলাম না। বঙ্গ সাহিত্যের কোন কোন খ্যাত-নামা লেখকের অনুকরণে আমাদের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল লেখক দেখা দিতেছেন যাঁহ রা তাঁহাদের অর্থটা ভাষার বাঁধুনিতে ও ভঙ্গিতে লুকাইয়া রাখিতে চান। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই অর্থটাকে দুর্বোধ করেন অথবা নকলের নাকালের মধ্যে পড়িয়া করেন, তাহা বুঝিতে একটু কষ্ট হয়। হয়ত বা আমারই বুদ্ধির দোষ; কিন্তু আমার মনে হয় 'বড্ড বোঝা যাচ্ছে' এই ভয়ে যদি ইচ্ছা করিয়াই দুর্বোধ হন তাহা হইলে তাঁহারা পাঠকবর্গের প্রতি অবিচার ত করেনই পরন্তু সৎসাহিত্যেরও সৃষ্টি করেন না। সৎসাহিত্য তাহাকেই বলিব যাহা আপনার ভিতরকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে জগতের লোকের নিকট তাহাদের উপকারার্থে নিবেদিত হয়। এরূপ সৎসাহিত্যের সৃষ্টি করিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন। আবার শিক্ষার জন্য আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড শিক্ষার আধার। জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদের শিক্ষা লাভের সময় আমরা স্কুল কলেজে বিদ্যাভ্যাস করি; বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়াই মনে করি আমাদের শিক্ষার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। সংসারক্ষেত্রেও আমাদের যথেষ্ট শিক্ষার বিষয় আছে। প্রকৃত শিক্ষার্থী কখনও বলে না 'আমি সব শিখিয়াছি, আমার আর শিখিবার কিছু বাকী নাই।' এই সংসাররূপ বিদ্যামন্দিরে বিনয়াবনত হইয়া যেখানে যেটুকু ভাল পাই তাহাই লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদা জাগ্রত, সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকাই শিক্ষার্থীর ধর্ম্ম। দাম্ভিকতা ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া আমাদিগকে সংসার পথে চলিতে হইবে। তবেই আমরা গৌরব লাভ করিব; সম্মানিত হইব। সাহিত্যপ্রচার কল্পে এইরূপ তপশ্চচরণ করিতে পারিলেই আমরা কৃতার্থ হইব।

সাহিত্য সৃষ্টির জন্য যে শিক্ষার এরূপ প্রয়োজন সেই শিক্ষার বাহন কি হইবে তাহা লইয়া আমাদের দেশে এক বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আমার মনে হয় এই আন্দোলনের মধ্যে অনেকটা কৃত্রিমতা আছে। কারণ যাহা সহজ, সরল বুদ্ধিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান তাহাকে তর্কের জালে আচ্ছন্ন করিয়া আসল কথাটাকে হারাইয়া ফেলি কেন? মানুষের ভাবসমুদ্রে যখন আন্দোলন উপস্থিত হয় তখনই ভাষার সৃষ্টি হয়। ভাবরাশি যদি আমার মাতৃভাষাতেই প্রথম মূর্ত্ত হয় তাহা হইলে তাহার প্রকাশই বা কেন অন্য ভাষাতে হইবে? হইতে পারে ইরেজী আমাদের রাজভাষা, হইতে পারে উর্দ্দু, আরবী পারসী আমাদের ধর্ম্মের ভাষা কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষার বাহন হইবার জন্য উহাদের একটিও ত উপযুক্ত নহে। ইংরাজী শিখিলে আমাদের সংসার জীবনে উন্নতি হইতে পারে, আমাদের নিকট জ্ঞানরাজ্যের দ্বারোদঘাটন হইতে পারে; উর্দ্দু আরবী পারসী শিখিলে আমরা ইসলামের তত্ত্ব ও তথ্য সমূহ অনেক জানিতে পারি সত্য, কিন্তু যখন এই সকল জ্ঞানরাশিকে আমার নিজস্ব করিতে হইবে, আমার রক্ত, মাংস, অস্থির ন্যায় আমারই এক মানসিক ও নৈতিক উপাদানে পরিণত করিতে হইবে তখন তাহা মাতৃভাষা ব্যতিরেকে কিরূপে সম্ভবপর হয় আমি বুঝি না। এ সম্বন্ধে আমি অধিক বলিতে চাহি না, কারণ ইতিপূর্ব্বে ইহার অনেক আলোচনা হইয়াছে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই আপনাদের নিকট নিবে ন করিলাম।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা আবশ্যক। জগতটা আজকাল ক্রমেই ক্ষুদ্রতর হইয়া আসিতেছে। নানা দেশের নানা ভাষার লোক আসিয়া আজ আমাদের কুটীরদ্বারে আঘাত করিতেছে। আমরা কূপমণ্ডুকের ন্যায় মাথা লুকাইয়া থাকিলে আর চলিবে না। সুতরাং অপরের সহিত মনের ভাবের আদান প্রদান করিবার জন্য, লেনাদেনার জন্য মাতৃভাষা ব্যতীত আমাদিগের আরও কয়েকটী ভাষা শিক্ষা করা দরকার। আজকাল পাশ্চাত্য প্রদেশ সমূহে মাতৃভাষা এবং ব্যক্তিবিশেষের জন্য একটী প্রাচীন ভাষা ব্যতীত এক বা ততোধিক আধুনিক ভাষা শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। বাঙ্গালী

মুসলমানের জন্যও আমার মতে অন্ততঃ দুইটি আধুনিক ভাষা শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যেহেতু ইংরাজী রাজভাষা ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান ভাষা এবং সাহিত্যের হিসাবে বড় সম্পদশালী ভাষা অতএব ইংরাজী আমাদিগকে শিখিতেই হইবে। তারপর উর্দ্দুভাষাও আমাদের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। উর্দ্দুভাষা আয়ত্ত করা বিশেষ কঠিন নহে, যেহেতু ইহাকে জীবিত ভাষা বলা যাইতে পারে। তারপর উর্দ্দুভাষার সাহায্যেই বঙ্গীয় মুসলমানের পক্ষে বাঙ্গলা সাহিত্যকে আমাদের উপযোগী করা অল্পায়াস সাধ্য হইবে। এজন্য আমি উর্দ্দুভাষা শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী। তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমার আর একটী বক্তব্য এই যে, সর্ব্বসাধারণের জন্য উর্দ্দুর কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহারা কেবল উচ্চ শিক্ষাভিলাষী কেবল তাঁহাদিগকে উর্দ্দু শিক্ষা করিতে হইবে। যেমন ফরাসী বা জার্ম্মান না জানিলে আজকাল কোন পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করা যায় না সেইরূপ এখানেও এই নিয়ম হওয়া আবশ্যক যে উচ্চ শিক্ষাভিলাষী মুসলিম ছাত্র মাত্রেই উর্দ্দু ভাষাভিজ্ঞ হইবে। তারপর আরবী আমাদের কোরাণের ভাষা ; যাঁহারা কোরাণের রত্নরাজি আহরণ করিবার জন্য অনুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন না তাঁহাদিগকে মূলভাষা শিক্ষা করা দরকার। এই ভাষা শিক্ষা-বিভ্রাট লইয়া আমাদের বহু সময় কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে পথও আবিষ্কৃত হয়। আমরা যদি মুসলিম বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করি তাহা হইলে আমাদিগকে আয়াস স্বীকার করিতে হইবে। প্রকৃত সাধকের ন্যায়, ভক্তের ন্যায় বিনম্রভাবে অথচ দৃঢ়তার সহিত এই কঠিন সমস্যার সমাধানে কৃত সঙ্কল্প হইতে হইবে। আলাদীনের প্রদীপ আমাদিগকে কেহ হাতে তুলিয়া দিবে না। একদিনেই আমাদের মুসলিম সাহিত্য সমাজকে সর্ব্ববিষয়ে গরীয়ান করিতে পারিব না।

বাঙ্গলা সাহিত্য ক্ষেত্রে আমাদের অভাব এবং মুসলিম সাহিত্যিকগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দুই চারি কথায় উল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। নবীন লেখকদিগের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাই, তাঁহারা সাহিত্যের আসরে নামিয়াই অন্ততঃ কিছুদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিবার জন্য এক দুর্ণিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁহাদের কবিত্বের পরিচায়ক স্বরূপ চাঁদের আলো, কোকিলের কুহুধ্বনি, পত্রের মর্ম্মর শব্দ, স্রোতস্বিণীর কুল্ কুল্ রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া চটিজুতা, পুঁইশাক, মিনি বিড়াল প্রভৃতি কোন বিষয়ই বাদ যায় না। বোধ হয় এটা কাল মহাত্ম্যের দরুণই হয়। যৌবনের প্রথম উন্মেষে সমস্ত পৃথিবীটাই রঙ্গীন মনে হয়। তখন কল্পনা রথে চড়িয়া বাস্তব জগতের উপর কেবল চোখ বুলাইয়া যাওয়া হয়। সুতরাং সংসারের বন্ধুর, কঙ্করময় পথগুলি তখন চোখে পড়ে না। তারপর যত বয়ঃবৃদ্ধি হইতে থাকে ততই বাস্তবের সহিত পরিচয়টা ঘনীভূত ও গাঢ়তর হয়। তখন কবিত্ব, হা হুতাস, ধীরে ধীরে উবিয়া যায়। ইহা হইতে আপনারা মনে করিবেন না যে আমি কাব্য সাহিত্যের নিন্দা করিতেছি। কাব্যের যে কি মহিয়সী ক্ষমতা তাহার প্রমাণ ইতিহাসে ভুরি ভুরি রহিয়াছে। তবে তাহা, কাব্যের মত কাব্য হওয়া চাই। আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের এখন যে ঘোর দুর্দ্দিন তাহাতে অসার কল্পনার দাস হইয়া আল্নশ্করের আকাশ কুসুম গড়িয়া কালক্ষয় করিলে আর চলিবে না। সমাজকে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং তাহার জন্য আল্লাহ্‌তালা যাহাকে যেটুকু ক্ষমতা দিয়াছেন তাহার ষোল-আনা সদ্ব্যবহার করিতে হবে। ধরুন শিশু-সাহিত্য ; মুদ্রাযন্ত্রের অনুগ্রহে আমাদের দেশের সেই পুরাতন কথকতা, গৃহের বৃদ্ধাদিগের সেই কেচ্ছা কাহিনী সবই লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। তাহাদের স্থান অধিকার করিবার জন্য দক্ষিণারঞ্জন, যোগীন্দ্র সরকার, সুকুমার রায় চৌধুরীর ন্যায় আমাদের মুসলিম সমাজে কয়জনের আবির্ভাব হইয়াছে? দুই একজন দেখা দিতেছেন, তাঁহারাও যথেষ্ট সহানুভূতি পাইতেছেন কিনা সন্দেহ। বালকদিগের জন্য জলধর সেনের ন্যায় পাকা লেখকও কলম ধরিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই ; কিন্তু আমরা সে দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিতেছি বলিয়া

মনে হয় না ; অথচ শৈশব এবং কৈশোরই ভাল বীজ বপন করিবার প্রশস্ত সময়। চরিত লেখকই বা সে রকম আমাদের মধ্যে কই ? বস্ওয়েল, হালি, যোগীন্দ্র বসুর ন্যায় চরিতাখ্যায়ক কি আমাদের বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে জন্মিতে নিষেধ আছে ? ওমর খাইয়ামের অনুবাদ করেন কান্তিবাবু, নরেন্দ্রবাবু, কোরাণ ও হাদিসের অনুবাদ করেন গিরীশ বাবু। আমরা কবে আমাদের মহামূল্য রত্নরাজি অনুবাদ সাহায্যে পৃথিবীর সমক্ষে উপস্থিত করিব ? বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' একবালের 'তারাণা' আমাদের মধ্যে কবে শুনিব ? রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান কথা, দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্য কৌতুক, রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভা, দিলীপকুমারের সঙ্গীত চর্চা, পুলিনদাসের লাঠিখেলা সবই আমাদের মধ্যে চাই। তবেই আমাদের সাধনার ফল পাইব। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবি, দার্শনিক হইতে না পারি, শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় ঔপন্যাসিক হইতে না পারি কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের আদর্শ ছোট হইবে কেন ? খোদার আরশ টলাইবার দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে স্থান না দিয়া যদি আমাদের প্রকৃত অভাব মোচনে সকলে নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে বদ্ধপরিকর হই তাহা হইলে সাফল্যের গৌরবে মণ্ডিত হইতে আমাদের অধিক বিলম্ব হইবে না। আপনাদের আজিকার এই অনুষ্ঠান দেখিয়া মনে হয় রোগনির্ণীত হইয়াছে। প্রতিকারের ব্যবস্থাও অচীরেই হইবে।…"

মুসলিম সাহিত্য সমাজের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব আবুল মোজাফফর আহম্মদ, বি. এ., বি-সি-এল, বার-এট-ল।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে (৬:১০, বৈশাখ ১৩৩৬), ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন :

সমবেত সাহিত্য-সেবী ভ্রাতৃবৃন্দ ও ভদ্রমণ্ডলী,

উপযুক্ত রূপে আপনাদের অভ্যর্থনা করি—এমন কিছু সম্বল আমাদের নেই। তাই শুধু 'সুনৃতা বাক্' দিয়ে আপনাদের অভিনন্দন করছি। স্বাগত মাতৃভাষার সাধকগণ! স্বাগত মাতৃভাষার সেবক ও ভক্তগণ! 'আহ্লান্ ওয়া সহ্লান।' 'খোশ আম্দেদ্।'

আজ দেশের মধ্যে মুক্তির ডাক এসেছে। কিন্তু সে ডাক অতি ক্ষীণ। দূরের বাঁশীর সুরের মত কখন সে কানে এসে লাগে, কি না লাগে। অলস ভীরু কাপুরুষ আমরা, তার উপর তন্দ্রা ঘোরে—আমরা চাই আমাদের জন্য তুরী ভেরীর তীক্ষ্ণ বিকট নিখাদ নাদ। তা না হ'লে জীবনের রাঙা পতাকার নীচে দলে দলে মুক্তি ফৌজ এসে জমবে না ; তা না হ'লে মুক্তির লড়াই আমাদের চলবে না : তা না হ'লে মুক্তি আমাদের মিলবে না।

তাই চাই আমাদের বীর্য্যবন্ত সাহিত্য। মাত্র একখানি পুস্তক আরবের বহু যুগের কাল-ঘুম ভেঙে দিয়ে সমস্ত দুনিয়া তোলপাড় ক'রে এক নতুন প্রাণ গড়ে তুলল। মাত্র একটী দীন প্রাচীন ফারসী শিরায় শিরায় আগুনের শিখা জ্বালিয়ে পুরাণকে ছাই ক'রে এক নতুন ভাব জগতে জাগিয়ে দিয়েছে। কলাম ও কলমের বাণী ও লেখনীর এমনই অপূর্ব্ব ক্ষমতা! তাই কুরআন তার, দৈবী ভাষায় ঘোষণা করছে—'নূন্ ওয়া-ল্ কলম্, ওয়া মা য়স্তুরূন' '(লক্ষ্য কর) দোয়াত, কলম এবং যা তারা লেখে' (সূরহ্ কলম)।

সাহিত্য যদি সত্যিকার সাহিত্য হয় সে মুক্তি দিবেই--দেহের মুক্তি, মনের মুক্তি, আত্মার মুক্তি। এই তিনটী নিয়েই মানুষ। একটী ছেড়ে অন্যের মুক্তিতে মুক্তি নেই।

সাহিত্যের সকল উদ্দেশ্যই ঘুরে ফিরে এসে দাঁড়ায় এখানে। এই মুক্তিকেই মাঝের বিন্দু ক'রে সাহিত্য চারিদিকে ঘুরবে। আলঙ্কারিক মম্মট ভট্ট কাব্যের ফল সম্বন্ধে বল্‌ছেন :—

কাব্যং যশসেহর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে।।

'কাব্য যশের জন্য, টাকা কড়ির জন্য, আচার ব্যবহার জান্‌বার জন্য, অমঙ্গল দূর করবার জন্য, সদ্য সদ্য পরম শান্তি লাভের জন্য, প্রেয়সীর ন্যায় উপদেশ দিবার জন্য।' সে সাহিত্য বিফল, ষোল আনাই বিফল, যা মুক্তির সন্ধান দেয় না।

আজ সাহিত্যের মার্কা নিয়ে একটা জিনিস বাজারে চল্‌ছে। শুনি তার খাঁক্‌তিও কম নয়, বিশেষ ক'রে যুবক মহলে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে তরুণ-তরুণীদের একটা অপূর্ণ দুর্দ্দান্ত ইচ্ছাকে রক্তমাংসময় কল্পনা দিয়ে পূর্ণ করা। রহ্‌মানে ও শয়তানে যে তফাৎ আঙুরে ও শরাবে যে তফাৎ, প্রেমে ও কামে যে তফাৎ, মুক্তি ও বন্ধনে যে তফাৎ আসল সাহিত্যে ও এই নকল সাহিত্যে সেই তফাৎ। হায়! অবোধ পাঠক জানে না সাইরেণের বাঁশরীর সুরের ন্যায় এই অসাহিত্য তাকে ধ্বংসের দিকে পলে পলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। জাতির সমস্ত সৌর-শক্তি এই সাহিত্য জোঁকের মত নিঃসাড়ে চুষে নিচ্ছে।

সাহিত্যের হাটে যে কেবল এই কামাগ্নিসন্দীপনী বটিকাই বিক্রি হ'চ্ছে তা নয়। এর চেয়েও ভয়ানক জিনিস —একেবারে সাক্ষাৎ বিষ—নানা মনোহর নামে ও রূপে কাট্‌তি হচ্ছে। পরখ করলেই অনায়াসেই দেখা যাবে সেগুলির ভিতর আছে কুসংস্কার, ধর্ম্মান্ধতা জাতীয় বিদ্বেষ প্রভৃতি। এ সমস্ত জাতির আত্মা ও মনকে বিষাক্ত ক'রে দেশে কি অশান্তিই না ঘটাচ্ছে!

আমি অরসিক নই; আর্ট বুঝি। কিন্তু আর্টের নামে কি গণিকার উলঙ্গ অঙ্গ-ভঙ্গী-কেও প্রশ্রয় দিতে হবে? তারীফ করতে হবে? আমি সাহিত্যের স্বাধীনতা বুঝি। কিন্তু তাই ব'লে কি সাহিত্যের পবিত্র তীর্থ-ক্ষেত্রে অমৃতের নামে বিষ কিংবা রসের নামে প্রস্রাব বিক্রীরও লাইসেন্স দিতে হবে? আমাদের এক জিহাদ ঘোষণা ক'রতে হবে এই অপসাহিত্যের বিরুদ্ধে। তবেই জানি 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' একটা ফাঁকা আওয়াজ নয়—সে এক 'হয়দরি হাঁক' অসত্য অশিব অসুন্দরের বিরুদ্ধে অভিযানের। আজ সমস্ত মুসলিম-বর্গ অনিমিষে চেয়ে আছে তার খিযরের জন্য যে তাকে পরাণ ভ'রে এই সত্যি কার সাহিত্যের 'আবে-হয়াতের' পরিচয় ক'রে দেবে। বোধ হয় শূন্যে খিযরের আবির্ভাব হয়েছে, নইলে এত সাকী জুট্‌ল কোথা থেকে?

'উম্‌রি তাঁ বাদা দরায় আয়্ সাকীয়ানি বয্‌মে জম্।
গর্‌চি জামি-মা ন শুদ্ পুর্‌ময়্ ব-দওরানি শুমা।।

জম্ বাদ্‌শার সাকী ভাই সব! আয়ু তোদের বৃদ্ধি হো'ক,
যতই কেন পেয়্‌লা মোদের তোদের দানে শূন্য রো'ক্।' (হাফিয)

বাহন উপযুক্ত না হ'লে কেউ তার অভীষ্ট স্থানে পৌঁছুতে পারে না। লক্ষ্য লাভ করতে গেলে সাহিত্যেরও বাহন উপযুক্ত হওয়া চাই। সেই বাহন মাতৃভাষা। মাতৃভাষা ছাড়া আর কোন্ ভাষা কানের ভিতর গিয়ে মরমে প'শে পরাণ আকুল করে? ডন

কুইক্‌সোট একটা রোগা ঘোড়ায় চ'ড়ে বাহাদুরি জাহির কর্‌তে বেরিয়েছিলেন। তার চেয়ে বাহাদুরি বল্‌তে হবে তাঁদের যাঁরা বিদেশী ভাষার সাহায্যে জাতীয় সাহিত্য গড়তে চান। মিল্‌টনের ল্যাটিন কবিতা এখন ঘুণের খোরাক হ'য়েছে। মধুসূদনের Captive Lady এখন ভোলাদরিয়ার অথই জলে ডুবে গেছে। বঙ্কিমের Rajmohon's wife এর সন্ধান দু একটী বইয়ের পোকা ছাড়া আর কে রাখে?

এই প্রসঙ্গে উর্দ্দুর কথা উঠ্‌তে পারে মানি। উর্দ্দু শেখা দরকার। কিন্তু তার চেয়ে বেশী দরকার আরবী শেখা। যদি উর্দ্দুর সাহায্যে আব্রহ্ম ভারতে আমরা পরস্পরকে জানতে পারি, আরবীর সাহায্যে ফিলিপাইন থেকে মরক্কো, সাইবিরিয়া থেকে জাভা পর্য্যন্ত সমস্তকে চিন্‌তে পারি। কিন্তু আরবী বা উর্দ্দু শেখা এক কথা, আর তাকে সাহিত্যের বাহন করা আর এক কথা। বলা হয় বাঙ্গলায় মুসলিম সাহিত্য নেই। কিন্তু গোড়ায় উর্দ্দুতেই কি ছিল? ফারসীর কথা ধরা যাক। তা'তে এক বিরাট মুসলিম সাহিত্য আছে। অল্প-বিস্তর তুর্কীতে আছে; সিন্ধীতে আছে, মালয় ভাষায় আছে। শুরুতে এদের কোনটাই ত মুসলিম সাহিত্যের ভাষা ছিল না। তবে বাংলার বেলা কেনই বা দোষ হবে? একটা মস্ত কথা আমরা ভুলে যাই যে আজ নতুন ক'রে নয় বরং প্রায় চা'র শ বছর ধ'রে মুসলমান এই বাংলা সাহিত্যের সেবা কচ্ছেন। শুধু তাই নয় আমরা আরও জানি যে মুসলমান আমীর ওমরার নেক্‌ নজরেই বাংলা সাহিত্য গ'ড়ে উঠেছিল। সেই য়ুসুফ শাহ, হোসেন শাহ, নসরৎ শাহ, পরাগল খান, ছুটী খানের নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সোনার হরফে লেখা থাক্‌বে। কাযী দৌলত আরাকান-রাজ গিরি ধুধম্মা রাজার সময়ে (১৬২২-১৬৩৮ খ্রীঃ অব্দে) 'সতী ময়নাবতী ও লোর চন্দ্রাণী' রচনা করেন। কিন্তু সম্পন্ন করবার পূর্ব্বেই মারা যান। তা পুরা করেন সৈয়দ আলাউল। সৈয়দ আলাউল মধ্য যুগের বাঙালী মুসলিম সাহিত্যিকদের মাথার তাজ। তিনি আরবী, পারসী, উর্দ্দু, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর প্রথম রচনা 'পদ্মাবতী' আরকান রাজ খদো মিন্তার রাজার রাজত্ব সময়ে (১৬৪৫-১৬৫২ খ্রীঃ অব্দে)। খুব সেকেলে বলেই এঁদের নাম করলাম। এঁদের ছাড়াও অসংখ্য কবি গায়ক ও লেখক বরাবরই বাংলা ভাষায়ই তাঁদের রচনা প্রকাশ করে ধন্য হ'য়েছেন। শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেনের ও বন্ধুবর মৌলভী আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদের প্রসাদে তাঁদের অনেকের খবর আমরা পেয়েছি। আজ আমরা কেমন ক'রে বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করতে পারি? তিন শতাব্দীর পূর্ব্বের কবি কাযী দৌলতের বাংলার নমুনা দেখুন:—

বিছ্‌মিল্লা প্রধানের নাম নিরঞ্জন।
যে নাম স্মরণে কার্য্য সিদ্ধি সর্ব্বক্ষণ॥
কি করিব যমদূতে বিপক্ষ বিবাদ।
সর্ব্বসিদ্ধি জয় জয় সে নাম প্রসাদ॥
রহমান নাম অর্থ করুণা সদায়।
যে নাম স্মরণে দুঃখ দারিদ্র্য খণ্ডায়॥
সুজন দুর্জ্জন আদি যত জীব জান।
ভক্ষকেরে কুশলে করান্ত ভক্ষ দান॥
রহিম নামের অর্থ কি কহিমু আর।
দীন দয়াময় প্রভু মহিমা অপার॥
দয়ার সাগর প্রভু পতিত পাবন।
দুঃখী পাপী নৃপতির সহায় কারণ॥
লীলায় পাপের মূল করয় বিনাশ।
তূলা রাশি দহে যেন প্রচণ্ড হুতাশ॥

এক শ্রেণীর কাছে বাংলা ভাষা বল্‌তে বোঝায় অনুস্বার বিসর্গ ছাড়া সংস্কৃত। বাংলার সৌভাগ্য সে-শ্রেণী এখন এক রকম লোপ পেয়েছে। তেমনি অন্য দিকে আর এক শ্রেণী আছে তাদের কাছে বাংলা মানে আরবী-ফারসী উর্দ্দু-বাংলার এক অপূর্ব্ব খিচুড়ী। দুই রকমের দুটো উদাহরণ দিচ্ছি।

১ নম্বর

চমকি বিশ্ব নব-বীর্য-সূর্য্য নৃপ রজনি-রাজ্য অবসন্নে,
উদিত উদয়-গিরি-কনক-মরু' পরি গগ্নি মঞ্জমণিবর্ণে।
দীপ্ত রশ্মিচয় সৈন্যনিচয়সম, (বিষম যুগাগ্নি বিনিন্দে)
ভস্মিল হতকর-পতিত-রজনিকর যোদ্ধনিকর উডু বৃন্দে।

২ নম্বর

হলকুমে হানে তেগ ও কে ব'সে ছাতিতে?
আফতাব ছেয়ে নিল আঁধিয়ারা রাতিতে।
আসমান ভ'রে গেল গোধূলিতে দুপুরে,
লাল নীল খুন ঝরে কুফারের উপরে।।

এই দু দলের হাত থেকে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করতে হবে। তবেই বাংলার প্রাণ বাঁচবে। তা না হ'লে বাংলা ম'রে ভূত হ'য়ে যাবে—একটী নয় দুটো। একটী ব্রহ্ম দৈত্যি, আর একটা মামদো ভূত। আমরা জীবন্ত বাংলাকেই চাই, তার ভূতকে নয়।

টেকচাঁদ, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ভাষার অনেকটা সংস্কার হয়েছে। এখন কিছু বাকী ভাষার দিক দিয়ে। কিন্তু বাংলার বানান বিভীষিকা এখনও ঘোচে নি। সেখানে মস্ত বড় একটা সংস্কারের দরকার। সংস্কৃতের দুটো ব বাংলায় একাকার হয়ে বানান সংস্কারের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। তিনটে শ, ষ, স, দুটো ণ, ন দু'টো জ, য এদেরও একাকারের দরকার আছে। বানান সংস্কারের নযীর পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশে পাওয়া যাবে। কিন্তু কারো ত সাহসে কুলায় না। ব্রহ্মশাপের ভয়ে নাকি!

খালি বানানে নয়, অক্ষরেও তার সংস্কারের দরকার আছে। যুক্তাক্ষরগুলি অনেক স্থলেই রাসায়নিক মিশ্রণের মত হ'য়ে আছে। এতে যে খুঁটি আখুরে ছেলে মেয়ের প্রাণান্ত হ'য়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে বাংলা যখন ইংরেজি ফরাসী আদি ভাষার মতন পৃথিবীর একটা গণ্য মান্য ভাষা হ'য়ে উঠবে, তখন হয়ত লাতিন হরফ চালাতে হবে। আপাততঃ যুক্তাক্ষরের একটা ব্যবস্থা হওয়া উচিত। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির মতটা সকলে মেনে নিলেই গোলমাল চুকে যায়। কিন্তু আমরা এমনই প্রাচীন পন্থার দাস যে এই সংস্কারটুকুও বরদাস্ত কর্‌তে প্রস্তুত নই।

আমরা অনেকবার বলেছি মুস্‌লিম সাহিত্য। কেউ হয়ত বল্‌তে পারন 'কি গোঁড়ামি! সাহিত্যেও আবার জা'ত বিচার।' তাই একটু খোলাসা ক'রে বলা দরকার—মুস্‌লিম সাহিত্য বল্‌তে কি বুঝি। আমাদের ঘর ও দোর, আমাদের সুখ ও দুঃখ, আমাদের আশা ও ভরসা, আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে যে সাহিত্য, তাই আমাদের সাহিত্য। কেবল লেখক মুসলমান হলেই মুসলমান সাহিত্য হয় না। হিন্দুর সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাচ্ছে বেদান্ত ও গীতা, হিন্দু ইতিহাস ও হিন্দু জীবনী থেকে। আমাদের সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাবে কুরআন ও হদীস, মুস্‌লিম ইতিহাস ও মুস্‌লিম জীবনী থেকে, হিন্দুর সাহিত্য রস

সংগ্রহ করে হিন্দু সমাজ থেকে, আমাদের সাহিত্য করবে মুস্‌লিম সমাজ থেকে। এই সাহিত্যের ভিতর দিয়েই বাংলার হিন্দু মুসলমানের চেনা পরিচয় হবে। চেনা হ'লেই ভাব হবে। 'To know is to love.' এই সে দিন দীনেশ বাবু বলেছেন, যদি 'মুসলমানগণ তাঁহাদের সমাজের উন্নত চরিত্রগুলি সুন্দর মহিমান্বিত বর্ণে চিত্রিত করিয়া বাংলা সাহিত্যে উপস্থিত করেন, তবে হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে তাঁহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবেন।' আমরা একেই বাংলার মুস্‌লিম সাহিত্য বলি। হিন্দু সাহিত্য ও মুস্‌লিম সাহিত্য হিন্দুর মন্দির ও মুসলমানের মস্‌জিদের মত এক সম্প্রদায়ের একচেটে জিনিস নয়। সুহৃদ্বর সত্যেন্দ্র দত্ত, ভক্তিভাজন গিরিশচন্দ্র সেন, মাননীয় কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রদ্ধেয় জলধর সেন, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি হিন্দু লেখক ও অনেক মুসলমান সাহিত্য রচনা করেছেন। বাস্তবিক বাংলা সাহিত্য বাংলার হিন্দু মুসলমানের অক্ষয় মিলন-মন্দির হবে। হিন্দু সাহিত্য ও মুস্‌লিম সাহিত্য হবে তার দুই কুঠরী। সর্ব্বত্রই সকলের অবাধ প্রবেশ অধিকার। যে পর্য্যন্ত মুস্‌লিম সাহিত্য না গড়ে উঠ্‌ছে সে পর্য্যন্ত মিলন-মন্দির পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে না।

তবে, এস, হিন্দু ও মুসলমান! এস সাহিত্যিক ও সাহিত্য-ভক্ত! এস কবি ও গায়ক! এস ঐতিহাসিক ও দার্শনিক! আমরা এই মিলন-মন্দির গড়ে তুলি। এস কিশোর কিশোরী, এস তরুণ-তরুণী, এস জরৎ-জরতী, এই মিলন-মন্দিরে এক মন হয়ে মুক্তি সাধনা করি। এখন ঋষি কবির ভাষায় প্রার্থনা ক'রে আমার অভিভাষণ শেষ করি :—

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচচ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবসশর্ব্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি',
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎস মুখ হ'তে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্ব্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্ম্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়;
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালিরাশি
বিচারের স্রোতঃ পথ ফেলে নাই গ্রাসি',
পৌরুষেরে করেনি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজহস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি' পিতঃ,
আমাদেরে সেই স্বর্গে ক'র জাগরিত।

সভাপতির অভিভাষণে জনাব আবুল মোজাফফর আহম্মদ বলেন (৬:১০) :

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলী,

আপনারা এই সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া আমাকে যে অশেষ সম্মান দিয়াছেন, তজ্জন্য সর্ব্বপ্রথম আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। কিন্তু আজ নিজে সভাপতি না হইয়া আপনাদের সহিত মিলিয়া আমার চেয়ে অধিকতর বিজ্ঞ ও শক্তিশালী কোন মহাত্মাকে আপনাদের ভবিষ্যৎ পথ নির্দ্দেশ করিবার জন্য এই সভার সভাপতিত্বে বরণ করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার সুযোগ পাইলে আমার পক্ষে ইহাপেক্ষা ঢের বেশী সুখের বিষয় হইত।

বন্ধুবর মিঃ হুসেন যখন আমাকে এই দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ করেন তখন আমার মনে শঙ্কার সঞ্চার হইয়াছিল কারণ বহুদিন হইল আমি সাহিত্য চর্চ্চা ত্যাগ করিয়া আইনচর্চ্চায় মন দিয়াছি। কাজেই, আধুনিক বিবিধ সাহিত্যিক ভাব-ধারার সহিত আমার কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই। অতএব আপনারা একজন প্রবীণ অভিজ্ঞ সাহিত্যিকের নিকট হইতে যাহা আশা করিতে পারিতেন তাহা আমার নিকট হইতে কখনই আশা করিতে পারেন না। তিনি বিষয়টী আরও মধুর করিয়া বলিতে পারিতেন এবং সত্যকার সাহিত্যিক রুচি সৃষ্টির জন্য তিনি আপনাদের উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষা আরও বেশী উদ্দীপিত করিতে পারিতেন। আমার অবস্থা বরং একজন সাধারণ গুরুমহাশয়ের মতো—যিনি তাঁহার ছাত্রের প্রয়োজনের বেশী কিছু দিতে এবং তরুণ প্রাণে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থ। তবুও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি এবং ভরসা করি, আমার সাধ্যমত চেষ্টা সত্ত্বেও ক্রটি-বিচ্যুতি ঘটিলে আপনারা উদার গুণে তাহা মার্জ্জনা করিয়া লইবেন। আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি এই অধি-বেশন সাফল্য-মণ্ডিত করেন।

সর্ব্বপ্রথম আমি এই 'মুস্লিম সাহিত্য সমাজের' সভ্য ও সারথিগণকে বিশেষতঃ সম্পাদক ও সভাপতি সাহেবকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। গত তিন বৎসর তাঁহারা এই সমাজের উন্নতির জন্য বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের তরুণ সমাজে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে, জ্ঞানের পিপাসা সৃষ্টি করিতে এবং জ্ঞানের অমৃত-ধারার সন্ধান দিতে যাইয়া তাঁহারা যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অনন্যমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারা অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। এই সমাজের শৈশব অবস্থায় তাঁহা-দের যে কি প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইতেছে তাহা আমি বিশেষরূপে অবগত আছি। আল্লাহ তায়ালার নিকট এই প্রার্থনা করি তিনি যেন তাঁহাদের মনে অধিকতর উৎসাহ, তেজ ও শক্তি দান করেন যাহাতে এই সমাজ অচিরে সমগ্র বাংলা তথা ভারতের যাবতীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান-মার্জ্জিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হয়।...''

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনে সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ। সভাপতির অভিভাষণে (৯:৫, পৌষ ১৩৩৯) কাজী আবদুল ওদুদ বলেন :

''বন্ধুগণ,

আপনাদের প্রীতির জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুণ। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশনে সাহিত্য শাখার সভাপতির উচচ আসন আপনারা আমাকে দান করেছেন সত্য, কিন্তু আমি নিজেকে জানি আপনাদের একজন সহকর্ম্মী বলেই। আর কর্ম্মীর কাছ থেকে কর্ম্মীর প্রীতির চাইতে শ্রেষ্ঠতর উপহার আর কিবা লাভ হতে পারে।

এবার সাহিত্য সম্মিলন চারিটি শাখায় ভাগ করবার চিন্তা আপনারা করেছেন, এতেই বুঝতে পারা যাচ্ছে, বাংলার মুসলমান সমাজ তাঁদের সাহিত্য সেবা সম্বন্ধে আস্থাবান হয়ে উঠেছেন। তাই নৈরাশ্য ও কিছু সদুপদেশের সুরে সাধারণতঃ যে এই সমাজের সাহিত্যিক মজলিসের সুর বাঁধা হয়ে থাকে আজ হয়ত তা অশোভন। আশাকরি আজ আমাদের সাহিত্য সাধকের মুখে আমরা এমন সমস্ত আলোচনা শুনব যাতে প্রতিফলিত

দেখতে পাওয়া যাবে তাঁদের অভিনব চিত্ত—জীবনে ও জগতে তাঁদের নূতন পরিকল্পনা ও সংকল্প। আমার আজকার সামান্য বক্তব্য আপনাদের সেই আনন্দ-যাত্রার সঙ্গী হবার আবেদন মাত্র।

জানিনা আমাদের কোন সাহিত্যিক এবার বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য সাধনার ইতিহাস সম্বন্ধে কোন রচনা পাঠ করিবেন কি না। কিন্তু বাস্তবিকই এ একটী বিষয় এবং এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে ভেবে দেখবার সময় উপস্থিত হয়েছে। সেকালের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকের দান নগণ্য নয়, বরং এক হিসাবে গৌরবের, অথচ একালের মুসলমান সমাজ যেন বহুদিন পর্য্যন্ত ভাবতেই ভরসা পান নাই যে, তাঁদের কোন সাহিত্যিক এমন কিছু রচনা করতে পারেন যা দেশের সর্ব্বত্র এতটুকু সমাদর লাভ করতে পারে; আর কতকটা এই দুঃখে তাঁদের কেউ কেউ ব্যবস্থা দিয়েছেন—বাংলা বাদ দিয়ে উর্দ্দুকেই বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু এবিষয়ে আপনাদের সন্তোষ সাধন করবার সঙ্গতি এখনো আমার লাভ হয় নাই। দুই একটি কথা বলে আপনাদের কৌতূহল উদ্রিক্ত করতে চেষ্টা করব মাত্র।

বাঙালী মুসলমানের সেকালে সাহিত্য-চর্চ্চা প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে—অনুবাদ সাহিত্য, গাথা সাহিত্য ও মারফতি সাহিত্য।

'পুঁথি সাহিত্য' নামে যে বিরাট 'মুসলমানী' সাহিত্য আছে তা অনুবাদ সাহিত্যের অন্তর্গত করে আমরা দেখতে চাচ্ছি। বলা বাহুল্য এই পুঁথি সাহিত্যের খুব কম গ্রন্থই অনুবাদ, অধিকাশই পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থের অনুসরণ মাত্র, কতকগুলো তাও নয়, প্রাচীন কাহিনী, কিম্বদন্তী প্রভৃতির বর্ণনা। এই পুঁথি সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আজও হয় নাই। আমাদের জনৈক তরুণ সাহিত্যিক পুঁথি সাহিত্যের নায়িকার রূপ বর্ণনায় যে যথেষ্ট চটুলতা আছে তা দেখাতে চেষ্টা করেছেন। আমি নিজে এই সাহিত্যের সঙ্গে তেমন পরিচিত নই। তবে যেটুকু পরিচয় লাভ করেছি তাতে খুশী হতে পারিনি আদৌ। চিন্তা, কল্পনা, রচনা সমস্তেরই বড় বেশী দৈন্য তাতে চোখে পড়েছে। সুপ্রসিদ্ধ পুঁথি 'কাছাছল আম্বিয়া'তেও এমন কিছু পাইনি যাকে বলা যেতে পারে চিত্তার্ষক। অথচ বাইবেলের ওল্ড-টেস্টামেণ্টের কাহিনী চমৎকারিত্বে পরিপূর্ণ, আর কোর-আনের নবী-কাহিনী গভীরভাবে আল্লাহতে সমর্পিত চিত্তদের কাহিনী, স্থানে স্থানে কবিত্বময়ও বটে! কিন্তু মনে হয় 'কাছাছল আম্বিয়া'র লেখক বা লেখকগণ দৈববলের অদ্ভুতত্বে বিশ্বাসী ভিন্ন আর কিছুই নন। জীবনের মাহাত্ম্য মর্য্যাদা ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছুমাত্র ধারণা যে তাঁহাদের ছিল তা বিশ্বাস করতে ভরসা হয় না। তবে একথা বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের অনেক খানি সম্বন্ধেই বলা যেতে পারে।

অনুবাদ সাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান কবি আলাওলের। অন্ততঃ এই-ই অনেকের মত। তিনি প্রকৃতই পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। এতখানি পাণ্ডিত্য নিয়ে আর কোন মুসলমান বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে লেখনী ধারণ করেন নাই। সৌন্দর্য্যবোধও তাঁর ছিল। তাঁর 'পদ্মাবতী', পড়তে গিয়ে অনেক সময়েই মনে হয় বিদ্যাপতি ও ভারতচন্দ্রের কথা। কিন্তু সত্যিকার কবি হিসাবে আলাওলের স্থান এঁদের নীচে।

মোটের উপর অনুবাদ-সাহিত্য সত্যকার সাহিত্য হিসাবে তেমন কিছু নয় বলেই মনে হয়। যদিও এ সাহিত্যের বহুল প্রচলন মুসলমান সমাজে ছিল। এই অনুবাদ-সাহিত্যের চাইতে গাথা সাহিত্যে প্রাচীন মুসলমানের দান অনেক উঁচু দরের।

মুসলমান রচিত গাথা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বোধ হয় মৈমনসিংহ গাতিকার 'দেওয়ানা মদিনা।' গ্রাম্য ভাষায় এই গাথা রচিত, কিন্তু রচয়িতা সত্যকার কবি বলে তাঁর সৃষ্টি তাতে ম্লান হয় নাই। স্বামী কর্তৃক অকারণে পরিত্যক্ত প্রেমময়ী কৃষককন্যা মদিনার শোকের এক মর্ম্মস্পর্শী চিত্র আঁকা হয়েছে এতে: আর মদিনার মৃত্যুতে তার এই অপরাধী স্বামীর যে বুক-ফাটা ক্রন্দনের ছবি কবি এঁকেছেন সাহিত্য-রসিকদের চোখে তা অমূল্য—সীতার বিরহে কৃত্তিবাসের রামের চাইতে চাষী কবি মনসুর বয়াতির অঙ্কিত এই শোক গভীরতর সুন্দরতর।

মারফতী সাহিত্য এক সুবিস্তীর্ণ সাহিত্য। মুর্শীদী গান, দেহতত্ত্ব গান, বাউল গান এর অন্তর্গত। এই মারফতী সাহিত্যের অনেকখানিই তাত্ত্বিকতাপূর্ণ। কিন্তু এর অন্তর্গত কবিত্বময় বাউলগানের কয়েক জন শ্রেষ্ঠ-রচয়িতা—যেমন হাসান রাজা, মদন, লালন শাহ্, শেখ ভানু—মুসলমানসমাজ-উদ্ভূত।

এই মুসলমান বাউলদের সম্বন্ধে অনেক কথাই আমাদের সাহিত্যিকদের ভাবতে হবে। এই বাউলরা কোন সাধনার উত্তরাধিকারী, সুফী সাধনা ও বৈষ্ণব সাধনা অথবা সুফী কবিতা ও বৈষ্ণব কবিতা এর কোনটার প্রভাব এদের উপরে বেশী, এদের নিজস্বতাই বা কি, ইত্যাদি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে তাঁরা হিন্দু মুসলমানের দীর্ঘদিনের পরিচয়ের অনেক গোপন তথ্য উদ্ধার করতে পারবেন। এদের রচনা পড়ে আমার কিন্তু মনে হয়েছে এদের ভাষায় বাংলার বৈষ্ণব কবিতার কোমলতা ও মৃদুতার চাইতে বাএজীদ বোস্তামি, হফেজ প্রমুখ সুফীদের বাণীর বিদ্যুৎভঙ্গি ও দাহই বেশী ফুটেছে। তবে কেন যে এমন হয়েছে তা বলা নিশ্চয়ই সহজ নয়! সুফী-সাধনা ভারতে এসে এখানকার নানা ভাব-সাধনার সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছিল, চট্টগ্রামের দরবেশ আলী রাজা ওরফে কালুফকিরের 'জ্ঞান সাগর' গ্রন্থে তার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

এই পর্য্যন্ত যে সমস্ত বাউল কবি আবিষ্কৃত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে মদন বাউল এক ক্ষণজন্মা কবি। 'নিঠুর গরজি তুই মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে' ও 'হৃদয় কমল চলতেছে ফুটে কত যুগ ধরি' শীর্ষক তাঁর দুটী গান ভারতীয় দার্শনিক সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনের সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিভাষণে উদ্ধৃত করেছিলেন। সমস্ত বাংলা সাহিত্যে মদনের এই গান পরমাশ্চর্য্য সামগ্রী। যত দূর জানি, এর জন্য বাংলার রসিকসমাজ মরমী সাহিত্যের ভাণ্ডারী শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের কাছে ঋণী।

এই যে কয়েক শ্রেণীর সাহিত্যের উল্লেখ করা হলো, এভিন্ন নানা রকমের পল্লী গান মুসলমান চাষীর কণ্ঠে গীত হয়ে থাকে। সেই সব গানের রচয়িতার নাম প্রায় পাওয়া যায় না। তা না যাক্, কবিতা বা গান যে রচনা করে শুধু তারই নয়, যে মনপ্রাণ দিয়ে পাঠ করে বা গায় তারও বটে। এই ভাবে কয়েক শতাব্দী ধরে বাংলার মুসলমান ভাব-চর্চার আস্বাদ লাভ করে আস্‌চে তার মাতৃভাষার সাহায্যেই।

কিন্তু এই সহজ ধারা একালে এমন বিকৃত হলো কেন? বিকৃত যে হয়েছে কেউই তা অস্বীকার করে না। সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মুসলমান ত নানা ভাবেই দ্বিধান্বিত, এমন কি পল্লীর মুসলমান চাষীর সেই গানের সাধনার ধারাও অনেক খানি বদলে গেছে।

এ ব্যাপারটা বাস্তবিকই বড় জটিল। আমি যে টুকু বুঝতে পেরেছি তা নিবেদন করতে চেষ্টা করব।

বাংলার মুসলিম জীবনের এই বিপর্য্যয়ের প্রথম কারণ রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন বাংলার মুসলমানের সাহিত্যিক জীবনে বিপর্য্যয় আন্‌ল তার সমাজ-গঠন ও কৃষ্টীর দুর্ব্বলতার জন্য। এই পরিবর্ত্তন উত্তর-ভারতের মুসলমানের জীবন এমন কৃষ্টী-ধারা-বিচ্যুত হয় নাই। বৌদ্ধ হিন্দু পাঠান আরব প্রভৃতির বিচিত্র উপকরণে বাংলার মুসলমান সমাজ গঠিত। এই বৈচিত্র্য বা বিচ্ছিন্নতা অখণ্ডত্বে রূপান্তরিত হবার সময় ও সুযোগ পায় নাই; মোগল ভারতে আভিজাত্য বোধের লালিত হবার অবকাশ কম ছিল না। প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত 'সিয়ার মোতাখেরিন'-এর ইংরাজী অনুবাদে অনুবাদক স্থানে স্থানে যে মন্তব্য করেছেন তাতে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারা যায়, বাংলা দেশে সাধারণ মুসলমান ও ভদ্র মুসলমানের ভিতরে (একালের মুসলমানের ভাষায় 'আশরাফ' ও 'আত্‌রাফের' ভিতরে) একটি সুবিস্তীর্ণ ব্যবধান ছিল। এই ভদ্র মুসলমান দের কৃষ্টীর ভাষা যে ফারসী ও উর্দ্দু ছিল এ সম্বন্ধে হাকিম হবিবর রহমান সাহেব ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহার অভিভাষণে অনেক যুক্তিপূর্ণ কথার অবতারণা করেছেন। তাঁর প্রধান বক্তব্য এই যে, উর্দু সাহিত্যে বাংলার বিভিন্ন স্থানের মুসলমানের মূল্যবান দান আছে। সেটা নিশ্চয়ই দীর্ঘ সাধনার ফল। আর এরূপ ঘটনা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বাংলার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বহুকাল পর্য্যন্ত সংস্কৃতকে ব্যবহার করে আসছিলেন তাঁদের কৃষ্টীর ভাষারূপে। রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনে রাজাশ্রয়হীন এই ভদ্র মুসলমান দল অচিরেই শক্তিহীন হয়ে পড়লেন, আর দেশের বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য তাদের কৃষ্টী ধ্বংস হয়ে গেল। মুসলমান সমাজের এক অংশে বিপর্য্যয় ঘটবার পরে অন্যান্য অংশ যে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে এ সম্ভবপর নয়।

এর উপর সমস্ত দেশের ভিতরে একটি বড় ব্যাপার ঘটল। বাংলাদেশই নূতন সভ্যতার নিকেতন হয়ে উঠ্‌ল। বাংলার হিন্দু সমাজে এমন মনীষীর জন্ম হলো যারা এই নূতন বিদ্যা ও কৃষ্টী মনঃপ্রাণে গ্রহণ করবার পথ আবিষ্কার করলেন। এই নব-ঐশ্বর্য্য-লব্ধ হিন্দুর সঙ্গে তুলনায় মুসলমান হয়ে চললো দিন দিন অধিকতর শ্রীহীন।

দ্বিতীয় কারণ—ওহাবী প্রচার। ওহাবী প্রচারকেরা বাংলায় এসেছিলেন অনেকখানি শান্তমূর্ত্তি ধরে—ইসলামের শরীয়ত নূতন করে প্রচার করবার উদ্দেশ্যে। তাঁদের মতে বাংলার অধিকাংশ মুসলমান ছিল অদ্ভুত কুসংস্কারচ্ছন্ন জীব, তাঁরাই তাকে মুসলমানী আচার ব্যবহার নূতন করে শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁদের দাবী মিথ্যা নয়। এক আচারের পরিবর্ত্তে অন্য আচার তাঁরা বাংলার মুসলমানকে শিখাতে পেরেছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু যে ভাবে শিক্ষা দিলে কোর-আনের ইসলামের মর্য্যাদা রক্ষা হতো সেইভাবে দেওয়া হয়েছে কিনা সেটাও বিচার্য্য। আমি কেবল একটি বিষয়ের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব—ওহাবী অথবা ওহাবী-প্রভাবান্বিত প্রচারকদের প্রচারের ফলে বাংলার মুসলমানের অনেকে নামাজ পড়তে শিখেছেন—কিন্তু কিছুই না বুঝে। অথচ নামাজে যে সব কথা ব্যবহার করা হয় তার অর্থ সম্বন্ধে অমনোযোগীর প্রতি কোর-আনে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, আর বলা হয়েছে—নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র চক্ষে অধমতম জীব হচ্ছে বধির ও বোবা—যারা বোঝে না। (৮:২২)।

মোটের উপর ওহাবী আন্দোলন ধ্বংসশীল মুসলিম জগতের এক সশস্ত্র প্রতিবাদ। কিন্তু সে সংঘর্ষে তার ভাগ্যে জয়লাভ ঘটে নাই। তাই তার পক্ষভুক্তদের ভাগ্যেও লাভ হয়েছে পরাজিত পক্ষের যত নৈতিক ও আর্থিক দুর্গতি।

তৃতীয় কারণ—মনীষীর অভাব। মনীষীর জন্ম কেন কোনো কোনো সমাজের ভিতরে কখনো কখনো হয় তা বলা শক্ত। তবে তাঁদের আবির্ভাব না হলে কোনো জাতির বা

কোনো দেশের জীবনে নূতন উদ্যম যেন অসম্ভব হয়েই থাকে। সমাজ যখন অপেক্ষাকৃত নিম্নতর অবস্থায় থাকে, অথবা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হয় তখন তার জন্য মনীষীর প্রয়োজন হয় সব চাইতে বেশী। কিন্তু বাংলার মুসলমান সমাজে প্রয়োজন যত বড়ই হোক, তার সমাজে কোনো মনীষীর আবির্ভাব ঘটে নাই ; উত্তর ভারতে সার সৈয়দ আহমদের আবির্ভাব সেখানকার মুসলমানদের জন্য কল্যাণ প্রসূ হয়েছিল। তাঁকে মনীষী বলা চলে কি না এ নিয়ে মতভেদ হতে পারে ; কেননা মনীষী সাধারণতঃ তাঁকেই বলা হয় যাঁর কাছ থেকে তাঁর চারপাশের লোক জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে একটা নূতন অথচ চিরসত্য দৃষ্টি লাভ করে। তবে সবল-কাণ্ডজ্ঞান-সম্পন্ন এক শক্তিশালী কর্ম্মী তিনি ছিলেন নিশ্চয়ই, তাই সিপাহি বিদ্রোহের ফলে পশ্চিমী মুসলমানের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার আশু প্রতিকারের চেষ্টা তিনি নিপুণ ভাবেই করেছিলেন। বাংলার হিন্দু সমাজে যে কয়েকজন মনীষী জন্মা হয়েছেন তাঁদের প্রভাব মুসলমানের উপর তেমন কিছুই হয় নাই, তার কারণ তাঁদের বিশেষ কর্ম্মক্ষেত্র ছিল হিন্দুসমাজ, আর নানা প্রভাবের তাড়না ভোগের ফলে মুসলমানের এমন মনোভাবও ছিল না যে এই সব মনীষীর বাণী ও কর্ম্মের পূর্ণ অর্থ তাঁদের হৃদয়ঙ্গম হবে।

একটি কথা হয়ত বলা যেতে পারে, বাউল গানকে আমি সেকালের সাহিত্য বলেছি, অথচ যে সব মুসলমান বাউলের নামোল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা সবাই উনবিংশ শতাব্দীর লোক, হয়ত ওহাবী প্রভাবের সমবয়সী অথবা পরবর্তী। এর উত্তরে বলব, মুসলমান বাউল-সাহিত্য একালে জন্মেছে বটে কিন্তু তাঁর নাড়ীর যোগ রয়েছে সেকালের অর্থাৎ মধ্যযুগের মরমী সাধনার সঙ্গেই, একালের বহির্মুখী জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য তাঁর কিছুমাত্র দরদ আছে তা বোঝা যায় না। মুসলমান সমাজের লৌকিক ধর্ম্মের প্রতিবাদ এই সাহিত্যে আছে বটে, কিন্তু সেই প্রতিবাদ এর ভিতরকার প্রধান কথা নয়, প্রধান কথা হলো বাউল-সাহিত্য একালের সাহিত্যই হোতো, এর প্রধান কথা হচ্ছে অন্তর্লোকের এক অপরূপ পরিচয় লাভ করা--যে পরিচয় লাভের ফলে অনুভাবকের জীবন হয়ে ওঠে মধুময়, জগৎ হয় আনন্দনিকেতন।

বাংলার মুসলিম জীবনে ওহাবী-প্রভাব ও মনীষীর অভাব সম্বন্ধে বহুকথা বলবার আছে। সে সব পরে হবে। আপাততঃ শুধু এই কথাটি বলতে চাই যে, বাংলার মুসলমান এক সম্পূর্ণ নতন পরিবেষ্টনে এখন উপস্থিত, সেই পরিবেষ্টনে আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশের জন্য নূতন আয়োজন তার চাই-ই, কিন্তু সেই আয়োজনের উপকরণ সে যে তার চারিদিকে সন্দিগ্ধ ও অপ্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পাবে না, পাবে শান্ত ও সকৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই, এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথাটিও সে বুঝছে না এই ওহাবী-প্রভাব ও নব স্পষ্টধর্ম্মী মনীষীর অভাবের জন্যই।

কিন্তু বাঙালী মুসলমানের একালের জীবনে এই সব বিপত্তির জন্য সে যে ক্রমাগত অধঃপাতের দিকেই যাচ্ছে তা সত্য নয়। তার কৃষ্টিধারার বিপর্য্যয়, আর্থিক অসচ্ছলতা, রাজনৈতিক দৃষ্টির অভাব, এসব বিড়ম্বনায় তার জীবন বিড়ম্বিত হয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এত বিড়ম্বনাভোগের ভিতরও তার প্রাণপুরুষ যে মুহ্যমানই হয় নাই তার পরিচয় ফুটতে চেয়েছে তার একালের সাহিত্যে। মীর মোশাররফ হোসেনের ও কায়কোবাদের সাহিত্য অলোকসামান্য কিছু নয় বটে, কিন্তু নৈরাশ্য ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ওহাবী পরিবেষ্টনে তাঁরা যে সহজভাবে জীবনকে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, এর হর্ষ বেদনা ও প্রেমের মাধুর্য্য উপভোগ করতে পেরেছিলেন, জগতের অনাত্মীয় কখনো তাঁরা হন নাই—এরও মাহাত্ম্য ত কম নয়। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ও শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের প্রথম যৌবনের রচনাও এমনিভাবে হৃদয়গ্রাহী। আর এই সময়ের চিন্তাশীল লেখক হচ্ছেন

পণ্ডিত রেয়াজউদ্দিন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুস্‌লিম জামালুদ্দিন-আল্-আফ্‌গানীর জীবন-কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর স্বসম্প্রদায়ের নবজীবনারম্ভের কথাও তিনি ভেবেছিলেন। আমাদের একালের সাংবাদিকদের উপরে তাঁর 'প্যান ইসলাম'-বাদের ছায়া পড়েছে মনে হয়. কিন্তু তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রীতির উত্তরাধিকারী হবার প্রয়োজন তাঁরা তেমন অনুভব করেন নাই।

কিন্তু এযুগের মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে চিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষ গৌরবের আসন এই তিনজনের—মিসেস আর. এস. হোসেন, কাজি এমদাদুল হক ও লুৎফর রহমান। একালের মুসলমানকে কঠিন কটু কিন্তু জীবন-প্রদ অনেক কথা তাঁরা শুনিয়েছেন। সেসব কথা তাঁদের কানে তেমন যে প্রবেশ করেছে তা মনে হয় না। তবে ব্যর্থ যে হয়েছে তাও নয়। আর সাহিত্যের প্রভাব হয়ত এমনিভাবেই হয়।

মিসেস আর. এস. হোসেনের প্রতিভা একালের ভগ্নহৃদয় মুসলমানের জন্য যেন এক দৈব আশ্বাস। নিবাত নিষ্কম্প মুসলমান অন্তঃপুরে যদি এহেন বুদ্ধির দীপ্তি, মার্জিত রুচি, আত্মনির্ভরতা ও লিপিকুশলতার জন্ম হয় তবে আজো ভয় কেন বাংলার মুসলমানের ঘোচে না! তবে আজো কেন নিজেকে পরিবেষ্টনের সন্তান ও জগতের অধিবাসী বলে পরিচিত করবার সাহস তার হয় না! আর লুৎফর রহমান সম্পর্কে এই একটী কথা না বল্লে অন্যায় হবে যে, একালের বাংলার মুসলমান সমাজে ধর্ম্ম নিয়ে বাগবিতণ্ডা ও মাতামাতি কম হয় নাই, কিন্তু সেই বিপুল আড়ম্বরের ফাঁকি একদিন যখন নিঃশেষে ধরা পড়বে তখন এ যুগ ধর্ম্মহীনতার, অর্থাৎ মনুষ্যত্বের জন্য বেদনাহীনতার, অভিযোগ থেকে অব্যাহতি লাভ করবে যাঁদের অতন্দ্রিতচিত্ততার দৃষ্টান্তে এই কিছু অব্যবস্থিত প্রতিভা লুৎফর রহমান তাঁদের মধ্যে এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।

একালের বাঙ্গালী মুসলমানের সৃষ্ট এই সাহিত্য দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের দৃষ্টি তেমন আকর্ষণ করতে পারে নাই, তার কারণ মনে হয় এর অপ্রাচুর্য্য ও অনবদ্যতার অভাব। কিন্তু যাঁদের জন্য এই সাহিত্য বিশেষভাবে রচিত হয়েছিল তাঁরা যে এর পূর্ণ মর্য্যাদা দিতে পারেন নাই, এইটি-ই এর গৌরবহীনতার প্রধান কারণ বলে মনে হয়।

তবে এঁদের চাইতে ভাগ্যবান সাহিত্যিকও এযুগে মুসলমান সমাজে জন্মেছেন—বৃহত্তম দেশে তাঁরা সমাদর লাভ করতে পেরেছেন। আমি নজরুল ইসলাম ও জসীমউদ্দীনের কথা বলছি। মুসলমান সমাজের এই দুই তরুণ শিল্পীর সম্বন্ধে মত প্রকাশ করবার সময় এখনো বহুদূরে থাকুক, কিন্তু এঁরা ধন্য হয়েছেন এই জন্য যে একালের মুসলমান সমাজের অন্তরে তার সাহিত্যিক সার্থকতা সম্বন্ধে এক নব আশার সঞ্চার এঁরাই করতে পেরেছেন।

কিন্তু তবু বলতে হবে বাংলার মুসলমান সমাজে সাহিত্যচর্চার যে অবস্থা, অর্থাৎ লেখক ও পাঠকের যে সম্বন্ধ, তা শুধু অসন্তোষজনক নয়, অনেকখানি আপত্তিকর। পাঠক-সমাজের বিচারশক্তি এখনো অত্যন্ত দুর্ব্বল, সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ পুরোপুরি নেবার উদ্দেশ্যে আমাদের অনেক লেখককে অনেক সময়ে দেখতে পাওয়া যায় অত্যন্ত অকিঞ্চিৎ-কর রচনায় হাত দিতে। পাঠক-সমাজের অজ্ঞতা এইভাবে দাঁড়াচ্ছে লেখক সমাজের উৎকর্ষলাভের পরিপন্থী হয়ে। এর আর এক ফলও ফলেছে। সেইটী বেশী মারাত্মক। এমন পাঠককে অবহেলা করবার প্রবৃত্তি একটুখানি তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাহিত্যিকের মনে সহজেই আসে। ফলে সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন চরমপন্থী চিন্তাশীল ও পরিবর্ত্তন-ভীত পাঠক-সমাজ এই দুয়ের প্রাদুর্ভাব এই সমাজে হচ্ছে। এই বিরোধের পরিণতি কোথায় জানিনা, কিন্তু

মুসলিম সভ্যতার এক গৌরব যুগে এমনি ধরনের বিরোধ সমাজে জেগেছিল, আর তার ফল সমগ্র মুসলমান সভ্যতার জন্য অবাঞ্ছিতই হয়েছিল, এ কথাটি সহজেই মনে পড়ে।

তবে এ বিরোধ দীর্ঘকাল স্থায়ী নাও হতে পারে। কিন্তু সে জন্য চেষ্টাও যেন কম না হয়। দেশের সর্ব্বত্র শিক্ষা বিস্তারের প্রেরণা দান, উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র পরিচালনা এসব সাহিত্যিকদের দ্বারা সম্ভবপর হতে পারে, কিন্তু তারও চাইতে বড় কথা এই যে উদ্দেশ্য-আদর্শের যে বিরোধ একালে মুসলমান সমাজে প্রবল হতে চাচ্ছে তার একটা যোগ্য মীমাংসার চেষ্টায় যদি সমাজের সব শ্রেণীর চিন্তাশীল অগ্রসর হন তবে কোনো মীমাংসায় উপনীত হতে না পারলেও সমস্ত সমাজের মানস উৎকর্ষের এক অভিনব ভিত্তি-পত্তন তাঁরা করতে পারবেন। অবশ্য তার জন্য প্রথম প্রয়োজন এই যে সব শ্রেণীর চিন্তাশীলই হবেন সত্য ও কল্যাণকামী।

মনে হয় এমন এক মানস উৎকর্ষের পথে বাংলার মুসলমান সমাজ আস্তে আস্তে পা বাড়াতে শুরু করেছে। এ সমাজে যাঁরা নিজেদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মনে করেন সমাজের উপর তাঁদের প্রভাব এখনো নগণ্য, কিন্তু এই দলের ভিতর থেকেই 'বুদ্ধির মুক্তি' বাদীদের উদ্ভব হয়েছে, আর তাঁদের জিজ্ঞাসা যে সমাজে কিছু সাড়া জাগাতে পেরেছে তা অস্বীকার করা যায় না। আর আলেম সম্প্রদায়ের ভিতরেও এমন চিন্তাশীলের আবির্ভাব হচ্ছে যাঁরা অলৌকিকতা দুর্জ্ঞেয়তা ইত্যাদি থেকে ধর্ম্মকে মুক্ত করে তাকে করতে চাচ্ছেন প্রধানতঃ সহজ বুদ্ধির বিষয়। এই সম্পর্কে বাঙ্গালী আলেম মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই শ্রেণীর চিন্তাশীল আলেমদের মুকুট-মণি হচ্ছেন উর্দ্দুভাষী বাঙালী আলেম মওলানা আবুল কালাম আজাদ। তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'তরজমা-ই-কোর-আন' -এর ভূমিকায় তিনি ইসলামের যে উদার ও সঞ্জীবনী ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন তাতে দেশের আলোকপন্থীদের শ্রদ্ধাভাজন তিনি হয়েছেন। তাঁর ব্যাখ্যায় মুসলমান সমাজ ওহাবী প্রভাবের কাণ্ডজ্ঞান বিমুখতা ও অপ্রেম থেকে মুক্তি পাবে আশা করা যায়।

বাঙলার মুসলমানের দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনের সঙ্গে যে পরিচয়টুকু আমাদের হলো তা থেকে এ কথাটি পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে যে সেকালের বাঙালী মুসলমান সহজ ভাবেই মাতৃভাষায় সাহিত্যের চর্চ্চা করেছিলেন, আর একালে সে সহজ ধারা কিছুদিনের জন্য বিপর্য্যস্ত হলেও আবার তাতে প্রতিষ্ঠিত হবার পথেই তাঁরা চলেছেন। শুধু তাই নয়, পরিবেষ্টনের সঙ্গে প্রেমের যোগ ও অকুণ্ঠিত সত্যানুসন্ধান এ নহিলে যে জীবনে শ্রেয়োলাভ হয় না এ সত্যের প্রমাণও রয়েছে মুসলমানের সেকাল ও একালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সাধনায়। তবে সাদৃশ্য এমনি ধরনের থাকলেও দুয়ের ভিতরে পার্থক্যও আছে। মধ্যযুগের অন্যান্য চিন্তাশীলের মতো সেকালের মুসলমানও প্রধানতঃ ছিলেন গুরুবাদী ও জীবনের অনিত্যতাবাদী, কিন্তু একালের মুসলমান মুগ্ধ হতে চাচ্ছেন বৈজ্ঞানিকতায় ও জীবনের ঐতিহাসিক বিকাশের দীপ্তিতে।

আরো একটি ব্যাপার চোখে পড়ছে—বঙ্গ সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধারা সম্মিলিত হয়েই রয়েছে, কিন্তু গঙ্গা যমুনার মতো। ভবিষ্যতেও দুইয়ের এই অদ্ভুত স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকবে কিনা সেটা হয়ত নির্ভর করবে তাদের পরস্পরের ভবিষ্যৎ সামাজিক সম্বন্ধের উপর। তবে একালের বাংলা সাহিত্যে এমন একটি চিন্তাধারা রূপ লাভ করতে চাচ্ছে যার পরিপূর্ণ বিকাশে মুসলমানসমাজ-উদ্ভূত সাহিত্যিক বিশেষ সাহায্য করতে পারবেন বলে মনে হয়।

কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলতে চেষ্টা করা যাক। হিন্দু সাধনার শ্রেষ্ঠ কথা হয়ত নির্গুণ ব্রহ্মের সাধনা। জিজ্ঞাসার এক সুগভীর তৃপ্তি সেই চিন্তাধারায় আছে: কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ভাল কোন কিছুতেই নাই, তাই নির্গুণ ব্রহ্মের সাধনার সঙ্গে যুক্ত দেখতে পাওয়া যায় উৎকট ব্যক্তিত্ববাদ কর্ম্মে অবিশ্বাস। বাংলার একালের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশে রূপ ধরে উঠতে চাচ্ছে বীর্য্যবন্ত জাগতিক জীবনের আদর্শ—বিশ্বজ্ঞান ও বিশ্বসৌন্দর্য্যের দিকে যার গতি। কিন্তু যে সমাজের ভিতরে এর উদ্ভব হয়েছে তার সেই নির্গুণ ব্রহ্মবাদ ও জাতি অভিমান এর সার্থকতা লাভের অন্তরায় সহজেই হতে পারে। এই অবস্থায় মুসলমান সমাজের সাহিত্যিকের দ্বারা এই ভাবধারার বিশেষ সার্থকতা সাধনের কথা মনে হয় এই জন্য যে মুসলমানের এতদিনের ধর্ম্মাদর্শের যে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা আছে তিনি নানা সদ্‌গুণের আধার, সেই সদ্‌গুণময় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে দৈনন্দিন জীবন সুন্দরভাবে যাপন করবার এই যে মুসলমানের প্রাচীন শিক্ষা, তার একালের জীবনের বিশেষ প্রয়োজনে সেই শিক্ষার সাহায্য তার লাভ হবে এ স্বাভাবিক।—তবে এসব হচ্ছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা। সেই ভবিষ্যৎকে কতকটা সুনিশ্চিত করা যেতে পারে যে না পারে তা নয়। কিন্তু সে ক্ষমতা শুধু তাঁদেরই আছে যাদের বর্ত্তমান কর্ম্মধারা সুনিশ্চিত।

বাংলার মুসলিম সাহিত্যের বিশেষ পরিবেষ্টন সম্বন্ধেই এতক্ষণ কয়েকটি কথা বলতে চেষ্টা করেছি। এইবার সাধারণভাবে সাহিত্যের আকৃতি প্রকৃতি উদ্দেশ্য আদর্শ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা শুরু করে আপনাদের ধৈর্য্য পরীক্ষা করব না নিশ্চয়ই। তবে সাহিত্যিকদের সভায় এই সব বিষয় সম্পর্কে দুই একটি কথা না বললে বক্তব্য নিতান্ত থেকে যাবে মনে হয়। আমি সাহিত্যে রস ও সমস্যা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলেই অসম্পূর্ণ আমার বক্তব্য শেষ করব।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য রস-সৃষ্টি এ কথাটার সঙ্গে আমরা সবাই অত্যন্ত পরিচিত। কিন্তু এর প্রতিবাদ বা সমর্থন কিছুই না করে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি অন্য একটি কথার দিকে—সাহিত্যের উদ্দেশ্য জীবনের সমস্যা সমাধানের প্রয়াস। এই প্রয়াস জ্ঞাতসারেও হতে পারে, অজ্ঞাতসারেও হতে পারে কিন্তু সমস্যার সোণার কাঠির স্পর্শ না পেলে সাহিত্যিক চিত্তের নিদ্রা ভঙ্গ হয় না, সাহিত্য সক্রিয় হয় না, এ এত সত্য কথা যে এর প্রমাণ দেবার দরকার করে না। রস অনেক সময়ে এই সমস্যার আনুষঙ্গিক যেমন ফুলের রং পাপড়ির বিন্যাস তার বীজকোষের আনুষঙ্গিক। এই সমস্যার দিকে দৃষ্টি রেখে সাহিত্য সৃষ্টি করলে সাহিত্য সাংবাদিকতায়ও পর্য্যবসিত হতে পারে, সৃষ্টি তবু তা হবে অর্থপূর্ণ—সুপাঠ্য, কিন্তু শুধু রস বা সৌন্দর্য্য সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি রেখে সাহিত্য সৃষ্টি করলে তা কি বিষম পাগলামির ব্যাপার হয়, বিশেষতঃ এই স্বল্প অবসরের যুগ, বাংলার দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর রস-স্রষ্টাদের রচনায় রয়েচে তার দৃষ্টান্ত। যীশুখৃষ্ট বলেছেন Take the name of God in nain, সাহিত্য রস ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে,—ও এমনি দুর্ল্লভ ব্যাপার যে ও সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে নিপুণভাবে জীবনের সমস্যার আলোচনা ভিন্ন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর কিছু যে করতে পারেন তা মনে হয় না।

এই সমস্যা-সাহিত্যের কথা আপনাদের কাছে উত্থাপন করছি কতকগুলো কথা ভেবে। বাংলার মুসলমান এক নূতন জীবনের স্পন্দন অনুভব করতে শুরু করেছে! এই নূতন জীবনের সূচনায় নানা সমস্যা সহজেই তাকে আঘাত দিচ্ছে। সেই সব সমস্যা যদি গানে, কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, রূপকে কিম্বা নিবন্ধে সে রূপ দিতে চেষ্টা করে তবে বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সম্পদ সে দান করতে পারবে আশা করা যায়। অনেক সময় দেখা যায় বড় বড় উত্তেজনার মুখে উৎক্ষিপ্ত হয় বড় বড় সাহিত্য!

আমাদের দীর্ঘদিনের অজ্ঞানতার ও অপ্রেমের বেদনা সাহিত্যে সার্থকতা লাভ করুক, এই প্রার্থনা করি।''

উল্লেখযোগ্য যে, এই বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের ৫ম অধিবেশনের 'উদ্বোধন গীতি' রচনা করেন নজরুল ইসলাম। গানটি সৃষ্টিশীল লেখকদের উদ্দেশ্যে কবির আন্তরিক উচ্চারণ :

'এস এস রসলোকবিহারি,
এস মধুকর দল!
এস নভোচারী স্বপনকুমার,
এস ধ্যান-নিরমল!

এস হে মরাল কমল-বিলাসী,
বুলবুল পিক সুরলোকবাসী,
এস হে স্রষ্টা এস অবিনাশী,
এস জ্ঞান-প্রোজ্জ্বল!

দিওয়ানা প্রেমিক এস মুসাফির
ধূলি-ম্লান তবু উন্নত-শির,
অমরা-অমৃত-জয়ী এস বীর
আনন্দ-বিহ্বল!

মাতাল মানব করি' মাতামাতি
দশ হাতে যবে লুঠে যশখ্যাতি,
তোমরা সৃজিলে নবদেশজাতি
অগোচর অচপল!

খেল চির-ভোলা শতব্যথা সয়ে,
সংঘাত উঠে সঙ্গীত হয়ে,
শত-বেদনার শতদল লয়ে
লীলা তব অবিরল।

ভুলি' অবহেলা অভাব-বিষাদ
ধরণীতে আন স্বর্গের স্বাদ,
লভি' তোমাদের পুণ্যপ্রসাদ
পেনু তীর্থের ফল।'

চটগ্রাম পূরবী সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে কাজী আবদুল ওদুদ যে ভাষণ দেন তার 'সারাংশ' প্রকাশিত হয় 'সাহিত্যের স্বরূপ' শিরোনামে (২০:২, পৌষ ১৩৪৭)। ভাষণে কাজী আবদুল ওদুদ বলেন :

''পূরবী সাহিত্য-সম্মেলনে কি কথা বল্‌তে হবে সে-কথা ভাবতে গিয়ে প্রথমেই আমার চোখ পড়েছে দেশের বিক্ষুব্ধ অবস্থার উপরে—যে অবস্থা সাহিত্য-চর্চার অনুকূল নয়। সাহিত্যকে বলা যায় সৌন্দর্য্যময় জ্ঞান; কিন্তু যেখানে বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলা রাজত্ব বিস্তার

করে' বসেছে সেখানে একান্ত অভাব হয়েছে জ্ঞানাভিসারী কৌতূহলের ও সৌন্দর্য্যাভিসারী মাত্রাবোধের, সেখানে মৌনাবলম্বনই সাহিত্যিকদের জন্য প্রশস্ত—দুর্যোগে যেমন আচ্ছন্ন হয় সূর্য্যরশ্মির প্রসন্নতা। পূরবী সাহিত্য-সম্মেলনকে আমি তাই জ্ঞান করছি একটি বিশিষ্ট বন্ধু-সম্মেলন বলে। বন্ধুদের নিয়ে উৎসব করবার কথা কবিশেখর হাফিজ বলে গেছেন, সে-উৎসব সুদিনে ত জমেই, দুর্য্যোগে দুর্দ্দিনেও তা জমে—হয়ত আরো নিবিড়ভাবে।

আমার এই মন্তব্যে আপত্তির অবকাশ আছে, জানি। কেউ কেউ হয়ত বলবেন—দেশ বলতে যে বিরাট ব্যাপার বোঝায় সৃষ্টি-প্রক্রিয়া তার সর্ব্বত্র চলে না, তা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সৃষ্টিই বল আর সাহিত্যিক সৃষ্টিই বল; সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে চলে বিভিন্ন আয়তনে বিভিন্ন শ্রেণীতে বা গোষ্ঠীতে—উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে সৃষ্টি যেমন চলেছিল দেশের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ে।—কথাটি ভাববার মতো। এও দেখা যাচ্ছে, যাকে আমরা বলছি দুর্য্যোগ দুর্দ্দিন সে-দিনের কালো মেঘও একান্তভাবে রূপালি-ঝালরবিহীন নয়—এই দিনে বাংলার মুমূর্ষু কৃষক হয়ত নবজীবনের স্বপ্ন দেখবার অবকাশ পেয়েছে। কিন্তু তবু সাহিত্যের আসরে দাঁড়িয়ে বর্ত্তমান অবস্থাকে দুর্য্যোগ দুর্দ্দিন ভিন্ন আর কোনো আখ্যায় অভিহিত করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়; কেননা, সাহিত্যের সৃষ্টি যাঁদের দ্বারা হয় তাঁরা বিশেষভাবে গোষ্ঠী বা শ্রেণীর লোক হলেও যে বৃহত্তর পরিমণ্ডলে তাঁহাদের শ্বাস-প্রশ্বাস চলে তাতে বিরাজ করবে প্রসন্নতা; এই সাহিত্য সৃষ্টির জন্য বিধান-বিষবাষ্পে তা ভারাক্রান্ত হলে সাহিত্য স্রষ্টার প্রাণপুরুষ হয়ে পড়ে নির্বীর্য্য। কবি হুইটম্যান বলেছেন বটে—What writest thou! There is only one-subject—the subject of War; কিন্তু সাহিত্যের সে-যুদ্ধকে বলা যেতে পারে ধর্ম্মযুদ্ধ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের চির-অক্লান্ত যুদ্ধ—মিলটন ও শেলী যা করেছেন, যে-যুদ্ধে সে-সুর বাজে না, তার পরিবর্ত্তে বাজে ক্ষুদ্র-লোভ ও ক্ষুদ্র লাভ-চিন্তার উৎকট সুর, তা যে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা জোগাতে অক্ষম এ-কথা যথার্থ। এহেন যুদ্ধও অবশ্য জগতে বিরল নয়, আর এর স্তুতিপাঠকের অভাবও কোনো কালে ঘটেনি, সাহিত্যের আসরও মাঝে মাঝে তাঁরা জবর দখল করেছেন—কিন্তু কে না জানে যে আতস-বাজির তীব্র রোশ্‌নায়ে আকাশের প্রশান্তি ও নক্ষত্রের শাশ্বত জ্যোতি যে আচ্ছন্ন হয় সে ক্ষণকালের জন্যই।—অতএব প্রয়োজন, এই সমসাময়িক অস্বস্তিকে কিঞ্চিৎ ভোলা, অন্ততঃ এতে বিচলিত না হওয়া। সাহিত্যিকদের সভায় এটি সম্পূর্ণ সম্ভবপর। তাঁরাও দেশকালের সন্তান, নিঃসন্দেহ; কিন্তু সেই দেশ ও কাল চিরদিনই বিরাট্‌তর। সেই বিরাট্‌তর—সুতরাং নিভৃততর—আয়তনে আজ জমুক আমাদের মজলিস।

আপনাদের সাম্‌নে আজ আমার বিশেষ নূতন কথা বলবার নেই, প্রয়োজনও হয়ত নেই। তবে প্রাচীন কথা স্মরণ করবার আছে। পুরাতন সত্য বার বার নূতন করে স্মরণ করতে হয়। সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব ও ভাষায় তার সুপ্রকাশ, এ বিষয়ে সাহিত্যিকেরা বোধ হয় একমত। সাহিত্য এক শ্রেণীর শিল্প; তাই সাহিত্যপ্রসঙ্গে সহজেই শিল্পচাতুর্য্যের কথা মনে আসে। এটি সাহিত্যে অবাঞ্ছনীয়ও নয়, কেননা, সৌন্দর্য্যবোধের সঙ্গে এর যোগ রয়েছে। কিন্তু এই শিল্পচাতুর্য্য সম্পর্কে এ কথা কখনো ভোলা উচিত নয় যে এটি শিক্ষিতপটুত্ব নয়, এর মূলে রয়েছে সাহিত্যিকের সুগভীর ব্যক্তিত্বের প্রাণরস—সৌন্দর্যের মূলে যেমন স্বাস্থ্য। এই ব্যক্তিত্ব সাহিত্যিকদের কেমন করে লাভ হয় সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্যের সন্ধান আজো আমরা পাইনি। তবে এই কথা জানি যে এর অস্তিত্ব সাহিত্যিকরা অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন, এবং এর প্রভাবে জীবন তাঁদের কাছে হয় অর্থপূর্ণ, জগৎ তাঁদের চোখে হয় বর্ণ-গন্ধ-ময়, চিরনূতন। এই উপলব্ধির গুণে তাঁরা হতে পারেন স্রষ্টা; স্বভাবের বিচিত্র সৃষ্টির মতোই সে সৃষ্টি জীবনীশক্তিপূর্ণ, কবি গ্যেটে যাকে বলেছেন—

মানব-জীবনের ভিতর দিয়ে বিধাতার এক নবপর্য্যায়ের সৃষ্টি। কিন্তু এ সম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় অসঙ্গত, কেননা, বাক্য শেষ হবে না, আর নূতন বন্ধু যাঁরা স্নেহ ও কৌতূহল পরবশ হয়ে আছেন তাঁদের ধৈর্য্য অসীম নয়।

সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গে একটি ব্যাপারের উল্লেখই আমি আজ করবো—তার নাম আমি দিয়েছি পরিবেষ্টনের সঙ্গে প্রেমের যোগ। অন্যত্রও এর উল্লেখ আমি করেছি। আমাদের দেশ ও সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে মনে হয় বার বার এর উল্লেখ অসঙ্গত নয়। —জীবন যে তার চার পাশের সব-কিছুর সঙ্গে দৃঢ়-সম্বন্ধ কারো চোখেই তা না পড়ে পারে না ; আর মানব-জীবনের উৎকর্ষের কথা ভাবতে গিয়ে বলতে হয় উৎকৃষ্ট মানব-জীবনের অর্থ উৎকৃষ্ট মনোজীবন। সেই মনোজীবনের উৎকর্ষের মূলে একদিকে যেমন কৌতূহল অন্যদিকে তেমনি প্রেম—প্রেমে ক্ষুদ্র অহমিকার বন্ধন থেকে মানুষ ক্রমাগত মুক্তি পেয়ে চলে, জীবনে নব নব আশা ও আনন্দ লাভ তার পক্ষে সম্ভবপর হয়, অন্য কথায়, তার ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তন ঘটে। কৌতূহলের ব্যাপারে গুরুমশায়ের প্রয়োজন আছে তা ত দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে—নইলে এত বীক্ষণাগার সভ্যজগতে দেখা দিত না—কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে গুরুমশায়ের প্রয়োজন ঠিক নেই বরং প্রয়োজন আছে তাঁর জবরদস্তি থেকে নিজেদের উদ্ধার করবার। আমাদের চার পাশে যা কিছু আছে—জল স্থল অন্তরীক্ষ সমস্ত নীরব ও সরব বন্ধু—সবারই সঙ্গে আমাদের নাড়ীর যোগ রয়েছে, সেই যোগ সহজভাবে আমরা অনুভব করতে পারি, কিন্তু গুরুমশায়ের দল ব্যস্তসমস্ত হয়ে হুকুম চালান এর কতকগুলোকে সবলে আঁকড়ে ধরতে আর বাকীগুলো উপেক্ষা করতে। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্ :—যারা আমাদের মিত্র নয়, যেমন, রোগ, দারিদ্র্য, প্রবলের অত্যাচার, এদের সম্বন্ধে অত্যধিক হুসিয়ার হবার তাগিত এঁরা বার বার আমাদের দেন ; কিন্তু যারা আমাদের মিত্র, যেমন, স্বাস্থ্য, সখ্য, বিশ্বপ্রকৃতির মাধুর্য্য, এ-সব জীবনের জন্য যে কত বড় সম্পদ সেদিকে এঁদের দৃষ্টি অত্যন্ত কম। জীবন ঋণাত্মক নয়, ধনাত্মক—রোগ প্রতি-কারের ব্যবস্থার চাইতে তার জন্য অনেক বেশী মূল্যবান স্বাস্থ্যের আনন্দ উপভোগে বাধার অল্পতা। জীবনের খতিয়ানে জন্মমাত্র পাওয়া এই জমার অঙ্ক মানুষের চোখে যেন পড়তেই চায় না, তার চাইতে সে ভালবাসে খরচের অঙ্কের কথা ভেবে উৎকণ্ঠায় দিন কাটাতে। বলা বাহুল্য সন্তোষ পরম ধন—ঠিক এই তত্ত্বের প্রচার আমার কাম্য নয় : সন্তোষ অনেক সময়ে অজ্ঞতার প্রতিরূপ ; আমি বলছি জীবনানন্দের কথা—জীবনের মতোই যা সহজ জীবনকে সমৃদ্ধিময় করবার ক্ষমতা তারই আছে, যেমন রোগ প্রতিকারের ক্ষমতা আছে জীবনীশক্তির—সে ক্ষমতা ওষুধেরও নেই, উৎকণ্ঠারও নেই। বিশ্ববিধাতার পরম আশীর্ব্বাদ এই যে জীবনানন্দের পরিবেষ্টন তার লালয়িতা এবং সে লালন-ক্রিয়া তত সুন্দর ও সার্থক হয় যত নিবিড় যোগ ঘটে এই দুয়ের মধ্যে।

এই যোগ সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথাও আছে। আমাদের দেশের এক শ্রেণীর চিন্তাশীল বহুদিন ধরে বলে' আসছেন—আমাদের জীবন-ব্যাপার সব দিক থেকে পঙ্গু হয়ে আসছে, এর কারণ, ইউরোপের নতুন ধরণ-ধারণ আমরা অনুকরণ করে চলেছি—আমাদের চিরা-চরিত জীবনধারা আমাদের অনাদরের সামগ্রী হয়েছে। এঁরাও পরিবেষ্টনের সঙ্গে নিবিড় যোগের কথা বলেন ; কিন্তু এঁদের চিন্তার ক্রটী এই যে জীবনের সম্প্রসারণের প্রয়োজন ও সম্ভাবনার কথা এরা বোঝেন না, বরং সেটী এদের মনে সঞ্চারিত করে অনিশ্চয়তার ভয়। কিন্তু যত সাধুইচ্ছাপ্রণোদিতই হোক, এই ভয় অবাঞ্ছিত। পর্ব্বত থেকে উৎসারিত হয়েছে যে ঝরণার ধারা সে পর্ব্বতে সংলগ্ন থেকে পর্ব্বতের সঙ্গে তার অত্যাবশ্যক যোগ রক্ষা করে না—সে যোগ রক্ষা পায় পর্ব্বতের অকৃপণতায়, আর ঝরণার নিরন্তর প্রবাহিত হবার ক্ষমতায়। জীবন সম্প্রসারণশীল, যে-জীবন সম্প্রসারণশীল নয়

তা জীবনই নয়—এই কথাটী মনে রাখবার প্রয়োজন আছে। পরিবর্ষ্টনের সঙ্গে যোগ হয়ত প্রেমের যোগই হয় না যদি সম্প্রসারণের আনন্দ জীবনে না জাগে। সম্প্রসারণশীল জীবনই আস্বাদন করতে পারে পরিবেষ্টনের যত মধু—যেমন পরিবারকে নব নব গৌরবের ভাগী করে তার দেশ-দেশান্তরগামী সম্পদ আহরণশীল পুত্রই।—জীবন ও পরিবেষ্টনের যোগ সম্বন্ধে যা বলা হলো সেটী ব্যাপকভাবে জীবন সম্বন্ধেই, ঠিক সাহিত্য সম্পর্কে নয়। কিন্তু, সাহিত্য-সৃষ্টি বিস্তারিত জীবন-ক্রিয়ার একটী ব্যাপার—এ কথাটির মূল্য দিতে সাহিত্যিকদের যেন কখনও ভুল না হয়।

আমাদের দেশে যেমন পরিবর্ত্তনভীত দল আছেন তেমনি আছেন পরিবর্ত্তনলোলুপ দল। বলা বাহুল্য এই দুইই অস্বাভাবিক মানুষের দল। এর বড় কারণ মনে হয় রাজনৈতিক। বহুকাল ধরে এদেশে একত্র সমাবেশ ঘটেছে দৃপ্ত শাসক ও পরিম্লান শাসিতদের—তার ফলে দেশের মানসলোকে দেখা দিয়েছে একদিকে তীব্র বিতৃষ্ণা অন্য দিকে তীব্র আকর্ষণ। এ অনুমান যদি যথার্থ হয় তবে দেশে স্বাভাবিক সৃষ্টিধর্ম্মী মানুষের উদ্ভব যে একান্ত বিঘ্ন-সঙ্কুল—সেজন্য সাহিত্যিক ও সাহিত্যের উদ্ভবও কম বিঘ্ন-সঙ্কুল নয়—সে কথা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু এত নৈরাশ্য থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়ও এযুগে আবিষ্কৃত হয়েছে। জনসাধারণ ও শাসক-সম্প্রদায় এই দুয়ের ভিতরে যে-ভয়ের সম্বন্ধ এতদিন রাজনীতির খুব বড় একটা বিষয় ছিল আজ চিন্তাশীলদের চেষ্টায় প্রমাণিত হয়েছে—তা মায়া, রাজ-শক্তির প্রকৃত অধিকারী জনসাধারণ; সে-শক্তি ততদিন অন্যের হাতে থাকে যতদিন জনসাধারণ নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন না হয়; আমাদের অভিপ্সিত সৃষ্টিধর্ম্মী জীবন ও ব্যক্তিত্ব লাভ যে আমাদের এই বহু-নিন্দিত দেশেও সম্ভবপর—এই দিক দিয়ে দেখলে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় মনে হয়। সাহিত্যের মূল্য নিরূপণের কিছু চেষ্টা আজ হচ্ছে কিন্তু সে চেষ্টার অনেকখানি অপচেষ্টা, কেননা, সাহিত্যিক বিবেচনা ভিন্ন—সাহিত্যিক বিবেচনার অন্য নাম পরিপূর্ণ সত্যান্বেষণ—অন্য কোনো ধরনের বিবেচনার কথা সাহিত্যের মূল্য নির্দ্ধারণ সম্পর্কে উঠলে দেশে সাহিত্যের মর্য্যাদা হানি ঘটে, সত্যানুসন্ধিৎসা লাঞ্ছিত হয়। এমন বিচার-বিভ্রাট অবশ্য মানুষের সমাজে দুর্লভ নয়; যেমন দুর্লভ নয় দুর্ভিক্ষ মহামারি রাষ্ট্রবিপ্লব; তবে এমন দিনে সাহিত্যিকদের সচেতনতার প্রয়োজন হয় বেশী—সঙ্কটাপন্ন রোগী সম্বন্ধে যেমন প্রয়োজন হয় পরিচর্য্যারতদের পূর্ণ সতর্কতার। যে ক্ষেত্রে এই নব সাহিত্যের জন্ম তার নাম দেওয়া যেতে পারে—ইংরেজ শাসকদের প্রসন্নতালালিত বাংলার মধ্যবিত্ত হিন্দু-সমাজ। এই প্রসন্নতায় এই মধ্যবিত্ত হিন্দুর অন্তরে যে আনন্দ জেগেছিল তার সবটুকু অনাবিল হতে পারে না, কেননা, স্বার্থবোধ তার সঙ্গে জড়িত। এমন আনন্দের সৃষ্টি যে সাহিত্য তারও অনেকখানি অংশ তাই সাহিত্যে অপাঙ্‌ক্তেয়—স্বল্পতুষ্টি, অদূরদর্শিতা, ভাব বিলাসিতা, অভিমান, এমন কি কিঞ্চিৎ প্রতিশোধ লোলুপতা, একে করেছে এমন হতশ্রী। কিন্তু ইংরাজের এই প্রসন্নতা এই মধ্যবিত্ত হিন্দুর একটী ক্ষুদ্র অংশে সত্যকার জীবনানন্দও জাগিয়েছিল—সেই আনন্দও বাংলা সাহিত্যে রূপ লাভ করেছে, এবং তাতে দেশ ধন্য হয়েছে (এক কালে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্পর্শে এক-শ্রেণীর মুসলমানের অন্তরেও জেগেছিল এমন অনাবিলপ্রসন্নতা—সে-প্রসন্নতাও জগৎ তার ভাণ্ডারে সাদরে স্থান দিয়েছে)। পরবর্ত্তীরা পূর্ব্ববর্ত্তীদের যদি বুঝাইতে চায় তবে পূর্ব্ববর্ত্তীদের ভাল মন্দ সব কিছুই তাদের বুঝতে হবে—পল্লব-গ্রাহিতা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু বোঝার চাইতেও বড় কথা 'হওয়া' সেই ব্যাপারে অতীত আমাদের সাহায্য করে যা তার শ্রেষ্ঠ অংশ, তার প্রেরণা-কেন্দ্র তাই দিয়ে—সুদর্শন বা কুদর্শন সব প্রদীপ যেমন অন্য প্রদীপকে সাহায্য করে মাত্র তার শিখা দিয়ে। বাংলা সাহিত্যে আবর্জ্জনা যতই থাকুক—কোন্ সাহিত্যেই বা আবর্জ্জনা নেই—তার মণিকোঠায় জ্বলছে যে রত্নদীপ তার সন্ধান যদি দেশে না রাখে তবে দেশ দুর্ভাগা।

সাহিত্যে গণসংযোগের কথা ভাববার একটি বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে বাংলার সাহিত্যের ভাষার জন্য। সে-ভাষা সংস্কৃতশব্দবহুল, নিঃসন্দেহ। এতে উপকার যে না হয়েছে তা নয়—বাংলা ভাষার প্রকাশসামর্থ্য এতে বেড়েছে। কিন্তু ক্ষতি এই হয়েছে যে, জনসাধারণও শিক্ষিত-দল এই দুয়ের ভিতরে ব্যবধান বিস্তীর্ণতর হবার পথে চলেছে। জনসাধারণের ভিতরে যদি শিক্ষা পরিব্যাপ্ত হয়, তবে এর কিছু প্রতিকার হবে ; সেই সঙ্গে ভাষাকে আরো প্রাকৃতজনবোধ্য করতে চেষ্টা করা সুপরামর্শ। এজন্য বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষায় সাহিত্যরচনা হতে পারে কিনা সে কথাও ভাববার মতো। কিন্তু একথা সাহিত্যিকদের ভুললে চলবে না যে, জনসাধারণ তাঁদের কৃপার পাত্র নয় কখনো —তারা উপহার চায় সাহিত্যই, হিতকথা বা উৎসাহ-উদ্দীপনার কথা মাত্র নয়। সহজ-বোধ্য ভাষাও সাহিত্যিক শ্রী-ভূষিত হতে পারে—সুরুচিসম্পন্নাতন্বীর দেহে যেমন সাধারণ বস্ত্রও হয়ে ওঠে শ্রীময়।"

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের (১৩৪৬), অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন খান বাহাদুর আজিজুল হক। তাঁর অভিভাষণে তিনি বলেন (২১:৭. জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬) :

"বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি স্বরূপে আমি আপনাদিগকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। এই নিদারুণ গ্রীষ্মে বাংলার নানা-স্থান হইতে যে আপনারা এই সম্মেলনের অধিবেশনে সমবেত হইয়াছেন, তাহাতেই আপনাদিগের আন্তরিক সাহিত্য-প্রীতির সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং বিশেষ করিয়া আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া সেই সাহিত্য-প্রীতির মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবার ইচ্ছা আমার আদৌ নাই। আপনাদিগের নিকট আমার এইমাত্র নিবেদন যে, অভ্যর্থনা-সমিতির যদি কোন দোষ-ত্রুটি ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে আশা করি, নিজেদের জিনিষ মনে করিয়া আপনারা উহাকে উপেক্ষা করিয়া যাইবেন।

আমি সাহিত্যিক নই এবং বর্ত্তমানে সাহিত্যের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও নাই। কলিকাতার কল-কোলাহলের ঘূর্ণ্যাবর্ত্তে মানুষ সাহিত্য কেন অনেক কিছুই ভুলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। জীবনের প্রারম্ভ হইতে সাহিত্যের সহিত নিকট-সম্বন্ধ ও প্রাণের আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও কলিকাতার অগণ্য জনমানবের ঘাত-প্রতিঘাত, ইচ্ছা থাকিলেও, আমার সাহিত্যচর্চ্চা করিবার সময় ও সুযোগ ঘটিয়া উঠে না। কাজেই এই সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন আপনাদিগকে সাহিত্যের অবদান হিসাবে বিশেষ-কিছু আমি দিতে পারিব না। তবুও মরহুম কবি মোজাম্মেল হক সাহেবের বংশধর হিসাবে হয়তো কিছু বলিবার অধিকার আমার আছে। আর সর্ব্বোপরি আমি বাঙ্গালী এবং বাংলা আমার মাতৃভাষা। তাই আমি আমার নিজের অযোগ্যতা সত্ত্বেও এই গুরু-দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি।

তবে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, অধিকার, দাবী বা শক্তি না থাকিলেও অনেক সময় মানুষ নিজের মতবাদকে প্রকাশ করিতে দ্বিধাবোধ করে না। এই নজীরের দোহাই দিয়া আমিও যদি দুই একটী কথা বলি, তাহা হইলে আশা করি, আপনারা ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন না।

মুসলমান সাহিত্য-সম্মেলনের নাম শুনিয়াই হয়তো অনেকে বলিবেন যে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করার সার্থকতা কি ? তাঁহারা বলেন—জাতির উন্নতির পথে অন্তরায় তো যথেষ্টই আছে। রাজনীতিক্ষেত্রের স্বাতন্ত্র্য ও সাম্প্রদায়িকতায় দেশ জর্জ্জ-রিত। তবে এই নুতন অন্তরায়ের অবতারণার হেতু কি? আবার এই নূতন উপদ্রব মুসলমান সাহিত্য-সম্মেলন করিয়া সাহিত্যে সঙ্কীর্ণতা সৃষ্টি করার প্রয়োজন কি ?

এ-কথা সত্য যে সাহিত্যে আভিজাত্য, শ্রেণীবিভাগ ও স্বাতন্ত্র্যের স্থান নাই। সাহিত্য চিরন্তন শাশ্বত ও সর্ব্বজনীন। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সাহিত্য মানবের অন্তরের অন্তরতম স্তরে যে-প্রেরণা জাগাইয়া দেয়, সমাজ-হৃদয়ের পরতে পরতে যে-ভাবের স্পন্দন আনিয়া দেয়, জাতির মরমে যে-বাণী পোঁছাইয়া দেয় এবং যে অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে হৃদয়তন্ত্রী বাজাইয়া তোলে, তাহাতে মানুষ সত্যকার মানুষ হইয়া উঠে। কিন্তু সে-সাহিত্যসৃষ্টি বহু সাধনা-সাপেক্ষ। সৃষ্টির প্রাক্কালে স্রষ্টার যে সাধনা, প্রয়াস ও ত্যাগের প্রয়োজন হয় তাহা সাধারণতঃ লোকচক্ষুর সমক্ষে উপস্থিত হয় না। মানুষ তাহা জানে না, জানিতে চাহে না, জানিবার প্রয়োজন ও অবসর তার হয় না। সেইদিক দিয়া বলিতে গেলে, মুসলমান সাহিত্যিকদের সাধনার পথে যে অন্তরায় আছে, তাহাকে অতিক্রম করিতে হইলে বিরাট শক্তির প্রয়োজন। দুর্ভাগ্য ও দুঃখের কথা, সে-প্রয়োজনের অনুভূতি আমাদের মধ্যে এখনও সম্পূর্ণ জাগে নাই। শুধু মেধা ও মস্তিষ্কের সাহায্যে সাহিত্যের সৃষ্টি করা যায় না। তাহার জন্য স্বাভাবিক শক্তি, প্রেরণা ও প্রতিভার প্রয়োজন। কিন্তু এ-সকলের সাফল্য নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সাগ্রহ সহানুভূতির উপর। মহাকবি লিখিয়াছিলেন:—'গুণ-সমাবেশের মধ্যে একটী মাত্র দোষ থাকিলে, জোৎস্না-কিরণে চাঁদের কলঙ্কের ন্যায় তাহা ডুবিয়া যায়।' তাহার উত্তরে অন্য কবি বলিয়াছিলেন: 'মহাকবি ইহা নিশ্চয়ই দেখেন নাই যে, দারিদ্র্য দোষ সমস্ত গুণরাশিকে বিনষ্ট করিয়া দেয়।' কবির এই বহুকথিত বাণীর পুনরুক্তির কারণ আর কিছুই নয়—কারণ এই যে-দারিদ্র্যের কষাঘাতে মুসলমান সাহিত্যিকদের সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্যসাধনায় নানা প্রকার বাধা-বিপত্তি আসিয়া পড়ে, সেই সকল বাধা-বিপত্তির দূরীকরণকল্পে মুসলমান সাহিত্য-সম্মেলনের যে যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে, এ-কথা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

আরও একদিক দিয়া এই সাহিত্য-সম্মেলনের বিশেষ গুরুত্ব আছে। বাংলার অধিবাসী শতকরা ৫৪ জন মুসলমান, তাহাদের অন্ততঃ শতকরা ৯২ জনের মাতৃভাষা বাংলা। ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে বাংলা ভাষা আজ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না। কাব্য-নাটক, উপন্যাস, ইতিহাস, দর্শন-বিজ্ঞান, ভাষা ও সাহিত্য অভাবনীয়রূপে সমৃদ্ধ হইয়াছে। সৃষ্টির বৈচিত্র্যে, ভাষার ঝঙ্কারে, ভাবের শতধারা প্রবাহে আজ বঙ্গ-সাহিত্য বাঙ্গালার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বাঙ্গালী আজ সে-গৌরবে গৌরবান্বিত। তবে এ-কথাও স্বীকার্য্য যে, এই সাহিত্যে মুসলমানের দান তাহার সংখ্যানুপাতে যথেষ্ট নহে। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের উপর মুসলমান তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; কাজেই বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের ভাব ও প্রভাব ফুটিয়া উঠে নাই। বাংলা ভাষা বাঙ্গালীর মাতৃভাষা—হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলের মাতৃভাষা। সুতরাং ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গতা সাধন করিতে হইলে ইস্‌লামী কৃষ্টি ও সাধনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আমার এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, প্রধানতঃ দুইটী বিরাট সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি এবং এই দুই সম্প্রদায়েরই কৃষ্টিও সাধনার সমন্বয়েই বাঙ্গালীর প্রকৃত জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টির সম্ভাবনা।

রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে, ধর্ম্ম ও ভাবের ক্ষেত্রে, সাহিত্য যেরূপ প্রভাব বিস্তার করে, অন্য কিছু সেরূপ করিতে পারে না। বিগত এক শতাব্দির মধ্যে বাঙ্গালী জাতি যে-প্রেরণা লাভ করিয়াছে, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে-শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে, তাহার মূলে বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট প্রভাব আছে। কিন্তু তাহার মূলে মুসলমানের প্রভাব বড় বেশী নাই। ইহার দায়িত্ব যদি কাহারও থাকে তবে সে মুসলমানেরই। গত এক শতাব্দীকাল তাহারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে উপেক্ষা করিয়া

আসিয়াছে কিন্তু বুঝিতে পারে নাই, তাহাদের সে-উপেক্ষার অন্তরালে যে বিরাট মহীরুহ ফল-পুষ্পসম্ভারে আকাশমার্গে মাথা তুলিয়াছে, তাহারই ঘন ছায়ায় তাহার সমস্ত কৃষ্টি, সমস্ত সাধনা আত্মসত্তা হারাইয়া ফেলিতেছে।

বাংলা সাহিত্য বাঙ্গালীকে অনুপ্রাণিত, সঞ্জীবিত ও সংবুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে মুসলমানের খুব বেশী স্থান নাই। তাই আজ মুসলমানও চায় নিজেকে সংবুদ্ধ করিতে, দেশ ও সাহিত্যের মধ্যে তাহার প্রকৃত স্থান গ্রহণ করিতে। সে চায় তাহার স্ব-অধিকার বুঝিয়া লইতে—তাহার সমাজকে, নিজের বাঁচাইয়া রাখিতে। মুসলমান আর বাঁচিয়া মৃতপ্রায় থাকিতে চায় না। সে পিছনে পড়িয়া থাকিতে চায় না—সে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া সকলের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে চায়। কাহারও বিন্দুমাত্র অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য তাহার চেষ্টা নয়। সাহিত্যের মধ্যে যে-শক্তি ও প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছে তাহার কোনরূপ ব্যতিক্রম করিবার জন্য তাহার প্রয়াস নয়। বাঙ্গলার সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা পল্লীভূমিতে সে আরবের মরুভূমি, পারস্যের গিরি-কান্তর জোর করিয়া বসাইতে চায় না। সে বাংলাসাহিত্যে তুরস্কের বিপ্লব, মিসরের যুগসঞ্চিত শব আনিতে চাহে না। সে ভাষার ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে চায়। তাহার নিজস্ব রত্ন-সম্ভার ঐশ্বর্য্য-কান্তি, আদর্শ-অনুভূতি ভাষা ও সাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিতে চায়। বাঙ্গলার পল্লী-জননীর ক্রোড়ে থাকিয়া তাহারই শ্যামলা বিটপীর সুশীতল ছায়ায় সে একটু স্থান পাইতে চায়।

এ-কথার সত্যতা স্বীকার করিলেও প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে, বাংলা সাহিত্যে কিসের অভাব, যাহার জন্য মুসলমান সাহিত্যিকের প্রয়োজন। এ-কথার পূর্ণ সমালোচনা আমার এই সংক্ষিপ্ত অভিভাষণের মধ্যে হওয়া সম্ভবপর নহে। তবে সাহিত্যের ভাণ্ডারে মুসলমানের অনন্ত ও অমূল্য রত্নরাজি প্রবেশলাভ করিবে না, মুসলমান তাহার জ্ঞান ও মনীষার সম্যক পরিচয় প্রদান করিতে পারিবে না, তাহার আদর্শ ও ইতিহাসের উজ্জ্বল চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া খুলিয়া ধরিবে না, ইহা বলা চলে না। যে-সমাজ, যে-ধর্ম্ম, যে-শক্তি কয়েক শতাব্দীর মধ্যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাসে নূতন আদর্শের ভিত্তিস্থাপন করিয়া বর্ত্তমান জগতে মানবতার প্রেরণা আনিয়াছিল, যে-সমাজ ঘোর অন্ধকার যুগে আটলাণ্টিকের কূল হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের বেলাভূমি পর্য্যন্ত শাসন-তন্ত্র পরিচালনা করিয়া ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার সাহিত্যে বিশেষ-কিছু দান করিবার নাই, এ-কথা বলা চলে না। তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ, শ্রেষ্ঠ সাধনা, যুগান্তরকারী কৃষ্টি সাহিত্যে স্থান পাইবে না, ইহা বলিলে সাহিত্যের স্বরূপ ভুলিয়া যাইতে হইবে।

আমরা পাশচাত্য জাতি নহি—প্রাচ্যের অধিবাসী। চিরকাল আমরা নিজ নিজ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া ইতিহাসে স্থান পাইয়া আসিতেছি। আমরা সমস্ত ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু আমরা ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারি না। হিন্দু তাহার হিন্দুত্ব ভুলিয়া যাইবে, মুসলমান তাহার ইসলাম ত্যাগ করিবে, ইহা কবির কল্পনাতেও আসিতে পারে না। হিন্দু সত্যিকার হিন্দু থাকিয়া, মুসলমান খাঁটি মুসলমান হইয়াও, বিরাট বাঙ্গালী জাতি বাঙ্গলার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করিতে পারে, ইহা স্বপ্ন নহে, সত্য। জাতি, ধর্ম্ম ও আদর্শের বৈষম্যে আমরা বিভিন্ন হইলেও জাতীয়তায় আমরা বিরাট বাঙ্গালী জাতি এবং তাহাই বাংলার ভবিষ্যৎ। সেই বিরাট জাতির সৃষ্টি জাতীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়াই সম্ভব এবং সেই জাতীয় সাহিত্যই আমাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। সে-সাহিত্যে বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্কর, নানক, সীতা, সাবিত্রী, কনিষ্ক, অশোক, পুরু, প্রতাপসিংহের জীবনের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গেই আবুবকর ওমর, আলি, খালেদ, খাদেজা, রাবেয়া, সালাউদ্দিন, মুস্তফা, কামালের জীবনের মহান আদর্শ সম্মিলিত হইয়া জীবনের মহান আদর্শের সম্মিলনে জাতীয় জীবনকে উদ্বুদ্ধ করিয়া

তুলিবে। আজ সেই সাহিত্যই আমাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। সেই সাহিত্যই হইবে জাতির জীবন-পথের শাশ্বত পথরেখা—ভবিষ্যৎ আঁধার পথে চিরন্তন আলোর দিশারী।

আজ মুসলমান সাহিত্যিকগণের নিকট আমার ঐকান্তিক নিবেদন—আপনারা সাহিত্যের ভিতর দিয়া দেশের সম্মুখে ইসলামের আদর্শ ও মুসলমানের ইতিহাসের স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করুন। মুসলমানের দান, ভারত-ইতিহাসে মুসলমানের স্থান, ইসলামের বৈশিষ্ট্য, তাহাদের সাধনা ও ত্যাগ, শৌর্য্য, পরাক্রম, শিক্ষা, সভ্যতা ও মানবতার কথা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে প্রচারিত করুন। অথচ বাংলার প্রাণ যেন তাহার মধ্যে থাকে। শিল্পীর সৃষ্টি-সৌন্দর্য্য, ভাষার লালিত্য, ছন্দের উন্মাদনা তাহাতে যেন থাকে। সেই আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিতে হইবে। অতীত গৌরবের কথা হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিয়া বর্ত্তমান যেন সকল সময় আমাদের হৃদয়-ফলকে অঙ্কিত থাকে। তবেই দেশ, সমাজ, জাতির মঙ্গল এবং ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইবে। নতুবা আমরা যে-তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইব।''

ঐ সম্মেলনে মূল সভাপতি ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। মূল সভাপতির ভাষণের শিরোনাম ছিল 'বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্যিক জাগরণ' (২১:৭, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬)। ভাষণে —আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ বলেন :

''বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্যিক জাগরণ বাস্তবিকই বিস্ময়ের সামগ্রী। এই বিস্ময় শুধু আমার একার নহে, ইহা আমাদের প্রতিবেশী হিন্দুভ্রাতৃগণকেও বিস্মিত করিয়া দিয়াছে। তাঁহারা নানাস্থানে—সাহিত্য-সম্মেলনে এবং কলিকাতার নানা কাগজে নানা-ভাবে বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। মুসলমানেরা এইবার রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা টানিয়া আনিল বলিয়া নানাদিক হইতে নানা ভাবের হুঙ্কার কানে আসিতেছে। আমি রাজনৈতিক নহি। রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙ্গালার মুসলমান কতখানি সাম্প্রদায়িক, সে-কথার বিচার বাঙ্গালী মুসলমান রাজনীতিকরা করিবেন। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমানের জাগরণে সত্যই সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিয়াছে কিনা, সে-কথা বলিবার অধিকার যতই সামান্য হউক—আমার আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। তাই আজ এই সম্বন্ধে আমি গোড়াতে দুই একটি কথা বলিব।

সাহিত্যে জাতি-ধর্ম্মের গণ্ডী আমি কখনও স্বীকার করি নাই, এখনও করি না ; কিন্তু ইহার বৈচিত্র্য স্বীকার করি। সাহিত্য হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান যে-জাতিরই হউক, ইহা সাহিত্য পদবাচ্য হইলেই সার্ব্বজনীন হইয়া থাকে। এই সার্ব্বজনীনতা নানা বৈচিত্র্যের মধ্য হইতে উদ্ভূত হয়। আমার ধারণায় সৌন্দর্য্য সার্ব্বজনীন গুণ ; ইহা মস্‌জিদ ও মন্দিরে সমভাবে প্রতিফলিত হইতে পারে। মস্‌জিদ ও মন্দির সৌন্দর্য্য প্রকাশের স্বচ্ছ আধার মাত্র। এজন্যই উভয়ের মধ্য দিয়া সার্ব্বজনীন সৌন্দর্য্য শুধু বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রকাশিত হয়। আধারের গঠন-ভঙ্গীর তারতম্যে আধেয় পরিবর্ত্তিত হয়, এই কথা স্বীকার করিতে বাধে। সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যের পরিসর বহুবিস্তৃতির সম্ভাবনায় পূর্ণ। শুধু জাতি-ধর্ম্মের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে ইহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে ইহার পরিসর সীমাবদ্ধ হয়, সৌন্দর্য্যের সকল দিক স্বতঃস্ফূর্ত হইতে পারে না। মুসলমানের সাহিত্য সার্ব্বজনীন সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যের বিচিত্র ভঙ্গীর একদিক মাত্র। হিন্দুর সাহিত্যও তদ্রূপ আর একদিক। এই জন্যই আধুনিক বঙ্গের সাহিত্যিক জাগরণকে আমি ভীতির চক্ষে দেখি না,—বরং প্রীতির নয়নেই নিরীক্ষণ করিয়া থাকি। কারণ অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অমার শ্রদ্ধা সুগভীর এবং পরিচয় প্রাচীন।

বঙ্গীয় মুসলমানদের বর্ত্তমান সাহিত্যিক জাগরণ এই সম্প্রদায়ের প্রগতির পরিচায়ক ত বটেই, সঙ্গে সঙ্গে অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যেরও বৈচিত্র্য এবং সম্পদবৃদ্ধির একটি প্রধান চিহ্ন। বাঙ্গালা সাহিত্য শুধু বাঙ্গালী হিন্দুর কিম্বা বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য নয় ; ইহা উভয়েরই সম্মিলিত সাহিত্য। উভয় জাতি এই সাহিত্যকে আপন ধর্ম্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা দিয়া সৌষ্ঠবশালী করিয়া না তুলিলে এই সাহিত্য যে নিতান্তই একদেশদর্শী হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও মুসলমানগণ তাহাদের সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য দিয়া এই সাহিত্যকে পরিপুষ্ট না করিলে আজ মধ্যযুগীর বাঙ্গালা সাহিত্যকে শুধু শাক্ত হিন্দুদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় এত উন্নত অবস্থায় পাওয়া কখনই সম্ভব হইত না।

আমি বিশ্বাস করি, মুসলমানদের বর্ত্তমান সাহিত্যিক জাগরণ অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যকে সম্পদশালী এবং বাঙ্গালা ভাষাকে শ্রীসম্পন্না করিয়া তুলিতেছে। একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, মুসলমানেরা আপন জাতীয়, ধর্ম্মীয়, সংস্কৃতি ও সভ্যতাগত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য লইয়া বাংলা ভাষার সেবা করিলে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য অপ্রতুল ও অনুপমেয় মূর্ত্তি ধারণ করিবে। যাঁহারা মুসলমানদের বর্ত্তমান সাহিত্যিক প্রগতির পরিপন্থী, তাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের মিত্রতার মুখোষ পরিয়া তৎপ্রতি শত্রুতাই সাধন করে মাত্র ; কেননা তাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যকে একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ইহাকে ইহার স্বাভাবিক স্ফুরণের ও সম্প্রসারণের বৈচিত্র্য হইতে বঞ্চিত রাখিতে চেষ্টা করেন। এই জন্য আমি ইংরেজ আমলের প্রথম যুগের মিশনারীরচিত বাঙ্গালা সাহিত্যকেও—তাহা যতই অকিঞ্চিতকর হউক—অপ্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করি না। নিতান্তই অকিঞ্চিতকরও হাস্যাস্পদ হইলেও তাঁহারা আধুনিক যুগের বিচিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যের বনিয়াদ পত্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রধানতঃ এই প্রকারের খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়াই আমি আধুনিক মুসলিম সাহিত্যিক জাগরণকে মোটেই সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টি দিয়া দেখি না বা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া মনে করি না। যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে, মুসলমানগণ আজ স্বীয় ধর্ম্ম বা সম্প্রদায় বুদ্ধিতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরিচালিত হইয়াছেন, তথাপি ইহাতে ভীত হইবার কোন কারণ দেখি না। অষ্টাদশ শতকে মিশনারীরাও কি সাম্প্রদায়িক ও ধর্ম্মীয় বুদ্ধিতে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করেন নাই ? তাহাতেও বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষতির চেয়ে উপকারই হইয়াছে অধিক। আধুনিক মুসলিম সাহিত্যিক ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মিশনারী সাহিত্যিকদের মধ্যে সাহিত্যিক ও ধর্ম্মীয় বদ্ধিতে তফাৎ বিস্তর। মিশনারীরা সাহিত্য হিসাবে সাহিত্যের সেবা করেন নাই ; কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানরা আজ আপন সাহিত্য হিসাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিতেছেন। ইঁহারা আপন সাহিত্য হিসাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিতেছেন বলিয়াই আজ হয়ত কতকটা তাঁহাদের স্বীয় আপনত্ব বা বৈশিষ্ট্য এই সাহিত্যে দেখা দিয়াছে। ইহাকে সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া চীৎকার করিলে চলিবে কেন ? মুসলমান আপন বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়া বাঁচিতে পারে না। দুনিয়ার কোন জাতিই জাতি হিসাবে আপন বৈশিষ্ট্য ছাড়াইয়া বাঁচিতে পারে না—বাঁচেও নাই। সুতরাং মুসলমানের বেলায় ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন ? আর যাঁহারা মুসলমানদের সাহিত্যিক জাগরণকে বিভীষিকার দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, তাঁহাদের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, মেহেরবানী করিয়া একটীবার বিচারের দৃষ্টিকোণ ফিরাইয়া লউন এবং উদার দৃষ্টিতে অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যকে দেখিতে থাকুন ; দেখিতে পাইবেন, মুসলমানদের সাহিত্য-সাধনায় বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়, উজ্জ্বল—বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাবি ফল অমঙ্গলজনক নয়, মঙ্গল-প্রসূ। মুসলমানদের আধুনিক সাহিত্যিক জাগরণে বাঙ্গালা সাহিত্য-জগতের কোন কোন কেন্দ্রে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আমার এই আশ্বাসবাণীতেও যে বিদূরিত হইবে, তেমন

বোধ হয় না। এইজন্যই বাঙ্গালী মুসলমানদের আধুনিক সাহিত্যিক জাগরণের বিশ্লেষণ ও তৎপ্রসঙ্গে প্রতিবেশী আতঙ্কিত জনগণের আশঙ্কার কারণ সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়।

মুসলমানদের আধুনিক সাহিত্যিক জাগরণের যে-দিকটি সর্ব্বাগ্রে প্রতিবেশীদের চোখে পড়িয়াছে, তাহা প্রধানতঃ ভাষা-সংশ্লিষ্ট। তাঁহারা বলিতেছেন, বাঙ্গালী মুসলমানেরা বাঙ্গালা ভাষাকে দ্বিখণ্ডিত করিবার উপক্রম করিয়াছেন। এই অভিযোগ একেবারে অসার নহে। কতিপয় প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান লেখক (আমি ইচ্ছা করিয়াই সাহিত্যিক বলিলাম না) আজ যেন কোমর বাঁধিয়া কাজে-অকাজে বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রচলিত বা অপ-প্রচলিত ফারসী বা আরবী শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দুলেখকদের অদ্ভুত সংস্কৃত শব্দের আমদানীর অত্যাচারে বা সংস্কৃত ব্যাকরণের কচ্‌কচির জুলুমে মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা যে-অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এই প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানদের লেখায়ও বাঙ্গালা ভাষার সেই দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। তবে আতঙ্কিত জনগণ নিজেদের দোষের প্রতি যেমন উদার, মুসলমানদের দোষের প্রতি তেমন অসহিষ্ণু। এইজন্যই তাঁহারা মনে করেন, বাঙ্গালা ভাষা দ্বিখণ্ডিত হইতে উপক্রান্ত হইয়াছে। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, প্রাকৃত ভাষাই বাঙ্গালা ভাষার জননী—সংস্কৃত নহে। আরবী বা ফারসীর সহিত বাঙ্গালা ভাষার সৌষ্ঠববৃদ্ধির যে-সম্বন্ধ সংস্কৃতের সহিতও ইহার সেই একই সম্বন্ধ। তবে সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার আত্মীয়তা স্বাদেশিকতার সূত্র ধরিয়া বৃদ্ধি পাওয়ায় আপাত দৃষ্টিতে সংস্কৃতকে বাঙ্গালার খুবই আত্মীয় বলিয়া মনে হয়--- এই যা তফাৎ। কারণে অকারণে বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের আমদানীতে যদি ভাষার প্রতি জুলুম করা না হয়, তবে আরবী বা ফারসীর আমদানীতে কেন তাহা ঘটে, তাহা সরল বুদ্ধিতে বুঝিতে পারা কঠিন। আমার মতে এই উভয় প্রকারেই বাঙ্গালা ভাষার প্রতি জুলুম করা হয়। এই দুই দলের হাত হইতেই বাঙ্গালা ভাষাকে বাঁচাইতে হইবে। তবে দুইদলের কাহারও লেখা দেখিয়া আমি ভীত নহি। কারণ, একটি ভাষাকে প্রতিভার জ্যোতিতে উজ্জ্বল করিয়া সমগ্র জাতিকে সেইদিকে টানিয়া লইতে হইলে যে অসামান্য প্রতিভার প্রয়োজন, ইহাদের মধ্যে সেই প্রতিভার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহাদের সৃষ্ট সাহিত্যের স্বাভাবিক মৃত্যু অনিবার্য্য।

এই প্রসঙ্গে মুসলিম সাহিত্য-সৃষ্টির কথা আসিয়া পড়ে। এখানেই প্রশ্ন উঠে, সাহিত্য ত সাহিত্যই, তাহার আবার জাতের বালাই কেন? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাহিত্যে জাতিধর্ম্মের গণ্ডী আমি স্বীকার করি না, কিন্তু ইহার বৈচিত্র্য মানি। অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যকে যদি একটি পুষ্পরূপে কল্পনা করা যায়, তবে বলিতে পারি, বঙ্গীয় মুস্‌লিম সাহিত্য তাহার একটি দল বা পাপড়ী মাত্র। আর বাঙ্গালা সাহিত্যকে যদি বিশ্বের সার্ব্বজনীন সাহিত্যের একটি দলরূপে কল্পনা করা হয়, তবে বঙ্গীয় মুস্‌লিম সাহিত্য এই পুষ্পদলের অপরূপ বর্ণচ্ছটার একটি। আমার মনে হয়, বঙ্গীয় মুস্‌লিম সাহিত্য আজ পর্য্যন্ত প্রকৃত সংজ্ঞালাভ করে নাই বলিয়াই অপরের জন্য ইহার প্রকৃতি বুঝিবার পক্ষে বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সাহিত্যের সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণার জন্যই গোলযোগের সৃষ্টি অস্বাভাবিক নহে। এতৎসম্বন্ধে আমার ধারণা একরূপ সুস্পষ্ট। আমার মতে বঙ্গীয় মুসলমান তাহার ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আচার-ব্যবহার লইয়া যে-সাহিত্যের সৃষ্টি করে অর্থাৎ বাঙ্গালা সাহিত্যের যে-অংশে মুসলমানের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আচার-ব্যবহারের সুন্দর দিক ফুটিয়া উঠে, তাহাই 'মুস্‌লিম সাহিত্য।' এই সাহিত্য অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে পৃথক নহে, কিন্তু প্রকাশভঙ্গীতে, রূপে রসে মুসলমান ব্যতীত অপরের সংস্কৃতি-গত সাহিত্য হইতে অনেকখানি স্বতন্ত্র। মুসলমানের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আচার-ব্যবহারের বিশিষ্ট ভাবদ্যোতক শব্দ ও ভাবের স্পষ্ট ছাপ বহন করিলেও, ভাষায় এই

সাহিত্য পুরাদস্তর বাঙ্গালী, প্রাণের স্ফুরণে এই সাহিত্য হইতে বাঙ্গলার ভিজা মাটির সম্মোহন গন্ধ ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু ইহা মস্তিষ্কে আরবী এবং ভাব-সম্পদে অনেকখানি পারসিক। অন্য কথায়, এই সাহিত্য ইমানে ইস্‌লামী, অঙ্গসৌষ্ঠব ও প্রাণের স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গীতে, বিশেষ করিয়া প্রেরণায়, গোটাটি হউক বা না হউক পনের আনি বাঙ্গালী এবং পোষাকে-পরিচ্ছদে অনেকখানি পারসিক।

আমি প্রধানতঃ এইরূপ মুস্‌লিম সাহিত্যেরই পক্ষপাতী; কেননা মুস্‌লিম সাহিত্য বলিতে আমার মনে যে-সাহিত্যের অপরূপ মূর্ত্তি রূপায়িত হইয়া উঠে, তাহা এইরূপ। বঙ্গীয় মুসলমানদের এইরূপ সাহিত্যই আমার ধর্ম্ম-বিশ্বাস সুদৃঢ় করে, আমার জাতিগত সংস্কৃতি ও সভ্যতার সহিত আমাকে নিবিড়ভাবে পরিচিত করিয়া তোলে, বাঙ্গালী হিসাবে আমার প্রাণে অনন্ত প্রেরণা জাগায়; রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে আমাকে মাতাইয়া তুলিয়া আমার নিজের সহিত পরিচিত করিয়া দেয়। আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালী মুসলমানের এইরূপ সাহিত্যই অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যকে বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিয়া ইহাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে পারে। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমার এই বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয়। প্রাচীন বাঙ্গালার মুস্‌লিম সাহিত্য সেই সময়ের অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যে যে-বৈচিত্র্যের আমদানী করিয়াছিল, তাহা প্রধানতঃ এইরূপ। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও যেটি আমার চোখে বড় করিয়া দেখা দিয়াছে, তাহা হইল প্রাচীন মুসলমান বঙ্গীয় কবিদের ইস্‌লামী ভাব ও চিন্তাধারায় অখণ্ড বাঙ্গালা-সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধন। বিরাট প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য মুসলমানদের নিকট ইত্যাকার নানা বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রচুর পরিমাণে ঋণী।

অধুনা বঙ্গীয় মুস্‌লিম সাহিত্য বলিতে এদেশের মুস্‌লিম রচিত—তাহা যে-প্রকৃতিরই হউক—বাঙ্গালা সাহিত্যই বুঝায়। কি কারণে জানি না, বঙ্গীয় মুসলমানদের দ্বারা রচিত আধুনিক প্রকৃতির ছাগতন্ত্রী সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া কোরাণ-হাদিসের কথা পর্য্যন্ত আজকাল এদেশে মুস্‌লিম সাহিত্য নামে পরিচিত হইতেছে। আমি কিন্তু এই নামীয় সাহিত্যের অধিকাংশকে মুস্‌লিম সাহিত্য বলিতে নারাজ। কেননা আমার মতে শুধু মুসলমান কর্ত্তৃক রচিত হইলেই সে-সাহিত্য 'মুস্‌লিম সাহিত্য' হয় না। যে-বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার অভাব যে-সাহিত্যে বর্ত্তমান, তাহা মুসলমান কর্ত্তৃক রচিত হইলেও মুস্‌লিম সাহিত্য নয়। পক্ষান্তরে, যে-সাহিত্যে তাহা পূর্ণমাত্রায় অবিকৃত অবস্থায় বর্ত্তমান, তাহা মুসলমান কর্ত্তৃক রচিত না হইলেও মুস্‌লিম সাহিত্য। আধুনিক মুসলমান লেখকদের মধ্যে পনের-আনি লেখকের লেখা ইস্‌লামী বৈশিষ্ট্য বর্জ্জিত। ইহাকে কি প্রকারে 'মুস্‌লিম সাহিত্য' নাম দেওয়া যায়? বাঙ্গালা সাহিত্যে ইস্‌লামী সাহিত্যের এইরূপ দীনতা বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে শুভ বলিয়া মনে হইতেছে না। ইহাতে বিরাট বাঙ্গালা সাহিত্য চিন্তার বৈচিত্র্য ও ভাবের সমৃদ্ধির দিক হইতে ধীরে ধীরে বঞ্চিত হইয়া পড়িতেছে। আমি বলিব, এজন্য বাংলার মুসলমান লেখকগণই প্রাধানতঃ দায়ী।

মুসলমানদের রচিত বাঙ্গালা সাহিত্য আজকাল ইস্‌লামী বৈশিষ্ট্য হইতে এরূপ অধিক মাত্রায় বর্জ্জিত হইয়া পড়িতেছে কেন, তাহাও কি ভাবিবার বিষয় নয়? উত্তর-ভারতের উর্দ্দু সাহিত্য এবং প্রাচীন বাঙ্গালার মুস্‌লিম সাহিত্য সাধারণতঃ ইস্‌লামী আদর্শ অনুসারী। দুই এক ক্ষেত্রে ইহার যে ব্যতিক্রম নাই, তাহা নহে; তবে সে-ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম মাত্র সাধারণ নিয়ম নহে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, এই সাহিত্যের স্রষ্টাগণ ইসলামী সাহিত্য, সংস্কৃতি, আদর্শ ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। ইস্‌লামধর্ম্ম সম্বন্ধেও ইহাদের অধিকার বিশেষ শ্রদ্ধা পাইবার যোগ্য। আমার বিশ্বাস,

ইস্‌লামের সহিত প্রাচীন বাঙ্গালার মুস্‌লিম লেখকদের প্রাণের গভীর যোগ ছিল বলিয়া এবং উত্তর-ভারতীয় মুসলমানদের সেই যোগ আজ পর্য্যন্ত নিবিড় বলিয়া, আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ও উর্দু সাহিত্য সাহিত্যিক সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াও ইস্‌লামী ভাব ও আদর্শে এতখানি অনুপ্রাণিত। আধুনিক বাঙ্গালার অধিকাংশ মুসলমান লেখকের সহিত ইস্‌লাম ও ইস্‌লামী সাহিত্য, সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহারের নিবিড় যোগ আছে কিনা তাহা বলা কঠিন, অন্ততঃ তাঁহাদের লেখায় তাহার প্রমাণ নাই। বোধ হয়, আধুনিক বাঙ্গালী মুস্‌লিম লেখকগণ শিক্ষা-দীক্ষা ও মনে-প্রাণে ইস্‌লামী ভাবাপন্ন নহেন বলিয়াই আজ বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহাদের এই জাতীয় অবদান হইতে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছে। অথচ বাঙ্গালা সাহিত্যকে এই দীনতা হইতে রক্ষা করিতে হইলে, বাঙ্গালার মুসলমান লেখকদের সহিত ইস্‌লামের সম্বন্ধকে সুনিবিড় করিয়া তুলিতে হইবে; নতুবা এদেশে ইস্‌লামী সাহিত্য-সৃষ্টির অন্য উপায় নাই। তবে সম্প্রতি অমানিশার পর প্রভাত-আলোর বর্ণচ্ছটার ন্যায় বঙ্গীয় মুসলিম গগনে একটি শুভলক্ষণ দেখা দিয়াছে, ইহাই আশ্বাসের বিষয়। বাঙ্গালার মুসলমানদের মধ্যে এখন বহুপূর্ব্বের সংস্কার-আন্দোলন নূতনভাবে দেখা দিয়াছে। ফলে তাহাদের মধ্যে এখন আবার 'কোরান-হাদিসের প্রতি ফিরিয়া চল'—এই বাণী প্রায়ই শুনা যাইতেছে। ইহাতে বাঙ্গালার মুসলমানদের সহিত ইস্‌লামের যোগ নিবিড় হইবে বলিয়া মনে হয়। এই যোগ যতই ঘনিষ্ঠ হইবে, ততই বাঙ্গালা সাহিত্য ইস্‌লামী ভাবাপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই প্রসঙ্গে হিন্দুদের প্রতি বঙ্গীয় মুসলমানদের একটি অভিযোগের কথাও মনে পড়ে। সম্প্রতি বাঙ্গালার মুসলমান সন্দেহ করিতেছেন, এদেশের হিন্দুগণ মুসলিম সংস্কৃতির সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে হিন্দু আদর্শ ও ভাবে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন এবং স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা শিক্ষার ভিতর দিয়া সেই আদর্শ ও ভাবকে মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করিয়া মুসলমানদের সংস্কৃতিগত ভিত্তির সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। আমি এ-সন্দেহকে সম্পূর্ণ হউক বা না হউক, আংশিক অমূলক বলিয়া মনে করি। কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য যে হিন্দু আদর্শ ও ভাবে পূর্ণ, সে-কথা আমি মোটেই অস্বীকার করি না। হিন্দু 'হরিনাম' না করিয়া 'কালিমা' উচ্চারণ করিবেন, এমন চিন্তা করা শুধু অশোভন নহে, বরং একান্তই অস্বাভাবিক। আমরা যখন এরূপ অভিযোগ উত্থাপন করি, তখন ভুলিয়া যাই যে, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য যে-সকল প্রতিভাবান হিন্দুর দ্বারা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিগত ছাপ তাঁহাদের রচিত সাহিত্যে থাকিবেই। কেননা তাঁহারা স্বীয় ধর্ম্মীয় ও সংস্কৃতির গণ্ডী ছাড়াইয়া সাহিত্য রচনা করেন নাই—পৃথিবীর কোন সাহিত্যিক আজ পর্য্যন্ত তাহা করিতে পারেন নাই—আমার বিশ্বাস, হিন্দুরা জোর করিয়া তাঁহাদের আদর্শ ও ভাবকে আমাদের স্কন্ধে যতটা চাপাইতেছেন না, আমরা তাঁহাদের প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের সৃষ্টির দ্বারা অজ্ঞাতসারে ততোধিক আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের আদর্শ ও ভাবকে বরণ করিয়া লইতেছি।

আমাদের লেখকদের মধ্যে ধর্ম্মীয় ও সংস্কৃতিগত আদর্শ একান্তই দুর্ব্বল। প্রধানতঃ এই কারণেই আমাদের লেখকেরা অপর সংস্কৃতির জোরাল প্রকাশের হাত হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে অক্ষম হইতেছেন। সবল জাতীয় ও ধর্ম্মীয় আদর্শ বুকে লইয়া প্রতিভার দ্যোতিতে ভাস্বর সাহিত্য সৃষ্টি করিতে না পারিলে, মুসলমানদের এই অভিযোগ অরণ্য-রোদনে পর্য্যবসিত হইবে। এজন্যও আমাদিগকে আবার কোরান-হাদিসের দিকে ফিরিয়া চলিতে হইবে। আমাদের ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, প্রতিভাবান হিন্দু-সাহিত্যিক-গণই আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন। প্রধানতঃ তাঁহাদের প্রতিভায় আজ বাঙ্গালা সাহিত্য ভারতীয় ভাষার যে কোন সাহিত্য হইতে শ্রেষ্ঠ, এবং

বিশ্বের দরবারেও উহা স্থানলাভ করিয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্য হিন্দু আদর্শ ও ভাবে পূর্ণ হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? আমি ইস্‌লামী আদর্শ ও ভাবপূর্ণ সাহিত্য স্বষ্টিতে যেমন আতঙ্কিত নহি, হিন্দু আদর্শ ও ভাববহুল সাহিত্য-স্বষ্টিতেও তেমন শঙ্কিত নহি। আমরা চিন্তা, ভাব ও আদর্শে মুসলমান হইতে পারিলে, হিন্দু সাহিত্য দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইবার কোন কারণ আমাদের নাই। হিন্দুগণ আমাদের ফরমায়েশ মত সাহিত্যস্বষ্টি করিয়া আমাদিগকে নিয়মিতভাবে পরিবেশন করিয়া যাইবেন, এইরূপ আশা করা প্রকৃতির বিপরীত ও বাতুলতা মাত্র। বাঙ্গালার মুসলমান যতদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালার অবয়বে ইস্‌লামী মস্তিষ্কপূর্ণ হইয়া সাহিত্যস্বষ্টি না করিবেন, এবং যে-পর্য্যন্ত তাঁহার সেই স্বষ্টি স্বজনমহিমায় মণ্ডিত হইয়া না উঠিবে, ততদিন সাহিত্য-স্বষ্টির ক্ষেত্রে হিন্দুর বিরুদ্ধে অনৈসলামিকতার অভিযোগ আনিয়া কোন প্রতিকারের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তবে অভিযোগ যখন একবার উত্থাপিত হইয়াছে, তখন মনে করা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালী মুসলমান এখন স্বীয় জাতীয় আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে সজাগ হইয়া উঠিতেছেন। মুসলমানদের এই আত্মপ্রবুদ্ধ চৈতন্যকে অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে ভাবী মঙ্গলের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া মনে করি। ইহাতে বাঙ্গালা সাহিত্য নূতন সম্পদে সম্পদশালী হইবে এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই আমি আশা করি।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি একজন এইরূপ আশাবাদী। সেই কারণেই বাঙ্গালার সকল সম্প্রদায়ের জাগরণে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমার মনে নিরাশার চেয়ে আশার আলোকই অধিক প্রতিফলিত হয়। এতৎসত্ত্বেও মুসলমানদের সম্বন্ধে আমার উদ্বেগ কম নহে। বড়ই আফসোসের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে এমন লোক আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে ইস্‌লামী আওতায় থাকিয়া ইস্‌লামী আদর্শ লইয়া সাহিত্যস্বষ্টি করা চলে না বা সাহিত্যের স্বষ্টি হয় না। ইঁহাদের মতে ইস্‌লামে উদারতা ও সহিষ্ণুতার গণ্ডী ক্ষুদ্র, বিশেষতঃ ইস্‌লামী আবহাওয়া সাহিত্যস্বষ্টির পক্ষে অনুকূল নহে। এইরূপ ধারণা ইস্‌লাম সম্বন্ধে ধারণাপোষণকারীর অজ্ঞতার পরিচায়ক। নতুবা ইহার মূলে কোন সত্য দেখিতে পাই না। ইস্‌লামী শিক্ষা-দীক্ষায় মণ্ডিত হইয়া ইস্‌লামী আওতায় বাস করিয়া মুতনব্বী, হারীরী, আবু-আলাঅল মায়ার্রী, ইবন খল্‌দূন, তবরী, সয়ুতী, আবুল ফারেজ, অল্‌-ইদ্রিসী, আবু-রোশদ, ইমাম গজ্জালী, অল্‌-খারিজিমী, অল্‌-বিন্দী, অল্‌-বিরূণী, ফিরদৌসী, রুমী, নেজামী, জামী ও সাদী প্রভৃতির ন্যায় কবি, লেখক, দার্শনিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, তাত্ত্বিক প্রভৃতি ব্যক্তি যদি ইস্‌লামী সাহিত্য স্বষ্টি করিয়া বিশ্বকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়া দিতে পারেন, তবে আমাদের বাঙ্গালী মুসলমান লেখকগণ কেন ইস্‌লামী আওতায় ভীত, তাহার কারণ খুঁজিয়া বাহির করা অতি সহজ। এখনও খ্রীষ্টানী বা হিন্দু আওতায় থাকিয়া খ্রীষ্টানী বা হিন্দু আদর্শ লইয়া যদি বিশ্বের সেরা সাহিত্য স্বষ্ট হইতে পারে, তবে ইস্‌লামী আওতা ও আদর্শ কি দোষ করিয়াছে, বুঝা যায় না। এখনও কি ইক্‌বাল ইসলামী আদর্শ-উদ্বুদ্ধ হইয়া ইস্‌লামী সাহিত্য স্বষ্টি করিয়া যান নাই? ফলকথা, ইস্‌লামী সাহিত্য স্বষ্টি করিতে ইস্‌লামী আদর্শে অনুপ্রাণিত ও ইস্‌লামী মস্তিষ্কযুক্ত প্রতিভাবান পুরুষের আবশ্যক। তাহা না হইলে ইস্‌লামী সাহিত্য স্বষ্ট হইতে পারে না।

ইতিমধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে ইস্‌লামী সাহিত্য স্বষ্টির কোন প্রচেষ্টা চলে নাই, তেমন নহে। এ প্রচেষ্টা কতখানি সবল বা দুর্ব্বল, সে সমালোচনা করার সময় এখনও আসে নাই। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে এ-প্রচেষ্টায় যাঁহারা অগ্রণী, তাঁহাদের মধ্যে মরহুম ইসমাইল হোসেন শিরাজী, মীর মোশাররফ হোসেন, শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক, খ্যাতনামা কবি কায়কোবাদ, মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খান, ইয়াকুব আলী চৌধুরী, প্রিন্সিপাল ইব্‌রাহীম খান, মিষ্টার ওয়াজেদ আলী,

কাজী নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লা, এনামুল হক, খানবাহাদুর আহসানুল্লা, ফজলুর রহিম চৌধুরী, মোহাম্মদ কে. চাঁদ, মহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রভৃতির নাম করা যায়। ইঁহাদের প্রত্যেকের সমস্ত রচনাই যে ইস্‌লামী ভাবপুষ্ট, আমি বলিতেছি না। তবে অনেক রচনায় সুস্পষ্ট ইস্‌লামী ছাপ ও বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। প্রসঙ্গক্রমে ইঁহাদের সৃষ্ট ইস্‌লামী সাহিত্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা উল্লেখ করা যায়। শিরাজীর 'অনলপ্রবাহ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'রায়নন্দিনী' পর্য্যন্ত সমস্ত কাব্য, রচনা ও বক্তৃতা মূলতঃ ইস্‌লামী প্রেরণায় উদ্দীপ্ত। আধুনিক মুসলমান সমাজে তাঁহার প্রভাব অপরিসীম। মীর মোশাররফ হোসেন 'বিষাদসিন্ধু'র মধ্য দিয়া বাঙ্গালার পান্‌সীযোগে মুস্‌লিম পরিবার-বন্দরে আজও অফুরন্ত রসের বেসাতী বিলাইতেছেন। ইস্‌লামী বিষয় লইয়া ইস্‌লামী আওতায় থাকিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারা যায় কিনা, 'নূরনবী' ও 'শান্তিধারা'র মধ্য দিয়া এয়াকুব আলী চৌধুরী তাহার নজীর দেখাইয়াছেন। ফারসী পোষাকে ফারসী ভাব বুকে লইয়া বাঙ্গালার মুস্‌লিম সাহিত্য কেমন সম্ভ্রান্ত ও হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে, অসংখ্য বাঙ্গালা গজল ও বহু ইস্‌লামী কবিতায় নজরুল ইসলাম তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। বাঙ্গালার বুক ইস্‌লামের প্রাচীন সম্পদে কতখানি সম্পদশালী, বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অজ্ঞাত তথ্যের দ্বার গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণায় উদ্‌ঘাটন করিয়া ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক আমাদিগকে 'বঙ্গে সুফী-প্রভাব,' 'বঙ্গে ইস্‌লাম-বিস্তার' ও 'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' উপহার দিয়াছেন।

ইস্‌লামী সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট করেন, তাঁহাদের পক্ষে আরবী ও ফারসী ভাষার ইসলামী ভাবদ্যোতক বহু শব্দের ও নামের প্রয়োগ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালা অক্ষরে এইরূপ ইস্‌লামী শব্দ ও নাম লিখিতে গেলে কি পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত, তৎসম্বন্ধে একটি সার্ব্বজনীন-ভাবে পালনীয় নির্দ্দেশ থাকা আবশ্যক। আজ পর্য্যন্ত মুসলমান লেখকগণ কোন সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মে এই সমস্ত শব্দ ও নাম লিখিতেছেন না। অথচ ইস্‌লামী সাহিত্যে ইহার আবশ্যকতা অত্যন্ত বেশী। যতদূর মনে পড়ে, প্রায় এক যুগ পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এই বিষয়ে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। আমার বিশ্বাস, বর্ত্তমানে একমাত্র মুসলমানদের দ্বারাই একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্ত্তন সম্ভবপর হইতে পারে। তজ্জন্য এই বিষয়ে মুসলমান বিশেষজ্ঞদিগকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে চরম বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। আজ বাঙ্গালা সাহিত্যে ইস্‌লামী শব্দের যেরূপ অপলিখন-প্রণালী অবলম্বিত হইতেছে, তাহা দেখিলে আমার ন্যায় আনাড়ীর মনেও ভারী দুঃখ হয়। এই অবস্থার আশু পরিবর্ত্তন আবশ্যক। নতুবা মুসলমানদের বাঙ্গালা সাহিত্যে ভাষা-ঘটিত দুর্দ্দশা যে ধীরে ধীরে শুধু চরম সীমায় পৌঁছিবে তেমন নহে, বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রচলিত ইস্‌লামী শব্দাবলীর অভিধান রচনার কাজও চলিবে না। (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনে মূল সভাপতির অভিভাষণ।)

নিখিল আসাম বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্মেলনের (১৩৫১) মূল সভাপতি ছিলেন এস. ওয়াজেদ আলি। তাঁর দীর্ঘ ভাষণ 'সাহিত্যের লক্ষ্য' শিরোনামে সওগাতে প্রকাশিত হয় (২৭:৬, বৈশাখ ১৩৫২)। ভাষণের উল্লেখযোগ্য অংশসমূহ নিম্নে উদ্ধৃত হল :

"...সাহিত্যের লক্ষ্য কি ? সাহিত্যিকেরই বা আদর্শ কি ? প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা রসের সৃষ্টিকেই সাহিত্যের লক্ষ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করেছেন। সাহিত্যিকের কাজ সে হিসাবে হল রসের সৃষ্টি ও তার পরিবেশন। তবে রস বিভিন্ন রকমের হয়, আর বিভিন্ন রসের পরিবেশনে বিভিন্ন ফল সমাজে দেখা দেয়। যে রসের ফল অনিষ্টকর হওয়ার সম্ভাবনা

আছে, সে রসের পরিবেশন আমরা সমর্থন করতে পারি না ; পক্ষান্তরে, যে রস থেকে আসে বিমল আনন্দ, উচ্চ আদর্শের প্রেরণা, কল্যাণ প্রসু চিন্তাধারা, সেই রসের পরিবেশনই হল সাহিত্যিকের প্রকৃত কাজ। এ-কাজ সার্থকভাবে করতে হলে উপকরণের দিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার। যুগে যুগে সাহিত্যিকের ব্যবহার্য উপকরণ অবশ্য রূপান্তরিত হয়ে থাকে।

প্রাচীনকালে সমাজ বলতে বোঝা যেতো রাজা, মহারাজা, বাদশা, নবাব প্রভৃতি উচ্চস্তরের শাসক শ্রেণী। তখন এঁদের নিয়েই সাহিত্য রচিত হত, আর সেই সাহিত্যই আপামর সকলকে শিক্ষা এবং আনন্দ দান করতো। তারপর ফরাসী-বিপ্লবের পর থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হল। সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন এবং জীবনাদর্শ নিয়েই সাহিত্য রচিত হল। মানুষ সেই সাহিত্য থেকেই আনন্দ এবং শিক্ষা আহরণ করতে লাগলো। বিগত অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সাহিত্য সাধারণতঃ এই শ্রেণীরই সাহিত্য। ইউরোপের প্রভাব ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশেও এসে দেখা দিল। গত শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে সাহিত্য রচিত হয়েছিল, তা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন এবং জীবনাদর্শ নিয়েই রচিত হয়েছিল। দরিদ্র জনসাধারণ এবং নিম্ন শ্রেণীর কৃষক মজুর প্রভৃতির স্থান সে সাহিত্যে ছিল না বললেই চলে। এই শ্রেণীর লোকেরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনকাহিনী মূলক সাহিত্যই পড়তো আর তা থেকেই তারা জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করতো।···

এখন পৃথিবী আকারে অনেক ছোট হয়ে গেছে আর গভীরতায় অনেক বেড়ে গেছে।··· দুই তিন শত বৎসর পূর্বে রাজ্য ছিল রাজার সম্পত্তি। উত্তরাধীকারী সূত্রে রাজ্যের ভাগ-বণ্টন হতো। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস বিবাহের যৌতুক স্বরূপে হলাণ্ডরাজের কাছ থেকে বোম্বাই বন্দর লাভ করেছিলেন। বৈবাহিক-সম্বন্ধের ফলে বিশাল স্প্যানিশ সাম্রাজ্য জন্মলাভ করেছিল। তারপর যে যুগ এল, তাতে পুঁজিবাদীদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই রাজ্যের বিলি-ব্যবস্থা হতে লাগলো। সে যুগের এখনও অবসান হয়নি। তবে ইতিমধ্যে এক নূতন শক্তি এসে দেখা দিয়েছে যার নাম : গণশক্তি। স্বেচ্ছায় হোক, আর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হোক, এই গণশক্তির স্বার্থ এখন আর অবহেলা করা চলছে না। এশিয়া এবং ইউরোপ সর্ব্বত্রই এই উদীয়মান গণশক্তির জয়জয়কার চলেছে। যুদ্ধোত্তর জগতে গণশক্তির প্রতিষ্ঠা যে আরও ব্যাপকতর এবং দৃঢ়তর হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সভ্যতার এবং কৃষ্টির দিক থেকেও মানুষ ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছে। আমাদেরই বাল্যকালে দেখেছি ইংরাজ এক রকম পোষাক পরতো, হিন্দু এক রকম পোষাক পরতো, আর মুসলমান এক রকম পোষাক পরতো। ইংরাজ একভাবে জীবনকে দেখতো, হিন্দু এক-ভাবে জীবনকে দেখতো, আবার মুসলমান একভাবে জীবনকে দেখতো। ভাষা, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, সংস্কার সবই ভিন্ন ছিল। ভিন্ন ভিন্ন গণ্ডীর মধ্যে তারা বাস করতেন, স্বকীয় সীমানাকে অতিক্রম করবার কথা তাঁদের ভাব্য-ভাবনার বাইরে ছিল। এখন সব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহারে এখন আর তেমন উৎকট পার্থক্য দেখা যায় না। পোষাক-পরিচ্ছদের পার্থক্য ক্রমশই অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে— ভাষা এক হয়ে যাচ্ছে, ভাব এবং আদর্শও এক হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য রাজনীতিতে যথেষ্ট দলাদলি এখনও দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে সব কৃত্রিম এবং সাময়িক ব্যাপার। প্রকৃত পক্ষে এখন আচারগত বৈষম্য ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। মানুষের স্বার্থচেতনার এই ভারকেন্দ্র পরিবর্তন যুগধর্মের ইঙ্গিতেই অবশ্যম্ভাবী।

আরও একটা লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, দৃষ্টিকেন্দ্রের পরিবর্তন। পূর্বে ধর্ম্মকে কেন্দ্র করেই মানুষ জীবন নিয়ন্ত্রিত করতো। তখন ইহলোকের চেয়ে পরলোকের গুরুত্ব বেশী

ছিল। এখন দৃষ্টিকেন্দ্র ধর্ম থেকে রাজনীতিতে এসে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ মানুষ এখন ধর্মের বিধি নিষেধের চেয়ে বাস্তব জীবনের তাগিদকেই বেশী গুরুত্ব দেন। রাজনীতি-কেরা কার্যসিদ্ধির জন্য অবশ্য ধর্মের পতাকা-উত্তোলন এবং ধর্মের নাম ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু সে সব স্থূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য করা হয়, তা তাঁরাও বোঝেন আর যাদের বোঝানোর জন্য করা হয় তাঁরা সেদিকে ক্রমশঃ সচেতন হয়ে উঠছে।

সাহিত্যিকের কাজ হচ্ছে বেষ্টনীর দিকে লক্ষ্য রেখে সাহিত্য-স্বষ্টি করা, আর মানুষের মনের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে সে-সাহিত্যকে রূপায়িত করা, অন্তরদৃষ্টির সাহায্যে ভবিষ্যৎ জগতের সুস্পষ্ট ছবি দেখা, আর তুলিকার সাহায্যে সেই ছবিকে মনোহর রূপ দান করা। এই পথে চললেই সাহিত্যিকের সাধনা প্রকৃত সার্থকতা লাভ করবে। তবেই সমাজকে তিনি মঙ্গলময় ক্রমবিকাশের পথে পরিচালিত করতে পারবেন। আজ-কালকার এই দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে গতানুগতিকতার পথ হচ্ছে ব্যর্থতার পথ, মৃত্যুর পথ। যে সাহিত্যিক ব্যর্থতা এড়াতে চান, মরণজয়ী সাধনা করতে চান, তাকে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে নব স্বষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

...সাহিত্য হলো বড় রকমের একটা সাধনা। এ সাধনা সার্থক করতে হলে সাহিত্যিককে দলাদলির উর্ধ্বে উঠতে হবে ; সত্য, শ্রেয়ঃ, সুন্দরের অনাবৃত রূপ দেখতে হবে ; অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের যথাযোগ্য দাবীর সুবিচারের ক্ষমতা অর্জন করতে হবে ; সমগ্র জাতি আর মানবতার কল্যাণের পথ নির্মল অন্তরের নির্দেশে খুঁজে বের করতে হবে ; আর সার্থক তুলিকার সাহায্যে সে পথকে বিচিত্র রংএ সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে হবে।

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা নিয়ে চিন্তা করলে আমাদের দৈন্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে। জাতি-গঠনের জন্য ইতিহাস অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। পরিতাপের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়, এখনও পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশের এমন একটী ইতিহাস বাংলায় লিখিত হয়নি যা থেকে প্রকৃত জাতি-গঠনে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। সংস্কারমুক্ত অখণ্ড দৃষ্টি নিয়ে এদিকে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। জাতির কল্যাণকামনা থাকবে অন্তরে।

সর্বজাতি ও বর্ণনির্বিশেষে যখন সকলকেই এদেশে বাস করতে হবে, তখন যেপথে মিলন আর সৌহার্দ্য সম্ভব, সেই শ্রেয়ের পথেই ঐতিহাসিকদের চলা কর্তব্য। নিরপেক্ষ আর অবিকৃত মনেই ইহা সম্ভব। অতীতে এদেশের রাষ্ট্র মঞ্চে যাঁরা বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করে এ জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে ভাল-মন্দ, সাধু-সয়তান উভয়ই ছিল। বিশেষ ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের মানুষ বলেই তিনি সুজন বা কুজন ছিলেন, এমনটি কখন হতে পারে না। আসলে মানুষ হিসাবে মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতেই তাঁকে বিচার করতে হবে। আজকালকার অবাঞ্ছনীয় সাম্প্রদায়িক-প্রবণতা এ জাতির ললাট মসীলিপ্তই করবে।...

সমাজ-জীবনের ইতিহাস এবং আলোচনার কথা একবার ভাবুন। বাঙ্গলায় এ বিষয়ে যতগুলি পুস্তক রচিত হয়েছে, সে সব পড়ে এ কথা মোটেই বোঝা যায় না যে, এদেশে মুসলমান সম্প্রদায় নামক সমাজের বিশিষ্ট এবং অপরিহার্য একটা অঙ্গ আছে। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার একবার বলেছিলেন, এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বাঙ্গলার মুসলমানদের সামাজিক-জীবনের চেয়ে রাশিয়ার কৃষকদের সামাজিক-জীবনের বিষয় বেশী খবর রাখেন। বিনয়বাবুর কথার প্রতিবাদ করা যায় না। স্পষ্টই বোঝা যায়, আমাদের সমাজতত্ত্ববিদেরা তাঁদের কর্তব্য যথোচিতভাবে সম্পাদন করতে পারেন নি।

কার্লমার্কস জাতিতে ইহুদী ছিলেন, কিন্তু তাঁর ক্যাপিটেল গ্রন্থে সর্বধর্মীয় শ্রমিকদের তথা পুঁজিবাদীদের জীবনের কি গভীর আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, আমাদের সাহিত্যরচয়িতারা আজও কার্লমার্কস তথা অন্যান্য ইউরোপীয় লেখকদের সংস্কার-মুক্ত মানসিকতায় পৌঁছতে পারেন নি। এ দেশেও এক অখণ্ড জাতির প্রতিষ্ঠার জন্য এইরূপ উদার ভাব্য-ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গী অপরিহার্য, সে কথা কি অস্বীকার করা যায়?•••

প্রাচীন কালে ধর্ম প্রচারকেরা মানুষকে উন্নতির পথে, মঙ্গলের পথে পরিচালিত করতেন। যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ দায়িত্ব সাহিত্যিকদের স্কন্ধে এসে পড়েছে। পূর্বে যে প্রেরণা মানুষ ধর্ম প্রচারকদের কাছ থেকে পেতো, এখন সে প্রেরণা সে সাহিত্যিকদের কাছ থেকে পায়। সাহিত্যের গুরুত্ব যেমন বেড়েছে, সাহিত্যিকের দায়িত্বও তেমনি বেড়েছে। ধর্ম প্রচারকেরা বিশেষ কোন ধর্মকে অবলম্বন করেই প্রচার কার্য চালাতেন; সাহিত্যিকদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা বিশেষ কোন ধর্মকে অবলম্বন করে প্রচারকার্য চালান না। তাঁরা প্রচার চালান সার্বজনীন রসধর্মকে আশ্রয় করে। সাহিত্যিক রূপকার, তারা ভাবুক। মানুষের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মানুষের অন্তরের অন্তর্গূঢ় প্রেরণাকে রূপদান করাই তাদের কাজ। সুতরাং মানবতার ধর্মই সাহিত্যিকের স্বাভাবিক ধর্ম। এই মানবিক ধর্ম ও আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক শ্রম ও নিষ্ঠা রেখে সাধনা করলে, সাহিত্যিকেরা অবধারিত উদীয়মান জাতির এক মঙ্গলময় জীবনবেদ রচনা করতে পারবেন, এ আমার নিসংশয় প্রত্যয়।

•••সব ধর্মই আমাদের সম্মানের অধিকারী। এই ছিল আকবরের কামনার বস্তু, এই ছিল তাঁর ধর্ম-দর্শন। বিশ্বব্যাপী এই ভাঙন-গড়নের যুগে আকবরের উদার সুমহান আদর্শ অবলম্বন করে সর্বজাতির, সর্বধর্মের, সর্বশ্রেণীর সেবায় আমাদের এখন আত্মনিয়োগ করতে হবে। তবেই আমাদের সাধনা সর্বমানবের কল্যাণপ্রসূ হবে। আমরা সুখ, শান্তি ও আলোর সন্ধান পাব।

যে পথের কথা আমি বল্লুম, সে পথে চলতে হলে আমাদের আচারের বিষয় উদার-পন্থী হতে হবে। মানুষের যখন বার্দ্ধক্য আসে সে তখন যেমন ঔষধপত্রের দাস হয়ে পড়ে, ধর্মও তেমনি যৌবনের সহজ প্রেরণা হারাবার সঙ্গে সঙ্গে আচার-অনুষ্ঠানে দাস হয়ে পড়তে থাকে। আমাদের দেশে, কেবল আমাদের দেশে কেন, পৃথিবীর সর্বত্রই বহুবার এরূপ ঘটেছে। সমষ্টি জীবনকে আবার স্বাস্থ্যের সহজ সরল পথে তুলতে হলে, যুগে যুগে নূতনতর জীবনাদর্শের দরকার। মানুষের, নর-নারায়ণের সেবাই সে আদর্শের সন্ধান আমাদের দেবে। এ পথে চলতে চলতে আমরা বুঝতে পারবো, মানুষে মানুষের প্রভেদ কত তুচ্ছ আর কৃত্রিম। মানুষে মানুষে যে ঐক্য, সে কত নিবিড়, কত গভীর। আমরা সহজেই তখন বুঝতে পারবো যে, মানুষকে ঘৃণা করে যেমন খোদাকে ভালবাসা যায় না; আর খোদাকে ভালবেসে তেমনি মানুষকেও ঘৃণা করা চলেনা। জাতীয় জীবনে যখন এরূপ বৃহৎ প্রেরণা আসে, তখন তুচ্ছ ভেদাভেদ, ঘৃণা-বিদ্বেষ বাতাসে মিলিয়ে যায়। এ মহান প্রেরণা নামিয়ে আনা আজকার সাহিত্যিকের সাধ্য।

বর্তমানে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া জীবন আমাদের চলেছে। কোথায় গিয়ে যে আমরা দাঁড়াব এখনও তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেনি। এ সঙ্কট সময়ে আমাদের অতি সন্তর্পণে পথ চলতে হবে। তুচ্ছ ভুল বিষম অনর্থের স্পষ্টি করতে পারে। সামান্য একটা স্ফুলিঙ্গ থেকে বিষম অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে। আমাদের এই বিশ্বাস অন্তরে অটল রাখতে হবে যে, মঙ্গলময় যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে আর মঙ্গলময়ের নির্দেশের প্রতি নির্মল চিত্তে চেয়ে জীবনপথে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

তবে একথাও আমি বলবো যে, এই যুগসন্ধিক্ষণই সাহিত্যিকের পক্ষে এক স্বুবর্ণ স্বুযোগ। আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন, ঝড়ের প্রলয়ঙ্কর সঙ্গীত শোনা না গেলে, বিদ্যুৎ ঝিলিক আকাশের বুকে ফোটে না। বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন জীবনে ও সমাজে দেখা না দিলে সাহিত্যিক প্রতিভার সম্যক স্ফুরণ হবারই বা স্বুযোগ কোথা ? সমবেত সাহিত্যিক-বৃন্দকে আমি তাই বলি, আপনারা জীবনের দ্রুত ঘূর্ণায়মান চক্রের সঙ্গীত কান দিয়ে শুনুন, আর তারই তালে তালে পা ফেলে অনাগত ভবিষ্যতের প্রতি নিষ্পলক দৃষ্টি রেখে পথ চলুন। আজ নব জন্মের গর্ভবেদনায় সমগ্র বিশ্ব ব্যথিত চঞ্চল। ভাবী পৃথিবীকে সত্যশুভসুন্দর করে গড়ে তুলবার দায়িত্ব আমাদের সাহিত্যিকদেরই। তাই আস্থন, আমরা সমবেতভাবে মর্মে মর্ম মিলিয়ে প্রার্থনা করি, 'যত্তেরূপং কল্যাণতমম্ তত্তে পশ্যামি'। হে দুনিয়ার মালিক, তোমার কল্যাণরূপ যেন আমরা দেখি, আর তাই জীবনে প্রচার করি।''

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা সমালোচনা

'সমালোচনা' ও 'পুস্তক পরিচয়' শিরোনামে 'সওগাতে' গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা সমালোচনা প্রকাশ শুরু হয় প্রকৃতপক্ষে প্রথম বর্ষ অষ্টম সংখ্যা থেকে। ইতিপূর্বে সওগাতেরই ১:৩, মাঘ ১৩২৫ সংখ্যায় প্রকাশিত এ. হাদীর 'হারানিধি' শীর্ষক কবিতার 'সমালোচনা' লেখেন গোলাম মোস্তফা ১:৫, চৈত্র ১৩২৫ সংখ্যায়। তবে ১:৮, আষাঢ় ১৩২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন লিখিত 'মহাশ্মান কাব্য' শীর্ষক প্রবন্ধ 'সমালোচনা' শিরোনামে প্রকাশিত হলেও তা ছিল মূলতঃ সৈয়দ এমদাদ আলীর মহাশ্মশান বিষয়ক আলোচনার প্রতিবাদ। আবুল কালাম শামসুদ্দীনের ঐ প্রবন্ধ তাই আমি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি। ১:৯, শ্রাবণ ১৩২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় বিনয়কৃষ্ণ সেনের 'উইলিয়ম টেল', শেখ হবিবর রহমানের 'নিয়ামত' গল্প-গ্রন্থ এবং কামিনী কুমার দে-র 'অশ্রু ধারা' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা। সমালোচকের নাম নেই। এরপর গ্রন্থ সমালোচনা সওগাতের একটি প্রায় নিয়মিত বিভাগে পরিণত হয়। গ্রন্থ সমালোচনায় কখনো কখনো সমালোচকের নাম আছে, কখনো নেই। সওগাতে প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা সমালোচনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিবন্ধগুলোর তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল :

তালিকার অন্তর্গত নিবন্ধ সমূহ ১. গ্রন্থ ও ২. পত্র-পত্রিকা এই দুই ভাগে আলোচনা করা যেতে পারে। উল্লেখযোগ্য যে দু একটি ব্যতিক্রম ব্যতীত সওগাতের অধিকাংশ সমালোচনাই খুব সংক্ষিপ্ত।

১. গ্রন্থ সমালোচনা

১:৯ শ্রাবণ ১৩২৬ সংখ্যায় সমালোচকের নাম নেই। সমালোচিত তিনটি বইএর মধ্যে শেখ হবিবর রহমানের গল্পগ্রন্থ 'নিয়ামত' সম্পর্কে মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। সমালোচক লিখেছেন :-

''মুসলমান লেখকগণের ছোট গল্প সমালোচনা করিবার সময় এখনও আমাদের আসে নাই। ছোট গল্প রচনায় যথেষ্ট 'আর্টের' প্রয়োজন ও লেখকের 'সাধনা সাপেক্ষ'। নিয়ামতের অধিকাংশ গল্পে যদিও আমরা তেমন 'প্লটের' অনুসন্ধান পাই নাই, তথাপি

সমাজের দিক দিয়া লেখক কতকগুলি খাঁটী কথা বলিয়াছেন। মোল্লা বাকাউল্লা গল্পে সাতকড়ি মিয়া বলিতেছে 'মৌলানা সাহেব যেরূপ বলিলেন তাহাতে বুঝিতেছি আর মাইনরস্কুল রাখা উচিৎ নয়। উহাতে ধর্ম্মের খুব ক্ষতি হয়।' উত্তর 'ইংরাজী বাঙলা না পড়িলে এদেশে এস্‌লাম রক্ষা করাই কঠিন হইবে। ভাষার কোন দোষ হইতে পারে না। বাঙলা ভাল না জানিলে এদেশে সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার অসম্ভব। আর ইংরাজী না জানিলে রাজাকে আমাদের ধর্ম্মের কথা বুঝাইয়া আইনের দ্বারা এস্‌লাম রক্ষা ও প্রচার করাও অসম্ভব। সুতরাং বাঙলা ইংরাজী ভালরূপে জানা বর্ত্তমানে এদেশে একান্ত প্রয়োজন।'

টাউন হলে মসজিদ ভাঙ্গার প্রতিবাদ সভা হইয়াছে। সেখানে মৌলানা বাকাউল্লা বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে সভার কার্য্য হইতেছে দেখিয়া বাহির হইয়া গেলেন কিন্তু যখন শুনিলেন সেই কাফেরী সভার আন্দোলন বিলাত পর্য্যন্ত গিয়া ভগ্ন মস্‌জিদ পুনর্নিম্মিত হইয়াছে, তখনও তিনি বলিতেছেন 'ঐ সব নাসারার দল যাহা করিয়াছে তাহা কেবল নামের জন্য।' শিষ্যবর্গকে উত্তেজিত করিয়া সেই মৌলানা সাহেব যখন আইনের আমলে আসিলেন, তখন তাঁহার ধর্ম্ম গেল, সত্য গেল, প্রাণের দায়ে তিনি মিথ্যা বলিতেও রাজী হইলেন। লেখক উকিলের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন 'আপনি মৌলানা পীর বলিয়া পরিচিত, আর আদালতে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া মিথ্যা বলিতে একটুও ইতস্ততঃ করিতেছেন না? মিথ্যা কথা বলিয়া কি আপনি ধর্ম্মরক্ষা করিবেন? চরিত্রবান্ না হইলে ধর্ম্ম কিছুতেই রক্ষা হইতে পারে না।•••আপনার সমস্তই দেখিতেছি ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামি।' সমাজ সংস্কারের দিকে লেখকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে। ইহা যথেষ্ট প্রশংসার বিষয়। 'মোল্লা বাকাউল্লা' ও 'চোকে আঙ্গুল' আমাদের ভাল লাগিয়াছে। লেখকের ভাষা মন্দ নহে কিন্তু অনর্থক অতিমাত্রায় আরবী, পার্শীর ব্যবহার করিয়া স্থানে স্থানে ভাষাকে আড়ষ্ট করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে আবার ঐ সমস্ত শব্দ বেশ শ্রুতিমধুর হইয়াছে। মাঝে মাঝে ব্যাকরণ প্রমাদও দৃষ্ট হইল। 'সে' এই সর্ব্বনামটী গল্পের নামে ব্যবহার করিয়া লেখক তাঁহার পাঠকগণকে একটা মজার ধাঁধাঁ লাগাইয়াছেন। মোট কথা আমাদের মধ্যে বর্ত্তমানে যেরূপ গল্প দেখিতে পাই তাহাপেক্ষা নিয়ামতে উচ্চশ্রেণীর গল্প আমাদের নজরে পড়িয়াছে।'

১:১০ ভাদ্র ১৩২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে দু'টি গ্রন্থের সমালোচনা। প্রথমটি সুরেন্দ্রনাথ রায়ের উপন্যাস 'মনাক্কা'; আলোচনা করেছেন মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী। দ্বিতীয়টি লুৎফর রহমানের 'পথহারা' উপন্যাস; আলোচনা করেছেন মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন।

মনাক্কা শৈলবালা ঘোষজায়ার 'সেক আন্দু'র অনুকরণে রচিত। এয়াকুব আলীর ভাষায় 'মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রীতিলাভের উদ্দেশ্যে লিখিত'। এয়াকুব আলী চৌধুরী বিশ্লেষণধর্মী সমালোচনা লিখেছেন। উপন্যাসের বিস্তৃত পরিচয় ও চরিত্র বিশ্লেষণ করে আলোচনার উপসংহারে তিনি লিখেছেন :

''গ্রন্থে পাত্র পাত্রীর নাম গুলিই বা কি মৌলিক!—মনাক্কা, আতর, সবজি!—একেবারে ষ্টার মিনার্ভা উজাড় করিয়া আমদানি!—সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র পরিবারের সন্তান কিনা এরা, তাই এমন ভাল ভাল নাম। শুনিলেই বড় ঘরের গন্ধ পাওয়া যায়। আর সেই জন্যই বোধ হয় মুসলমান জমিদার একেন প্রধান সাহেব খুসী হইয়া এই অপূর্ব্ব উপহার সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন।

মুসলমানদের রীতি-পদ্ধতির যথেষ্ট পরিচয় না থাকিলেও তাহাদের ঘরের কথা লইয়া নাড়াচাড়া করতঃ হাস্যাস্পদ হওয়া কতকগুলি লেখকের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। মনাক্কার

লেখক মুসলমানদের প্রীতিসাধন করিতে ইচ্ছুক থাকিলেও জ্ঞানের অভাব বশতঃ তাহাতে আদৌ কৃতকার্য্য হ'ন নাই। পক্ষান্তরে মনাক্কার তালাক ও নেকাহ্ বা দ্বিতীয় বিবাহ ব্যাপারগুলি তিনি এরূপভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন যে, তাহাতে মুসলমান-দের এই ধর্ম্মসঙ্গত সামাজিক বিষয়গুলির প্রতি অশ্রদ্ধা ও ঘৃণার সঞ্চার হয়। মিলনহীন দাম্পত্য জীবনে দুর্ব্বহ দুঃখ দূর করিবার উদ্দেশ্যে পরম কল্যাণ জনক তালাক ও নেকাহের ব্যবস্থা, কিন্তু তৎসম্বন্ধে মনাক্কার বাপ বলিতেছে 'আমার একটি মাত্র মেয়ে তাহাকে এই লজ্জা ও কলঙ্কের বোঝা হ'তে উদ্ধার করতেই হবে।...আবার একটা সাদি ফাদি করতে হবে।' ইহা পড়িয়া মুসলমানের প্রাণ খুসী হইয়া উঠিতে পারে না।

ফলতঃ এই উপন্যাসখানি শুধু সেখ আব্দুর অনুকরণ নহে। ইহা অক্ষম লেখকের মামুলি রচনা! বড় বড় লেখকের ধরনে পাত্র পাত্রীর মানসিক ভাবের খেলা দেখাইবার ও তাহাদিগের মুখে বড় বড় কথা বসাইয়া দিবার চেষ্টা গ্রন্থখানিতে আছে কিন্তু তাহা পড়িয়া কেবল অভিনয়ের কথাই মনে আসে। গ্রন্থের ভাষা ভাল, বেশ ঝরঝরে।''

ঐ একই সংখ্যায় লুৎফর রহমানের পথহারা উপন্যাসের সমালোচনা লিখেছেন মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন। উপন্যাসটির উৎসর্গ পত্রেই গ্রন্থকারের মহৎ উদ্দেশ্য উল্লেখিত। কিন্তু গ্রন্থে সেই মহান আদর্শ বা শিক্ষাদানের উপযুক্ত সুশৃঙ্খল পটভূমি তৈরী হয়নি। সমালোচক লিখেছেন :

''এই কলেবরের পুস্তকে যতগুলি ব্যক্তির সঙ্কুলান সম্ভব তাহার অন্যূন তিনগুণ চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে; ফলে কোন চরিত্রই সম্যক বিকাশলাভ করিতে পারে নাই, অপিচ ইহাতে এমন কোন পুরুষ বা স্ত্রী চরিত্র নাই যাহার পুষ্টিকল্পে এতগুলির একত্র সমাবেশ সার্থক মনে করা যায়। হাছান, আব্দুর রহমান, নিমু, লোহারাম, শ্যামাচরণ, রাধা, এবাদ, এরসাদ, রমেন্দ্র, মহিউদ্দিন, সরযু, কুলসুম, কেলী, কাদম্বিনী, ললিত, নীহার, ফিনি বেলা প্রভৃতি সংখ্যাতীত ব্যক্তির মধ্য হইতে কাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে হইবে লেখক তাহার কোন আভাস দেন নাই। পাঠক, নামের পর নাম, ঘটনার পর ঘটনা—তাহাও আবার সবগুলিই প্রায় একই ছাঁচের—পড়িতে পড়িতে এমন দিশাহারা হইয়া পড়েন যে পূর্ব্বে কোন্ নামের লোকটাকে কোথায় কি অবস্থায় ছাড়িয়া আসিয়া-ছেন তাহা মাথা খুঁড়িয়া স্থির করিতে হয়। ইহাতে আখ্যায়িকার যে প্রচুর সৌষ্ঠবহানি হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ত্রয়োবিংশ হইতে ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনাবলি সম্পূর্ণরূপে পরস্পরের সম্পর্কশূন্য। এই দীর্ঘ অপরিচিত পথে পাঠক সঙ্গীহীন অবস্থায় দৌড়িয়া দৌড়িয়া একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়েন। লেখক স্বয়ং ভাবপ্রবণতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন সত্য কিন্তু পাঠককে নিজের ন্যায় সহৃদয় করিয়া ভুলিতে পারেন নাই।

এই সমস্ত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও মুসলমান উপন্যাস সাহিত্যে পুস্তকখানি সম্পূর্ণ অভিনব সৃষ্টি। যে অন্ধ অত্যাচারে ভারতীয় সমাজ নীতিজ্ঞান হারাইয়া একেবারে অবনতির শেষ মার্গে উপনীত, লেখক তাহা দেখিয়া যে পঞ্জরাস্থিচূর্ণকারী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া-ছেন তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। মনে হয় যেন প্রত্যেক দীর্ঘশ্বাসে লেখকের হৃদয়-শোণিত ঝলকে ঝলকে শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অত্যাচার, অসহায়া বিধবার প্রতি মাতাপিতার এবং সামাজিক সঙ্কীর্ণতার অত্যাচার, দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, দরিদ্রের প্রতি ধনীর অত্যাচার, তথাকথিত শূদ্রদের উপর তথাকথিত ব্রাহ্মণত্বের অত্যাচার, প্রকৃত ধর্ম্মাচারের উপর জ্ঞানীর অত্যাচার—এই প্রকার আরও যে শত সহস্র অত্যাচারে সমাজদেহ জরজর ইহাতে তাহার একটি বিশ্বস্ত চিত্র পরিদৃষ্ট হইবে।

আমাদের স্ত্রী-কন্যাকে জড় পদার্থ বিশেষ করিয়া রাখিয়া আমরা যে মহাপাতক সঞ্চয় করিতেছি, লেখক বুক ঠুকিয়া তাহা বলিয়া ফেলিয়াছেন। যে মুসলমান জগতে সর্ব্বপ্রথম স্ত্রীলোক এবং ক্রীতদাসের মনুষ্যত্বের সম্মান মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করে, তাহাদের বংশধরও আজ স্বীয় স্ত্রী কন্যাকে সর্ব্বাপেক্ষা হীন হইতে হীনতর করিয়া আভিজাত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে তৎপর। হিন্দু মোছলমানের এই মূর্খতার বিরুদ্ধে লেখক যেন ultimatum দান করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। '...ঘরে যদি আগুন লাগে, বাড়ীর ভিতর পুড়ে মরা ভাল, তবু বাড়ী ছেড়ে বেরোনো ঠিক নয়, তাতে স্বামী সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে পারেন। ...কোথায় তোমার বাড়ী তাও তুমি জান না ; মেয়ে মানুষ যখন কেমন করেই বা জানবে। ...আমরা ত আর বামন, কায়েত, মোছলমানের মেয়ে নই যে পেটের দায়ে মরবো...পাপ করতে বাধ্য হবো...আমরা ধীবরের মেয়ে পেটের ভাবনা ভাবতে হবে না...ভদ্রলোকের বউঝি ঘরের কোণে ভাতের জ্বালায় কুকুরের মত কেঁদে মরুক'। ইহা সমাজ নেতৃগণের অত্যাচরের বিরুদ্ধে মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ এবং বিদ্রোহ সূচনা ব্যতীত আর কি কহিব ?

পুস্তকখানি সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা বিবর্জ্জিত ; ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক গণ্ডী ছাড়িয়া লেখক বহু ঊর্দ্ধ হইতে স্বীয় দৃষ্টি পরিচালনা করিয়াছেন। 'কর্ম্ম অপেক্ষা উচ্চতর উপাসনা নাই, শুধু মন্ত্র পাঠে যে আল্লাতা'লা সন্তুষ্ট হন না, এই সার্ব্বভৌমিক উপাসনা এবং পূজায় তিনি একান্ত পক্ষপাতী, জীবসেবাই সৃষ্টিকর্ত্তার শ্রেষ্ঠ সেবা,...যাবত একটা মানুষ এ জগতে অত্যাচার ভোগ করে তাবৎ মানুষ কেন উপাসনা করে, এই পূজাগুলিই বা কি ?' শান্তার এই উন্মাদবেদনাজড়িত উক্তি রবীন্দ্রনাথের—'মাতৃহারা মা যদি না পায়, বৃথা সহকার শাখা, বৃথা তবে মঙ্গল কলস' ইহারই মত মর্ম্মান্তিক এবং গভীর। পুস্তকখানি সময়োপযোগী হইয়াছে এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।''

২:১, অগ্রহায়ণ ১৩২৬ সংখ্যায় সৈয়দ এমদাদ আলী আলোচনা করেছেন তিনটি গ্রন্থ : মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'শান্তিধারা' ও 'নূরনবী' এবং কাজী আবদুল ওদুদের 'নদীবক্ষে'। এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'নূরনবী' শিশুপাঠ্য হজরত মোহাম্মদ (দঃ)—এর জীবন কথা। 'শান্তিধারা' ইসলামের মূল শক্তিবিষয়ক গ্রন্থ। 'শান্তিধারা' প্রসঙ্গে সৈয়দ এমদাদ আলী লিখেছেন :

''আমাদের সাহিত্য যে সৎপথ ধরিয়াছেন, তাহার এক উজ্জ্বল নিদর্শন মৌলভী মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী সাহেব-রচিত 'শান্তিধারা'। মুসলমান বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার তুলনা নাই। বহিখানা আকারে ক্ষুদ্র, নূর লাইব্রেরীর আটখানা সংস্করণ গ্রন্থমালার অন্তর্ভূত। ইহার ক্ষুদ্র কলেবরের মধ্যে যে একটা মহান্ আদর্শ লুক্কায়িত রহিয়াছে, সেই আদর্শই হইতেছে ইস্‌লামের আদর্শ। এই আদর্শের অনুসরণ করিতে গিয়াই তিনি প্রত্যেক মুসলমানকে দীন ইস্‌লামের পথে অবিরত পরিচালিত করিবার জন্য, তাহাকে সেই পথে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আকুল আহ্বান করিয়াছেন। আমার মনে হয়, লেখক অতি যোগ্যতার সহিতই এই কার্য্য করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার ভাষা কবিত্ব পূর্ণ এবং বিষয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী।

ইংরাজীতে যাহাকে Poetic Prose বলে, তিনি ঠিক সেই ভাষায়ই, বহিখানি রচনা করিয়াছেন। বঙ্গ সাহিত্যে এক 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের' ভাষার সহিতই ইহার ভাষার তুলনা হইতে পারে। বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে যিনি নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে ডুবাইয়া দিতে পারেন, কেবল তিনিই এইরূপ প্রাণস্পর্শী ভাষায় নিজের বক্তব্য বলিয়া নিজেও মুগ্ধ হইতে পারেন এবং অপরকেও মুগ্ধ করিতে পারেন। ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। এয়াকুব আলী সাহেব ইহা করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার রচনা ধন্য হইয়াছে।

'ইস্‌লামের স্বরূপ', 'ইস্‌লামের ধারা', 'রমজান', 'আজান', 'উপাসনা' এবং 'নামাজ' এই কয়টি নিবন্ধ দিয়া লেখক 'শান্তিধারা' বহাইয়াছেন। এ 'শান্তিধারা' অক্ষয় হউক, যুগে যুগে মোস্‌লেম ইহা নবভাবের সঞ্চার করুক, মুসলমানকে ইস্‌লামের অনুগত ভক্তে পরিণত জীবনে।

আমাদের মধ্যে কোন কোন মহাত্মা ইস্‌লামের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া বাহবা লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা যে ইস্‌লামের স্বরূপ নহে, এই কথা বুঝিতে হইলে 'শান্তিধারা' বিশেষভাবে পাঠ করা উচিত। মৌলভী এয়াকুব আলী চৌধুরী সাহেব ইস্‌লামের স্বরূপ যেমন করিয়া বুঝিয়াছেন ও বুঝাইতে পারিয়াছেন, এমন খুব কম লোকই বুঝিতে বা বুঝাইতে পারেন।"

কাজী আবদুল ওদুদের উপন্যাস 'নদীবক্ষে' প্রসঙ্গে সৈয়দ এমদাদ আলী লিখেছেন :

"লেখক 'নদীবক্ষে' আমাদের কৃষক জীবনের একটি নিখুঁত ছবি আঁকিয়াছেন। ইহাতে কোন আড়ম্বর নাই, কোন অস্বাভাবিক ঘটনার সমাবেশ নাই, কৃষক জীবনের বৈচিত্র্যহীন জীবনের মধ্যে যতটুকু বৈচিত্র্য থাকা সম্ভব, তাহাই ইহাতে আছে, তাহার বেশী কিছুই নাই। লেখক তরুণ যুবক, কিন্তু তিনি যেরূপভাবে কৃষক জীবনের শত খুঁটিনাটী বিষয়, তাহাদের সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, মান-অপমানের কথা ; এই বইতে বলি-য়াছেন, তাহাতে তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে বাস্তব জীবনের ঘটনা বলিতে গিয়া এমন বাড়াবাড়ি করেন যে তাহা পড়িতে কষ্ট হয় ও রাগ হয়, সে লেখকের ধৃষ্টতার জন্যে। আবদুল ওদুদ সাহেব কিন্তু নিজেকে বাঁচাইয়া চলিয়াছেন।

দুইটি কৃষক বালক বালিকার কথা গল্পের মূল বর্ণনীয় বিষয়। শৈশবের খেলা-ধুলার মধ্যে যে প্রেম জন্মলাভ করিয়াছিল, তাহা পরিশেষে সফল হইয়াছিল উভয়ের মিলনে। লেখক খুব অসাধারণ চরিত্রের সৃষ্টি না করিতে পারিলেও তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র-গুলি যে রক্তমাংসের মানুষ, তাহা অবলীলাক্রমে বুঝিতে পারা যায় এবং চিনিতেও পারা যায়। আমাদের ঘরের পাশেই যে ইহারা ঘর বাঁধিয়া বাস করে, এইটুকু বুঝিতেও কোন কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না।

লেখক উপন্যাস লিখিয়াছেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার নৈতিক আদর্শ হীন হয় নাই। তিনি এই বহির সর্ব্বত্র যে আদর্শের অনুসরণ করিয়াছেন তাহাকে খাঁটি মোস্‌লেম আদর্শ বলিতে কোন বাধা নাই। গল্পে ও উপন্যাসে আমাদের যে সব সাহিত্যিক এই আদর্শকে বিশেষ করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারিবেন, তাঁহারা সমাজের বিশেষ উপকার করিবেন।

কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের রচনা-রীতি আশাজনক। তাঁহাকে এ বিষয়ে রবীন্দ্রপন্থী বলা যাইতে পারে। উপন্যাস রচনায় তিনি কালে সিদ্ধহস্ত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। আমরা তাঁহার 'নদীবক্ষে' পড়িয়া তুষ্ট হইয়াছি। তিনি আমাদের জন্য ইহা হইতেও বেশী সুখাদ্য পরিবেশন করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা উদ্‌গ্রীব ও আশান্বিত হইয়া রহিলাম। খোদাতালা নিশ্চয়ই আমাদের এই আশা পূর্ণ করিবেন।"

২:৩, মাঘ ১৩২৬ সংখ্যায় তরিকুল আলম কান্তিচন্দ্র ঘোষের 'রুবেইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' গ্রন্থ সমালোচনা প্রসঙ্গে 'ওমর খৈয়াম' শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধের প্রথমাংশ কান্তিচন্দ্র ঘোষের সমালোচনা, দ্বিতীয়াংশ ওমর খৈয়ামের কাব্য

আলোচনা। তরিকুল আলম মূল পারসীতে ওমর পড়েছেন ফলে তাঁর পক্ষে তুলনামূলক সমালোচনা সহজ হয়েছে। কান্তিচন্দ্রের অনুবাদ প্রসঙ্গে তরিকুল আলম লিখেছেন :

"কান্তিবাবু যে সুকবি তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সুকবি ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা এমন সুমধুর হৃদয়গ্রাহী অনুবাদ সম্ভবপর নহে। তবে ইহাও সত্য যে তিনি মূল পার্‌শি হইতে অনুবাদ করেন নাই। তিনি অনুবাদ করিয়াছেন ফিজ্‌জিলেল্ডের ইংরাজি অনুবাদ হইতে।

কান্তিবাবু তাঁহার পুস্তকের নাম দিয়াছেন 'রুবেইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম।' প্রকৃত উচ্চারণ 'রুবেইয়াৎ' না হইয়া 'রোবাইয়াৎ' হইবে। তিনি 'জাম্‌শিয়েদ' লিখিয়াছেন। প্রকৃত উচ্চারণ হইতেছে 'জম্‌শেদ'।

কান্তি বাবুর ভাষার উপর হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমার নাই। তবে দু এক স্থানে সামান্য একটু পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্তাব করিবার সাহস করিতেছি মাত্র। আশা করি কান্তি বাবু আমাকে ক্ষমা করিবেন। ২০ নং রোবাইয়াতের তৃতীয় পংক্তি কান্তি বাবুকে মিলের খাতিরে পংক্তি শেষে 'আজ' ব্যবহার করিতে হইয়াছে। কিন্তু মূল পার্‌শি এবং ফিজ্‌জিরেল্ডের ইংরাজী অনুবাদে আছে 'কাল'। 'কাল' হইতেই মানে হয় ভাল। কেননা আজের সঙ্গে কবির কোন দ্বন্দ্ব নাই—যত দ্বন্দ্ব তাঁহার অতীত এবং ভবিষ্যতের সহিত।—৩৮নং রোবাইয়াতেও কান্তি বাবু 'কালের' পরিবর্ত্তে 'আজ' ব্যবহার করিয়াছেন। "যাত্রা যে 'আজ' করতে হবে" না হইয়া, হওয়া উচিত 'যাত্রা যে কাল করতে হবে'। ৪৮নং চতুষ্পদীতে 'লবেনা তাহা হাস্য-মুখে, বিনা দ্বিধায় চিহ্ন লেশ?' না হইয়া 'বরণ করো হাস্য-মুখে বিনা দ্বিধায় চিহ্নলেশ।' ৬৮ সংখ্যক চতুষ্পদী কান্তি বাবু অনুবাদ করিয়াছেন।

'সৌরভেতে ক'রবে আকুল, থাক্‌বে যা' মোর ভষ্মসার—
জাল পেতে সে থাক্‌বে ব'সে, হাওয়ায় বুনে গন্ধ তার ;
ভণ্ড যত ভক্ত বিটেল প'ড়বে ধরা চলতে পথ,
মদিরগন্ধ পাগল হাওয়ায় উল্টোবে তার বিধান-রথ।'

কান্তি বাবু ফিজ্‌জিরেল্ডের অনুসরণ করিয়াছেন। ফিজ জিরেল্ডের ইংরাজীতে আছে

"That ev'n my buried ashes
　　such a snare
Of perfume shall fling up
　　into the air
As not a true Believer
　　passing by
But shall be overtaken un-
　　aware

মূল পার্‌শিতে আছে

'চন্দাঁ বেখুরম শরাব কিঁ বুয়ে শরাব।
আয়েদ জে তরাব চুঁ রওম জেরে তরাব।।
তা বর্‌ সেরে খাকে মন্‌ রসদ্‌ মখ্‌মুরে।
আজবুয়ে তরাবে মন্‌ সওদ মস্ত ও খারাব।।'

মূলে 'মখমুর' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। মখমুরের অর্থ intoxicated, drunk মাতাল। অতএব ইহার অর্থ কখনও True Believer বা ভণ্ড যত ভক্ত বিটেল হইতে পারে না। মুসলমান শাস্ত্রে মদিরা পান সম্বন্ধে কঠিন অনুজ্ঞা রহিয়াছে। যাহারা 'ভণ্ড ভক্ত বিটেল' তাহারা কখনও মাতাল হইতে পারে না। তাহাদের অন্তরে যাহাই থাকুক না কেন তাহারা বাহিরে কখনও শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ করিতে পারে না। মূল পারশি পড়িয়া মনে হয় যে এই কবিতায় কবি ইঙ্গিত করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি যাঁহারা কবিরই মত প্রেমিক। যাঁহারা প্রেম-মদিরা-পানে বিভোর তাঁহারা যখন ওমর খৈয়ামের গোরের নিকট দিয়া যাইবেন, তখন সেই গোর হইতে নির্গত মদিরগন্ধে আকুল হইয়া পড়িবেন।—

কান্তি বাবুর অনুবাদ সম্বন্ধে বলিবার আর কিছু আমার নাই। আমি কেবল এইটুকু বলিতে পারি যে তাঁহার অনুবাদ পড়িয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি।''

২:৩, মাঘ ১৩২৬ সংখ্যায় দুটি গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থ দুটি ১. মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের 'উন্নত জীবন' ও ২. রাহাতুন্নেছা খাতুনের 'দেবী রাবিয়া'। সমালোচকের নাম নেই। সমালোচনা উচ্ছ্বাসময়।

২:৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ সংখ্যায় তরিকুল আলম লিখেছেন প্রমথ চৌধুরীর 'চার ইয়ারী কথা' ও চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পঙ্কতিলক' উপন্যাসের আলোচনা। সওগাতের সমালোচকদের মধ্যে নিঃসন্দেহে তরিকুল আলম বিশিষ্ট। এই দুটি গ্রন্থের সমালোচনাতেও তাঁর বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে। প্রমথ চৌধুরীর 'চার ইয়ারী কথা' প্রসঙ্গে তরিকুল আলম লিখেছেন :

''এই গল্প চারটির পেছনে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের ভাব আছে। এ ভাবটা সাধারণ মানুষের সাধারণ ভালবাসার প্রতি। আমরা সবাই ভাবি যে আমরা ভালবাসতে জানি। আমরা যেমন ভালবাসি তেমনটী আর কেউ বাসে না। আর আমাদের ভালবাসার মধ্যে 'দেহের চাঞ্চল্যের' নাম গন্ধ নাই। এই গল্প চারটিতে আকারে ইঙ্গিতে এই শ্রেণীর ভালবাসাকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। কিন্তু এই বিদ্রূপের পেছনে আর একটী ভাব আছে যেটী হ'চ্ছে করুণার ভাব। লেখক এইখানেই আমাদের তাঁর দিকে আকৃষ্ট করছেন— আর এইজন্য এই চার ইয়ারি বইখানি পাঠ করে মনে একটা বেশ আরাম পাওয়া যাচ্ছে। তুমি যতই বিদ্রূপ করনা কেন, যতই অবজ্ঞা করনা কেন, ভালবাসাটাকে যতই কেন খামখেয়ালি মনে করনা—এটা মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব। প্রকৃতি যেমন মানুষকে সোজা হ'য়ে দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হুকুম করেছে, মানুষকে তেমনি ভালবাসতেও হুকুম করেছে। মানুষ ইচ্ছা করলেও যেমন চার হাত পায়ের উপর ভর দিয়ে পশু সেজে বেড়াতে পারে না—[অর্থাৎ বেশী সময় তা করতে পারে না ; এবং যদি বা করে তা' হ'লে অতর্কিতে যদি কেহ তাকে আক্রমণ করে তা' হ'লে গোপাল ভাঁড়ের সেই গল্পের মত সড়া অন্ধ' বলে চেঁচিয়ে উঠে আত্মপরিচয়টা প্রকাশ করে ফেলে] তেমনি মানুষ নিজের মনকে যত ইঁট পাথর দিয়েই ঘিরে রাখুক না কেন, ঠিক সময়টী হ'লে তাকে ভালবাসতেই হবে।' এটা মানুষের গুণই বল আর দোষই বল। একে তার সম্পদই বল আর দারিদ্র্যই বল। এই গল্প চারটিতে মানুষের মনের এই কোমল বৃত্তিটাকে নিয়েই লেখক একটু পরিহাস করেছেন—কিন্তু এ পরিহাসের মধ্যে ঘৃণা নাই। এতে বরং করুণার মাধুর্য্যই আছে। এই প্রচ্ছন্নতর করুণার ভাবটীই গল্পগুলিকে শিল্পচাতুর্য্যে সৌষ্ঠব-সম্পন্ন করে তুলেছে।''

আলোচিত দ্বিতীয় গ্রন্থ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পঙ্কতিলক' উপন্যাস। বিস্তৃত কাহিনী-পরিচয় প্রদানের পর উপন্যাস প্রসঙ্গে তরিকুল আলম লিখেছেন :

"চারু বাবুর লেখার মধ্যে প্রায়ই পূরাতন প্রচলিত প্রথা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা যায়। স্রোতের ফুলে তা' আছে। পূজার প্রতিমা, বায়ুবহে পুরবৈয়াঁ, চুড়িওয়ালা, বজ্রাহত বনস্পতি প্রভৃতি ছোট ছোট গল্পে তা আছে।—আর পঙ্ক তিলকে ত তা' একেবারে নোটিশ দিয়েই আছে। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একেবারে খোলাখুলী যুদ্ধ ঘোষণা। গোবিন্দ ব্রাহ্মণ হয়ে ডোমের সঙ্গে থাকতে উৎসুক; আর নিজকে অন্যের কাছে মুচি বলে পরিচয় দিতে লজ্জার পরিবর্ত্তে গৌরব বোধ করে। আভা তার শাস্ত্রের মার্কা-মারা স্বামী পশুটাকে ত মোটেই শ্রদ্ধা ভক্তি করতে পারেনি—তা ছাড়া আবার বিধবা হয়ে গোপনে আর একজনার কাছে আত্মদান করে বসলো।

এই বইখানি পড়ে শান্তার কথা আর কিরণময়ীর কথা মনে পড়লো।—আর মনে পড়লো ভিক্টোরিয়া ক্রসের লাইফ সেণ্টেন্সের নায়িকার কথা। সমাজ এবং ধর্ম্মের চক্ষে যারা পতিতা তাদেরই উপলক্ষ করে চারুচন্দ্র, শরৎ চাটার্জী, দ্বিজেন্দ্র লাল এবং ভিক্টোরিয়া ক্রস লেখনি চালনা করেছেন। কিন্তু এক একজনের রুচি এক এক রকম। আভা দ্বিজেন্দ্র লালের হাতে পড়লে বোধ হয় বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার গোবিন্দের সঙ্গে তার বাড়ীতে যেত না। দ্বিতীয় শান্তা হয়ে থাকত, আর প্রভু দিব্বি আরামে মোহন্তগিরী করতেন আর মাঝে মাঝে গিয়ে এই দ্বিতীয় শান্তাটীকে দেখা দিয়ে তাকে শান্ত করে আসতেন। শরৎচন্দ্রের হাতে পড়লে আভা বোধ হয় সোজা গিয়ে প্রভুকে একেবারে বগলদাবা করে যে দিকে দু'চক্ষু যায় সেই দিকেই প্রস্থান করতে। আর ভিক্টোরিয়া ক্রসের হাতে পড়লে জগন্নাথের জীবদ্দশাতেই বোধ হয় নিজকে গোবিন্দের পায়ে ডালি দিত।

আমরা Convention-এর মোটেই ধার ধারিনা—তবে জিজ্ঞাস্য এই যে বইখানির আদর্শ কি? পতিতের প্রতি করুণা আজ কালকার দিনের Larger humanityর অংশ মাত্র। কিন্তু গোবিন্দের চরিত্র আলোচনা করতে গিয়ে চারইয়ারী কথার সীতেশের গল্পের সুন্দরীর মতে পুরুষ জাতির শ্রেণী বিভাগের কথা মনে পড়ে। সুন্দরীর মতে পুরুষ জাত দু'রকম, এক রকম হচ্ছে বাঁদরের জাত। তারা স্ত্রীলোক দেখিলেই আঁচড়াতে কামড়াতে চায়। আর এক রকম হচ্ছে পোষা কুকুরের জাত। তারা কেবল পায়ে পায়ে ঘোরে। আর তাদের যতই লাথি ঝাঁটা মার না কেন লেজ নাড়তে নাড়তে এসে তোমার পার ত'লা চাট্‌তে থাকে। গোবিন্দ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। আভার চরিত্রও আমাদের কাছে খুব আদর্শ বলিয়া মনে হয় না। গোবিন্দ যখন তার লজ্জা ঢাকার জন্য তা'র কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলো তখন সে অম্লান বদনে উত্তর করলো, 'ঠাকুর পো, তুমি কি আমায় দ্বিচারিণী হতে বল?' কিন্তু উপন্যাসের আরম্ভে তা'কে আমরা যেমন দেখেছি তা'তে আমাদের মনে হয়েছিল যে জগন্নাথের আগে গোবিন্দই তার চোখে পড়েছিল এবং গোবিন্দকে সে হৃদয়ের আসনে বসিয়েছিল। তার পর জগন্নাথ এসে আইনের বলে বাঁশ নছব করে তার শরীর দখল করেছিল বটে, কিন্তু ভেতরের মানুষটাকে আয়ত্ত করতে পারে নাই। তার পরে প্রভু তার মিষ্টি গলা নিয়ে এসে গোবিন্দের ছবি সেখান থেকে মুছে ফেলে দিলেন। তা'তে আভার ওপর বিশেষ সন্তুষ্ট হতে পারি না। পোষা কুকুরটার একান্ত প্রভুভক্তির পুরস্কার দেওয়া নিতান্তই উচিত ছিল।

রাসমণির চিত্রটা ঠিক life like হয়েছে। এমন অনেক শাশুড়ী এখনও আমাদের চোখে পড়ে। আভার প্রতি উৎপীড়নের চিত্রগুলি গ্রন্থকার বেশ নিপুণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। এবং সেগুলি পড়বার সময় বোধ হয় অনেক পাঠিকারই চোখে জল পড়ে—(পাঠকের চোখের জল পড়াটা ঠিক নয় বলেই সে কথা লিখলাম না)।

মোটের ওপর বইখানা পড়ে দুঃখ পাওয়ার সুখটা মনের ভেতর বেশ অনুভব করা যায়।''

২ : ৮-১১, আষাঢ় আশ্বিন সংখ্যায় তরিকুল আলম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'গৃহদাহ' উপন্যাসের দীর্ঘ আলোচনা লিখেছেন। তাঁর বিশিষ্ট রীতিতে কাহিনী বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে নানা মন্তব্য করে গেছেন তিনি। আলোচনার প্রথম দুটি বাক্য: ''লেখক বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালী ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে সহজে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইহার অধিক পরিচয় অনাবশ্যক।'' এরপর গৃহদাহের গল্প সংক্ষেপ ও চরিত্র পরিচয়। বিস্তৃত সেই আলোচনার পর তরিকুল আলম লিখেছেন :

''গৃহদাহের বর্ণিত বিষয়টী চিরপুরাতন। ইহা ইলিয়াড ও রামায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া মাসিক পত্রের ছোট গল্পের এবং বটতলার নিকৃষ্টতম গ্রন্থের আখ্যান বস্তু। ইহা সেই Eternal triangle ইহা বাংলা প্রবাদের 'একে ঘুম, দুয়ে পাঠ এবং তিনে গোল।' ইহার আখ্যান ভাগে নূতনত্ব কিছুই নাই।

এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় কিছু আছে কিনা, তাহা নির্দ্ধারণ করা দুষ্কর। যদি কিছু থাকে, তাহা বোধ হয় এই যে, ধর্ম্মের সাহায্য ব্যতিরেকে কর্ত্তব্যনীতি কেবল আপনার পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। অচলা শিক্ষিতা হইয়াও অবস্থার দাসী হইল, কেন না তাহার কর্ত্তব্যনীতির পশ্চাতে ধর্ম্মের অবলম্বন (prop) ছিল না। মৃণাল জয়ী হইল, কেন না ধর্ম্মের সহিত জড়িত আজন্মের সংস্কার তাহাকে ঘোর দুর্দ্দশার মধ্যেও ধ্রুব তারার মত পথ দেখাইয়া চলিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের সন্দেহ হয় যে, মৃণালের চরিত্রাঙ্কনে গ্রন্থকারকে তাঁহার জন্মগত সংস্কার সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু গ্রন্থকার তাঁহার সেই পুরাতন মহৎ মানবত্ব (Larger humanity) বিস্মৃত হন নাই এবং মৃণালকে যে আমাদের ভক্তি একান্তভাবে আকর্ষণ করিতেছে, তাহার একটী প্রধান কারণ হইতেছে এই যে, গ্রন্থকার তাহাকে অপর সমস্ত গুণাবলীতে ভূষিত করিয়াও তৃপ্ত না হইয়া তাহাকে এই শ্রেষ্ঠতম গুণটি দিয়াছেন। মৃণালকে আমরা Super woman (অতিমানবী) বলিব।''

আলোচনার উপসংহারে তরিকুল আলম মন্তব্য করেছেন, ''গৃহদাহে শরৎবাবু পাঠক পাঠিকাকে উচ্চশ্রেণীর মানসিক খাদ্য উপহার দিয়াছেন।''

২ : ৮-১১, সংখ্যাতেই আরো তিনটি বইয়ের সমালোচনা ছাপা হয়েছে। সমালোচকের নাম নেই। বই তিনটির প্রথমটি হল সুরেশচন্দ্র মিত্রের 'বোধন', একটি হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর উদ্দেশ্যে করটিয়া-টাঙ্গাইল থেকে গ্রন্থকার নিজেই প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন :

''আলোচ্য বইখানিতে গ্রন্থকার নিজের মতের সমর্থনে হিন্দুশাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ ও কোর-আন্-হাদিস হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম সুরেশ বাবু এমন কতকগুলি শ্লোক মুসলমান শাস্ত্রের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার সহিত প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রের কোন সম্বন্ধ নাই।' সুরেশ বাবু বোধ হয় আরবী জানেন না। সুতরাং এই ভুলের জন্য আমরা তাঁহাকে ততটা দোষ দিই না—যিনি তাঁহাকে মুসলমান-দের শাস্ত্র-বাক্য দিয়া সাহায্য করিয়াছেন তাঁহারই নিন্দা করি।

যাহা হোক বইখানি পড়িয়া আমরা মোটের উপর আনন্দিত হইয়াছি। কোরবাণী প্রসঙ্গের আলোচনা এমন অপক্ষপাত ভাবে, এমন সুন্দর করিয়া, এমন সহানুভূতির সহিত আর কোন বাঙালী হিন্দু লেখক করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

বাংলা ভাষায় এইরূপ ধরনের বই বাঙালী হিন্দুর কলম দিয়া বোধ হয় এই প্রথম বাহির হইল। এই প্রকারের পুস্তক আমাদের সাহিত্যে বেশী সংখ্যায় সৃষ্টি হইলে দেশের পক্ষে মঙ্গলের কথা হইবে।

পরিশেষে, গ্রন্থকার যে শুভ-ইচ্ছা লইয়া এই বইখানি লিখিয়াছেন, আমরা তাহার সাফল্য ও পূর্ণতা কামনা করি। হিন্দু মুসলমানের মিলন এদেশে বাস্তবে চিরপ্রতিষ্ঠিত হোক। দেশমাতৃকার যুগল সন্তান আমরা গলায় গলায় মিলিয়া নয়ন জলে অতীতের হিংসা-বিদ্বেষ ভাসাইয়া দিই। জীবন আমাদের ধন্য হোক, দাসত্বের শৃঙ্খল আমাদের টুটিয়া যা'ক, ভারতের ললাটে আবার নবীন গরিমা ভাতিয়া উঠুক।''

সমালোচিত অপর দু'টি ফজলুর রহীম চৌধুরীর 'সোহরাব রোস্তম' (মখদুমী) ও সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'পল্লীব্যাথা' (ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব)। দু'টিই কবিতাগ্রন্থ। সমালোচক সহানুভূতিশীল তবু সেই সহানুভূতি গ্রন্থ দুটির অন্তর্গত দুর্বলতাকে আড়াল করতে পারেনি।

৩ : ৪, ফাল্গুন ১৩২৭ সংখ্যায় আলোচিত হয়েছে গোলাম মোস্তফার 'ভাঙ্গাপ্রাণ' উপন্যাস। সংক্ষিপ্ত 'পুস্তক পরিচয়' রচয়িতার নাম অনুক্ত। ভাঙ্গাপ্রাণ প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে : 'মনের উন্নতি না হইলে মানুষ বিবাহের মর্য্যাদা ভাল করিয়া বোঝে না। অধঃপতিত মানুষ মনে করে, জড়দেহের ভোগের জন্যই বিবাহ। নারীপুরুষের মিলন কত সুন্দর, কত মহান এ কেহ বুঝিতে চেষ্টা করে না। ইহার অপব্যবহার যাহারা করে তাহারা কত ছোট! অনিচ্ছায় যেখানে বিবাহবন্ধন সংঘটিত হয় সেখানে অশান্তি, আর সীমাহীন দুঃখ সৃষ্টি করা হয়। বাধ্যতামূলক বিবাহের অভিশাপ কত জীবনকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে—কত অশ্রু কত দীর্ঘশ্বাসের কারণ হইয়াছে। গোলাম মোস্তফা সাহেব তাহার সরল কবি-প্রাণ লইয়া একটা সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী পারিবারিক চিত্রের ভিতর দিয়া মানবজীবনের এই সহজ সত্য অতি সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ভাঙ্গা প্রাণ একখানি সুন্দর সামাজিক উপন্যাস।''

ঐ সংখ্যায় ওয়াজেদ আলী রচিত 'মোহাম্মদ আলীর জীবনী' ও মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'নূর নবীর' সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও ছাপা হয়েছে।

৩ : ৫, চৈত্র ১৩২৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির-উদ্দীনের 'শিরী ফরহাদ' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত 'পুস্তক পরিচয়'। সমালোচক মখফি লিখেছেন :

''ভাস্কর শিল্পী ফরহাদের অত্যাশ্চর্য্য প্রেমের কাহিনী পাঠ করিয়া চোখ ফাটিয়া পানি আসে। এমন সুন্দর এমন মধুর আত্মত্যাগ মানব সমাজের ইতিহাসে একেবারেই বিরল। ফরহাদের পুণ্য প্রেম কাহিনী যে শুনিবে, তাহারই প্রাণ মহত্ত্বের আলোকপাতে সমুন্নত হইয়া উঠিবে। ফরহাদ প্রিয়তমার জন্য পাহাড় কাটিয়া পথ প্রস্তুত করিয়া-ছিলেন, তবুও তাহার ভাগ্যে প্রিয়তমার সন্ধান মিলে নাই। হায়, দুর্ভাগ্য!

বিষয়টী এতই সুন্দর যে পড়িতে পড়িতে মন অস্থির ব্যাকুল হইয়া উঠে—আর কোন কথাই আমাদের ভাবিবার অবসর থাকে না। মনে হয় যে সত্য করিয়া প্রেম করিতে জানে, সে মহামানুষ হয়।

গ্রন্থকারের ভাষার উপর বেশ দখল আছে,—স্থানে স্থানে একটু অসংযমের পরিচয় পাওয়া গেল। এই দোষ টুকু সংশোধন হইলে, পুস্তক খানি এক অপূর্ব্ব জিনিষ হইবে।

'শিরি-ফরহাদ' বাঙ্গালার প্রত্যেক যুবক-যুবতীর হস্তে পৌছিবার যোগ্য। পুস্তকখানি পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম।''

উল্লেখযোগ্য যে, এই অতি সংক্ষিপ্ত পুস্তক পরিচয় ব্যতীত নাসিরউদ্দীনের লেখা সম্পর্কে সওগাতে কোন বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হয়নি।

৪ : ২, শ্রাবণ ১৩৩৩ সংখ্যায় 'পুস্তক ও পত্র পরিচয়' বিভাগে ছাপা হয়েছে লুৎফর রহমানের 'মহৎ জীবনে'র পরিচিতি। সংক্ষিপ্ত এই পরিচিতিতে লুৎফর রহমানের অসুস্থতার সংবাদও আছে :

''আমরা সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ডাক্তার লুৎফর রহমান সাহেব প্রণীত মহৎ-জীবন গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। গ্রন্থকারের লেখার ভঙ্গী ও চিন্তার ধারা-গুলি বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য।

এরূপ সুন্দর সরল ভাষায়, এত উপদেশ পূর্ণ গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় আর কোন মুসলমান সাহিত্যিক লিখিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। পাপ বেদনা, অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ইঁহার লেখার প্রতি ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা ডাক্তার সাহেবের লেখনী হইতে এরূপ উন্নত ধরনের অনেক রচনা পাইবার আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ এত বড় একজন শক্তিশালী লেখককে আমরা হারাইতে বসিয়াছি। বিগত কয়েক মাস যাবত তিনি কঠিন ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহার জীবনের আশা খুব কম। অর্থাভাবে চিকিৎসা হইতেছে না। সাহিত্যামোদী ভ্রাতৃগণের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তাঁহারা যেন ডাক্তার সাহেবের মহৎ জীবন গ্রন্থখানা ক্রয় করিয়া এবং সম্ভব হইলে অন্য কোন উপায়ে এই রোগ শয্যায় তাঁহার উপযুক্ত চিকিৎসার সহায়তা করিবেন।''

৪ : ৫, কার্তিক ১৩৩৩ সংখ্যায় 'পুস্তককীট' 'পুস্তক ও পত্র' শিরোনামে চারটি বই আলোচনা করেছেন। শেখ হবিবর রহমানের 'আলমগীর' : ''আলোচনায় লেখকের খুব সূক্ষ্ম দর্শিতার পরিচয় না থাকলেও ইহাতে তাঁহার গবেষণার পরিচয় আছে''। আবু আবদুল লতিফের 'হাসির তোড়া' : ''ছেলেদের গল্পের বই। গল্পগুলি হাস্যরসাত্মক। রচনায় কোন বিশেষত্ব নাই ; — নিতান্ত মামুলী ধরনের''। আবু লোহানীর বালক বীর : ''শিশু-পাঠ্য জীবন চরিত। তুরস্ক সেনাপতি হোসেন নূরী বে-র বাল্য জীবনী''। শেখ হবিবর রহমানের 'সদ্ভাব কুসুম বা সাদীর কালাম' : ''ভাবকে চরণ মিলাইয়া দিতে পারিলেই কাব্যানুবাদ হয়না। সৌন্দর্য গ্রাহিতাও তার জন্য আবশ্যক। ঐ জিনিষটি যাঁর মধ্যে নাই, তাঁর পক্ষে সাদীর কাব্যের কাব্যানুবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া গদ্যানুবাদে হাত মক্স করিলেই ঠিক হইত।''

৪ : ৬, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ সংখ্যায় ছাপা হয়েছে মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'মানবমুকুট' গ্রন্থের পরিচিতি। সমালোচকের নাম নেই। গ্রন্থটি সম্পর্কে লেখা হয়েছে :

''এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনে মানবতার আদর্শ কিরূপ ছিল, তাহা তীক্ষ্ণভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হইয়াছে। বিশ্লেষণ এত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে যে, এই ক্ষুদ্র বইখানাকে বাঙ্গলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। লেখক অন্ধভক্তের ন্যায় 'আহা' 'উহু' 'মরি মরি'! করিয়া হজরতের মহত্ত্ব বুঝাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন নাই। তীক্ষ্ণ স্রষ্টার ন্যায় যুক্তি সহকারে

হজরতের জীবনের সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব লোক-লোচনের গোচরীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার শক্তিশালী লেখনি সে চেষ্টায় ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহার লেখার আর এক বিশেষত্ব, তাঁহার ভাষা। চৌধুরী সাহেবের ভাষা সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্র-য়োজন। সকলেই জানেন, গম্ভীর ও উন্নত ভাষার রচনায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যে তাঁহার তুলনা নাই। 'মানব মুকুটে' যে উন্নত ও গভীর বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহা গম্ভীর ও উন্নত ভাষা না হইলে সুন্দররূপে ফুটিতে পারে না। চৌধুরী সাহেব গম্ভীর ও উন্নত ভাষা প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত। সুতরাং 'মানব মুকুটে'র রচনা যে কত সুন্দর হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমরা আশা করি, প্রত্যেক বাঙ্গালী মুসলমানের গৃহে এই গ্রন্থখানা গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় বিরাজ করিবে।''

৪ : ৯, ফাল্গুণ ১৩৩৩ সংখ্যার নামহীন সমালোচক লিখেছেন পাঁচটি 'পুস্তক পরিচয়'। মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহর গল্পগ্রন্থ 'প্রদীপ ও চেরাগ' সম্পর্কে লেখা হয়েছে যে গ্রন্থে তিনটি গল্প আছে এবং 'হিন্দু মুসলমানের মিলনের উপর যে দেশের মুক্তি নির্ভর করে এই মহান ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া লেখক এই গল্প তিনটি রচনা করিয়াছেন।' পঞ্চানন ঘোষালের হিন্দু 'বিধবার মুক্তি'-লাভ ঘটেছে 'অবশেষে মুসলমান যুবক রহিমের স্নেহচ্ছায়ায় আসিয়া তাহাতে কোনরূপ জোরজবরদস্তী নাই, গুণ্ডা মুসলমানের বলপূর্ব্বক হিন্দু নারী হরণের বিভীষিকাও নাই। হিন্দু লেখক নিজেদের সমাজের এই পাপাচারের প্রতি যে নির্ম্মম কশাঘাত করিয়াছেন তাহাতেই বুঝা যায়, সত্যের প্রতি তাঁহার কত নিষ্ঠা, অত্যাচারিত হিন্দু বিধবার দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে কতটা বেদনার সঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু উপন্যাসখানির প্লট সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ হইলেও আর্টের দিক দিয়া ইহা ত্রুটী শূন্য নহে।''

সৈয়দ এমদাদ আলীর 'তাপসী রাবেয়া' প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে : ''এই গ্রন্থের শেষাংশের সূফীধর্ম্মের আলোচনা টুকু অতি চমৎকার হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, অন্য কোন কারণে না হইলেও শুধু এই আলোচনা টুকুর জন্য এই গ্রন্থ প্রত্যেক বাঙ্গালী মুসল-মানের অবশ্য পাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেব সূক্ষ্ম-দর্শী লেখক বলিয়া বাঙ্গলার মুসলমান সমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সূফীধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এই আলোচনায় তাঁহার সেই জ্যোতি অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।''

ঐ সংখ্যায় শামসুন নাহারের প্রথম গ্রন্থ 'পুণ্যময়ী' (প্রকাশক, বাহার, চট্টগ্রাম) সম্পর্কে লেখা হয়েছে :—''মোসাম্মৎ শামসুন নাহার সাহেবার ন্যায় প্রতিভাশালীনী বিদূষী মহিলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছেন, ইহা মুসলিম বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ আশার কথা। সাময়িক সাহিত্যের মারফতে এযাবত আমরা সাহিত্যে তাঁহার যে সমস্ত দান পাইয়াছি, তাহাতে আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, মুসলিম বঙ্গ-সাহিত্য ভবিষ্যতে এই তরুণী লেখিকার অবদানে যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ হইবার আশা রাখে। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থ 'পুণ্যময়ী'তে আট জন প্রাতঃস্মরণীয়া মুসলিম-মহিলার সংক্ষিপ্ত জীবনী স্থান পাইয়াছে। ইহাই লেখিকার প্রথম প্রয়াস বলিয়া ইহার রচনা আশানুরূপ সহজ সরল হয় নাই,—কতকটা পণ্ডিতী বাঙ্গলা হইয়া গিয়াছে। তথাপি তাঁহার বিবৃতি-কৌশল অপ্রশংসনীয় হয় নাই। 'পুণ্যময়ী' পড়িয়া আমরা মোটের উপর আনন্দিত এবং লেখিকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়াছি। ছাপা কাগজ বেশ হইয়াছে। ইহার প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটিও সুন্দর হইয়াছে।

ঐ সংখ্যার আলোচিত শেষগ্রন্থ কাজী আবদুল ওদুদের 'নবপর্য্যায়' (প্রকাশক : আফজালউল হক, মোসলেম পাবলিশিং হাউস, কলকাতা)। গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে : ''মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্যে যে কয়জন নবীন চিন্তাশীল খাঁটী সাহিত্যিকের

আবির্ভাব হইয়াছে, তন্মধ্যে মৌলভী কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব অন্যতম। কাজী সাহেব রবীন্দ্রনাথের একজন বিশেষ ভক্ত এবং তাঁর চিন্তাধারার অনুসারী। রবীন্দ্র-ভাবের ভাবুক হইলেও তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্য একেবারে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-রাজ্যের ভিতরে হারাইয়া ফেলেন নাই। রবীন্দ্র-ভাবধারায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়া আধুনিক যুগে নবীন লেখকদের মধ্যে একটা 'ফ্যাশনে' পরিণত হইয়াছিল। কাজী সাহেব এই ফ্যাশন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারিয়াছেন, একথা বলিতে না পারা গেলেও তাঁহার চিন্তাধারার ভিতরে যে স্বাধীনচিত্ততা স্বাতন্ত্র্য আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমালোচ্য গ্রন্থের প্রত্যেক প্রবন্ধের বুকে তাঁহার চিন্তার স্বাধীনতার ছাপ অল্পবিস্তর বিদ্যমান আছে। সামাজিক কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ রবীন্দ্র-চিন্তাধারার এক বিশেষত্ব। 'নবপর্য্যায়ের' এই বিশেষত্বের ছাপ পূর্ণ মাত্রায় আছে। এই বিশেষত্বের মোহদ্বারা পরিচালিত হইয়া অনেক নবীন লেখক সমাজ সংস্কারের নামে স্বেচ্ছাচারিতার জন্য বেপরওয়া ভাবে কলম চালাইয়াছেন। কিন্তু কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি, আলোচ্য বিষয়ের পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ জ্ঞান, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার সমাজ ও দেশ-প্রীতির অকৃত্রিমতা তাঁহার চিন্তার স্বেচ্ছাগতির রাশ টানিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছে। ফলে, 'নবপর্য্যায়' নবীন বাঙ্গালী সমাজে এক অতি উপাদেয় চিন্তার সামগ্রী হইয়াছে। ইহার 'নবপর্য্যায়' নাম সার্থক হইয়াছে;—সত্যই ইহা বাঙ্গালীর প্রবুদ্ধ চিন্তাধারায় এক নবপর্য্যায়ই বটে। এই পুস্তকের ভাষার প্রকাশভঙ্গী আশ্চর্য্যরকমে সূক্ষ্ম। এইদিক দিয়া কাজী সাহেব শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তের রচনাভঙ্গীর অনুসরণ করিয়াছেন। শশাঙ্কবাবু ও নলিনী বাবুর ভাষা সূচীমুখের ন্যায় সূক্ষ্ম হইলেও তাঁহাদের রচনার প্রকাশ ভঙ্গীতে তাঁহাদের বক্তব্য নিতান্ত সহজ সরল সাধারণ কথাও অনেক স্থলে দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকায় পরিণত হয় এবং সাধারণ পাঠক ভাষার দুয়ারে মাথা কুটিয়াও সহজে ভাবের নাগাল পান না। ভাষার এই কসরত পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইলেও সর্ব্বথা কৃত্রিমতাপূর্ণ এবং সেই কারণে বর্জ্জনীয়। কাজী সাহেব এই ধরনের রচনা প্রণালীর অনুসারী বলিয়া তাঁহার প্রকাশভঙ্গী খুব সূক্ষ্ম হইলেও আমাদের মতে তাহা অনেক স্থলে কৃত্রিমতাপূর্ণ হইয়াছে এবং সেই কারণে ভাষা অনেকস্থলে তাহার স্বচ্ছন্দগতি হারাইয়াছে। তারপর, অপরের রচনার Style এর ভিতরে নিজের বিশিষ্ট রচনাভঙ্গীকে হারাইয়া ফেলিয়া ভাষাকে কৃত্রিমতা পূর্ণ করিয়া তুলিবার পক্ষপাতীও আমরা নহি। অবশ্য নবীন লেখকদের পক্ষে ব্যক্তিত্বশালী লেখকদের সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত হইয়া চলা একরূপ অসম্ভব; তাহা কেবল অসাধারণ কৃতিত্বশালী লেখকদের দ্বারাই সম্ভব। যাহা হউক, 'নবপর্য্যায়' পড়িয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। নবীন বাঙ্গালী সমাজে ইহা বিশেষ ভাবে পঠিত হইবার পক্ষে একখানা চমৎকার বহি হইয়াছে।''

8:8 আশ্বিন ১৩৩৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে 'পুস্তককীটে'র লেখা সমালোচনা। আলোচিত প্রথম গ্রন্থ শাহাদাৎ হোসেনের উপন্যাস 'যুগের আলো' (প্রকাশক মোহাম্মদী-বুক এজেন্সী, কলকাতা)। উপন্যাসটির ভূমিকায় শাহাদাৎ হোসেন লেখেন: ''অভাব অশান্তি ও আশা ভঙ্গ জনিত মানসিক পীড়ায় যখন মানুষ ভেঙ্গে পড়ে, তখন সে মনে করে, তার জীবন একটা শূন্য ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সংসারের বুকের উপর একটা বিরাট অপ্রয়োজন স্বরূপে সে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সে জানে না যে, অনেক সময় তা'র সেই ব্যক্তিগত ব্যর্থতা দেশের সার্থকতার মূলীভূত কারণ হয়ে দাঁড়ায়;—তাকে ব্যর্থ করে, তার সমাজ, জাতি বা দেশ অভিনব সাফল্যে মণ্ডিত হয়ে গড়ে উঠে। মানুষ নিজের মধ্যে নিজে শূন্য হলেও বাইরের পূর্ণতা তাকে আশ্রয় করে ফুটে বেরুতে পারে, এই কথাটাই বইখানাতে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে।''

এই ''তত্ত্ব' শাহাদাৎ হোসেন তুলে ধরেছেন মতি ও সুরমা চরিত্রে। গ্রন্থটি আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকীট লিখেছেন:

"মতি ও সুরমা চরিত্রের দ্বারা লেখক দেশে একটা আদর্শ খাড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ;—এবং আমাদের মনে হয়, তাহাতে লেখক সফল কামও হইয়াছেন। এই দুইটী চরিত্র কিছু অসাধারণ হইলেও তাহাতে অস্বাভাবিকতার অপবাদ দেওয়া চলে না। এইমাত্র বলা যায়, এই চরিত্র দুইটী সাধারণ মানবের চেয়ে একটু উঁচু ধরনের হইয়াছে। যে দেশে মহাত্মা গান্ধীর চরিত্র আকাশে মাথা তুলিয়া আছে, সেখানে কোন্ মুর্খ ইহাকে অস্বাভাবিক বলিতে অগ্রসর হইবে?

এই চরিত্র দুইটী আঁকিতে লেখক যে সৃষ্টিক্ষমতা ও নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অনন্য সাধারণ। কোন আর্টজ্ঞানহীন অল্প শক্তিশালী লেখকের পক্ষে এই চরিত্র দুইটি ফুটাইয়া তুলা অসম্ভব হইত। ইহা আঁকিতে এত সাবধানতার সহিত লেখককে লেখনী চালনা করিতে হইয়াছে যে, সামান্য এদিক ওদিক হইতেই হয়ত এই চরিত্র দুইটী কদর্য্য ও ভদ্র সমাজে স্থান পাইবার অযোগ্য হইয়া উঠিত। বাল্যকালে মতি ও সুরমা পরস্পরকে ভাল বাসিয়াছিল। সে ভালবাসা যে সে ভালবাসা নহে,—আত্মবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা যে ভালবাসার পরিণতি, ইহা তাহাই। প্রতিভা শূন্য লেখকের হাতে পড়িলে তিনি পরিণামে সুরমা ও মতির বিবাহ না ঘটাইয়া হয়ত ছাড়িতেন না। কিন্তু এই গ্রন্থের গ্রন্থকারের আর্টজ্ঞান এই অনুপম চরিত্র দুটিকে ওরূপ কদর্য্য পরিণতি হইতে রক্ষা করিয়াছে। মতি ও সুরমার সুকঠিন পবিত্রতা আদ্যন্ত রক্ষা করিতে পারাতেই লেখকের সূক্ষ্ম আর্টজ্ঞান ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সুরমা নিজে উদ্যোগী হইয়া যখন তাহার প্রিয়তম মতির বিবাহ দিল এবং বিবাহের পরে চারিমাস ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে বধূকে সর্ব্বকার্য্যে পারদর্শিনী করিয়া তুলিল, সুরমার তখনকার চিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট আয়েশা চরিত্রের কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। যখন সুরমা মতির নিকট হইতে চির বিদায় লইতে গিয়া বলিল, 'আমার জন্য দুঃখ করো না মতি দা! সুখ করবার জন্য অভিশাপের বোঝা মাথায় নিয়ে আমি সংসারে আসিনি। দুঃখই আমার ইহ জন্মের সঙ্গী। যতদিন বাঁচব, ততদিন সে আমার পিছনে ঘুরবে, এই আমার নিয়তি। তবে এর জন্য কেন মিছে দুঃখ করে মন খারাপ করবে?' তখন ভালবাসার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগিনী সুরমার যে মনোরম চিত্র ফুটিয়া উঠিল, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে খুব সুলভ নহে ;—তখন পাঠকের চক্ষু আপনা-আপনি বাষ্পাকুল হইয়া উঠে এবং এই মহিমাময়ী নারীর চরণে তাহার মন শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া পড়ে।

মতির চরিত্র বর্ত্তমান ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের আদর্শ হইবার যোগ্য। চিনির বলদের মত পাশ্চাত্য বিদ্যার বোঝা ঘাড়ে করিয়া যাহারা চাকুরীর তালাশে হা-হুতাশ করিয়া মরিতেছেন তাহাদিগকে মতি-চরিত্র অনুশীলন করিতে বলি। মতি উচচ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও বিদেশে চাকরী-বাক্‌রী করিবার লোভ সংবরণ করিয়া এবং আরদালী-চাপরাসীর সেলাম লাভ করিবার সৌভাগ্য ত্যাগ করিয়া, নিজ গ্রামে এক ক্ষুদ্র পাঠশালার শিক্ষকতার কার্য্যে দেশের ছেলে ও মেয়ে গড়িবার দিকে মন দিল। 'তোতাপাখী' সৃষ্টিকারী বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া লেখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চরকায় সুতা কাটা, তাত বোনা, সেলায়ের কাজ প্রভৃতিও ছেলে মেয়েদের শিখাইবার বন্দোবস্ত করিল। এর পর এই কর্ত্তব্য-উদ্-যাপনে মতিকে যে কত বিপদ, কত বাধা অতিক্রম করিতে হইল, তাহার সীমা নাই। কিন্তু মতি তাহাতে দমিল না। সে অজেয় মনের বল লইয়া, নির্ভীকতার সঙ্গে এমনি ভাবেই আপনার কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে লাগিল যে, সমস্ত বাধা বিঘ্ন, মদ-গর্ব্বিত ধনীর ভ্রূকুটী কোথায় উড়িয়া গেল! সাফল্য আসিয়া তাহাকে অভিনন্দন

করিল। গ্রন্থকার স্বদেশ প্রেমিক। 'আবার তোরা মানুষ হ।' ইহাই যে স্বদেশ প্রেমের মূলকথা। ইহা তিনি জানেন। তাই মতি চরিত্রের মানুষ গড়িবার এই কর্ত্তব্য জ্ঞানটুকু ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দেশের বর্ত্তমান অবনতাবস্থায় বাঙ্গালার পুরুষদের পক্ষে এর চেয়ে মহত্তর কর্ত্তব্য আর কি আছে? বাঙ্গলায় কবে মতির মত চরিত্রের আবির্ভাব হইবে।

মতি চরিত্র এমনি সুকঠিন পবিত্রতায় সমুজ্জ্বল হইয়াছে যে, একটা ভ্রষ্টা নারীর চরিত্রের মলিনতাও ইহার সংশ্রবে আসিয়া আলোকজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ভ্রষ্টা চরিত্রা হরিদাসী যখন লালসার ক্ষুধা লইয়া আসিয়া মতিকে জানাইল, 'আমি নিজের প্রাণের চেয়েও তোমায় ভালবাসী', তখন মতি উত্তর করিল, 'তাই যদি হয় তবে কেন আমাকে পাপে লিপ্ত করিতে চাও? যে যাকে ভালবাসে, সে কি তাকে নরকের পথে টেনে নিয়ে যায়?' এই একটী কথায় হরিদাসীর পাপজীবনের গতি ফিরিয়া গেল।—মতি-চরিত্র এমনি মহান্ ও পবিত্র!

বিস্তারিত আলোচনার যায়গা নাই। সুতরাং আলোচনা এইখানেই শেষ করি। আধুনিক উপন্যাসসমূহে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের যেরূপ বাড়াবাড়ি দেখা যায়, আলোচ্য গ্রন্থ সেরূপ নহে। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ইহাতে নাড়ী ভুড়ী চট্‌কাইবার বিরক্তিকর প্রয়াস নাই। বেশ ঝর-ঝরে সরল সুন্দর ভাষা। চিত্রগুলিও মন্দ ফুটে নাই। খুব অল্প কথায় তিনি চরিত্রগুলি ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এত অল্প কথায় যে, —আমাদের মনে হয়, তাহাতে আবশ্যক মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণও বাদ পড়িয়াছে।''...

এই সংখ্যায় গোলাম লতিফের 'শিশুখুসী' প্রসঙ্গে পুস্তককীট লিখেছেন: ''ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখিবার প্রলোভন ত্যাগ করিয়া আমরা লেখককে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ করিতেছি।'' ঐ সংখ্যাতেই আবু মঞ্জুর মোহাম্মদ ইয়াহিয়া-র কবিতার বই 'অনুভূতি' প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন: ''কবিতার পুস্তকের মলাটের উপর ভারতবর্ষের ইংরাজী ম্যাপ দেওয়ার আবশ্যকতা কি, এর সঙ্গে তার অনুভূতির কোন সম্পর্ক আছে কিনা, তাহা আমরা বহু গবেষণা করিয়াও বুঝিতে পারিলাম না।'' কবিতার আলোচনাংশও কৌতুক-উদ্দীপক: ''লেখক 'বন্দনা' শীর্ষক পুস্তকের প্রথম কবিতার এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

'দেহ শক্তি অনুরক্তি লিখিতে কবিতা
অচল নিশ্চল আমি নির্ব্বাক অক্ষম
শতত বাসনা হৃদে লিখিব বলিয়া
দেহ শক্তি লিখিবারে করি অনুকম।'

'অচল নিশ্চল আমি নির্ব্বাক অক্ষম।' তাই যদি লেখকের ধারণা, (তাঁর এ ধারণা যে সত্য, সে সম্বন্ধে তার সঙ্গে সাক্ষ্য দিতে আমরা রাজী আছি।) তবে কেন অনর্থক কাগজের উপর কালী কলমের এ আঁচড়? কেন কবিতা লিখিবার জন্য এ অশোভন ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি? 'শক্তি ও অনুরক্তি (?)' ভিক্ষা করিবার প্রবৃত্তিকে সম্বল করিয়া কবিতা লেখা যায় না। 'শতত (?) বাসনা হৃদে' থাকিলেও কবি হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। খোদা সকলকেই কবিত্ব শক্তি দিয়া দুনিয়ায় পাঠান না। 'অনুকম' কি? অনুকম্পা? 'অক্ষমের'র সহিত মিল দিবার জন্য যিনি 'অনুকম্পা'কে 'অনুকম' করিতে পারেন, তার অসাধ্য কাজ কিছুই নাই।''

আলোচনার শেষ গ্রন্থ খোন্দকার গোলাম আহমদের 'আজমীর ভ্রমণ' প্রসঙ্গে 'পুস্তক কীটের' মন্তব্য : ''সুলিখিত পুস্তক। নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ।''

৪ : ১১, বৈশাখ ১৩৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে, মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ-র 'পারস্য প্রতিভা' গ্রন্থের আলোচনা। সমালোচকের নাম নাই। গ্রন্থটি সম্বন্ধে সমালোচক লিখেছেন :

''এই গ্রন্থে ফের্দৌসী, ওমর খাইয়াম, সাদী, হাফেজ ও জালালুদ্দীন রুমী, এই পাঁচ জন পারস্য-কবির জীবন-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ইহা গ্রন্থের ১ম খণ্ড। ২য় খণ্ড এখনো প্রকাশিত হয় নাই। অল্পদিনের মধ্যেই বই খানার ২য় সংস্করণ হইয়াছে। ইহা দেখিয়া মনে হয়, বাঙ্গালী পাঠক ইহার আদর করিতে পরান্মুখ হন নাই।

বাস্তবিকই ইহা বাঙ্গলা সাহিত্যামোদীগণের একখানা পরম আদরের গ্রন্থ হইয়াছে। গ্রন্থকার যে ভাবুক এবং কবিত্বরস সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান যে অসামান্য তাহার পরিচয় তাঁহার গ্রন্থের প্রতি ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। এই গ্রন্থদ্বারা তিনি বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের সহিত পারস্য কাব্য-সাহিত্যের যে যোগ-সূত্র স্থাপন করিলেন, তজ্জন্য চিরদিন বাঙ্গলা সাহিত্য তাঁহার নিকট ঋণী থাকিবে। পারস্য কাব্য-সাহিত্যের আলোচনা বিশ্বের বিভিন্ন সাহিত্যে বহু পূর্ব্ব হইতেই হইতেছে এবং তাহার ন্যায্য আসন বিশ্ব সাহিত্যে সে বহু পূর্ব্বেই পাইয়াছে। বিশ্বের বিভিন্ন নামজাদা সাহিত্যে পারস্য সাহিত্য সম্বন্ধে যে আলোচনা হইতেছিল, তাহারই ছিঁটে ফোঁটা লাভ করিয়া বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণ এ যাবৎ দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইতেছিলেন। বরকত উল্লাহ্ সাহেব তাঁহাদের সে স্বাদ পূর্ণ করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্য সমাজের চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হইলেন।

এই গ্রন্থে উপরোক্ত পারস্য কবি-পঞ্চকের জীবনকাহিনীই আলোচনা করা হইয়াছে, তাঁহাদের কাব্যালোচনা স্থান পায় নাই। খুব সম্ভব তাহা ২য় খণ্ডে স্থান পাইবে। কিন্তু তথাপি গ্রন্থকারের আলোচনার ভঙ্গীতে ইহাতে কাব্যালোচনার আস্বাদই পাওয়া যায়। গ্রন্থকার কবিপঞ্চকের জীবন-কাহিনী এরূপ লিপিকুশলতার সহিত বিবৃত করিয়াছেন যে, তাঁহাদের কাব্য-জীবন যেন আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়া সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে। এই আলোচনায় কবিগণের বাস্তবজীবনের অনেক খুঁটীনাটী তথ্যই হয়ত বাদ পড়িয়া গিয়াছে কিন্তু তাহাদের কাব্য-জীবন আমাদের চোখের সাম্‌নে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ কবি-জীবন আলোচনার সার্থকতাই এইখানে। কবি-জীবনীতে তাঁহার কাব্য জীবনের আলোচনাই অধিক দরকার, তাঁহার সাংসারিক বাস্তবজীবনের খুঁটীনাটী পরিচয়ের তত দরকার নাই। কারণ সাংসারিক বাস্তবজীবনে মানুষের-অন্তরের সন্ধান পাওয়া কঠিন, যেহেতু তাহা প্রায়ই কৃত্রিমতাপূর্ণ; কিন্তু কাব্য-জীবনে এ মেকী চলিতে পারে না, কারণ কাব্যেই কবির অন্তর ফুটিয়া উঠে। তাই বরকতউল্লাহ্ সাহেব কবি-জীবনীতে তাহাদের কাব্য-জীবন আলোচনায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়া অত্যন্ত সঙ্গত কাজ করিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে, কাব্যই কবি জীবনের মর্ম্মকথা। বিষয় নির্ব্বাচনে তিনি যেমন সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিবৃত করিবার ভাষা নির্ব্বাচনেও তিনি কম সুবিবেচনার পরিচয় দেন নাই। এমন কবিত্বপূর্ণ ভাষায় তিনি এই কবি-জীবন আলোচনা করিয়াছেন বলিয়াই ইহা এমন সুন্দর হইয়াছে। উপসংহারে আমরা শশাঙ্ক মোহনের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—'কবির কেবল চরিত্র কাহিনী দিয়াই ক্ষান্ত হইলে চলিবে না—উহাদের প্রত্যেকের কাব্যের বিশিষ্ট 'প্রাণ'টুকু তাঁহাদের কাব্যকে নির্ম্মথিত করিয়া বাঙ্গালীর সমক্ষে ধরিতে হইবে।' আমরা সেই আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।''

৪ : ১২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ সংখ্যায় নামহীন সমালোচক 'প্রেমকথা' শীর্ষক লায়লীমজনুর প্রেমকাব্য রচয়িতা সৈয়দ আবুল খয়ের মোহাম্মদ শামসুর রহমান আল যালালীকে 'কাব্য লেখা ছাড়িয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশের' পরামর্শ দিয়েছেন। ঐ সংখ্যায় তিনি 'ফারুক চরিত' (হজরত ওমরের জীবনী) রচনার জন্য নাজির আহমদ চৌধুরীকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। তবে ঐ সংখ্যার উল্লেখযোগ্য আলোচনা কবি গোলাম মোস্তফার কাব্য 'হাস্না-হানা' বিষয়ক। সমালোচক লিখেছেন :

"ইহা কবি গোলাম মোস্তফা সাহেবের দ্বিতীয় কবিতা পুস্তক। তাঁহার প্রথম কাব্য-গ্রন্থ 'রক্তরাগ' পড়িয়া আমরা এক রকম নিরাশ হইয়াছিলাম। তবে কবিতা লিখিবার শক্তি যে তাঁহার আছে, তাহা 'রক্তরাগ' পড়িয়া বুঝিতে পারা গিয়াছিল। 'রক্তরাগে' তাঁহার যে শক্তি 'ফুটে ফুটে ফুটে না' অবস্থায় দেখিয়াছিলাম, 'হাস্নাহানা'য় তাহা অনেকটা ফুটিয়াছে বলিয়া মনে হইল। কবি গোলাম মোস্তফার কাব্য-সাধনা ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহা আমরা আজ আনন্দ সহকারে ঘোষণা করিতেছি। 'হাস্নাহানা'র মুখবন্ধের কবিতাটি আমাদের চমৎকার লাগিল। তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

'আলোক যখন বিদায় মাগে অস্ত-রবির রক্ত-পথে
সন্ধ্যারাণী আঁচলখানি উড়িয়ে চলে পল্লীপথে,
মুখর ধরা স্তব্ধ যখন, কুঞ্জ-ঘেরা আঁধার জালে
হাস্নাহানার প্রেম-অভিসার সেই আঁধারের অন্তরালে!
বুকের মুখের লাজ-আবরণ তখনি তার যায় যে খুলে
মিলন-আশায় উছ্‌লে ওঠে যে সুধা রয় মর্ম্মমূলে!'

শুধু এই মুখ-বন্ধের কবিতাটিই নহে, পুস্তকের ভিতরেও স্থানে স্থানে সুন্দর জিনিষ আছে। 'প্রিয়তমা' শীর্ষক কবিতার এক স্থানে আছে,—

'অনিন্দ্য সুন্দরী সেই নিখিলের চিররূপ -রাণী
সেই মোর প্রিয়তমা! এ হৃদয়খানি
তাহারেই সঁপে দিচ্ছি অতীতের কোন্ আদিকালে,
এ জীবন বাঁধা আছে তারি কাছে চির প্রেম জালে।'

সৌন্দর্য্যের মূল উৎস যে কবি খুঁজিয়া পাইয়াছেন, তাহা উপরি উক্ত কয় লাইনেই বেশ বুঝিতে পারা যায়।

'হাস্নাহানা'র সব কবিতাই প্রেমমূলক। কিন্তু প্রেম সম্বন্ধে কবির ধারণা এখনো দেহ ছাড়াইয়া উর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই। দৈহিক প্রেমের গানেই কবি এখনো মশ্‌গুল! দৈহিক প্রেমবর্ণনা-প্রসঙ্গেও যে প্রেম দেহ ছাড়াইয়া উর্দ্ধে উঠিয়া আত্মবিসর্জ্জনের পর্য্যায়ে উন্নীত হইতে পারে, তাহার পরিচয় এ কাব্য-গ্রন্থে নাই। মোট কথা, প্রেম সম্বন্ধে সর্ব্বোচ্চ আদর্শের ধারণার পরিচয় তিনি এ কাব্যে দিতে পারেন নাই। তার 'মিলন-স্মৃতি' কবিতার এক স্থানে আছে,—

'বাঁধিলাম তনুখানি মোর দুটী বাহুর বন্ধনে
বুকে তুলে নিনু তোমা সুনিবিড় প্রেম-আলিঙ্গনে!
খুলে দিনু কেশ-পাশ, ফেলে দিনু লাজ আবরণ!
সারা অঙ্গে পরালাম নগ্নতার চারু আভরণ!

কতবার কত ভাবে চোখে-মুখে দিলাম চুম্বন
বাহুর বিপুল বলে বক্ষে তোমা করি নিপীড়ন!
কোথায় লুকায়ে তোমা রাখিব যে,—ভেবে নাহি পাই!
যত পাই তত যেন মনে হয় আরো বেশী চাই!'

ইহাতে দৈহিক লালসার যে রাক্ষসী মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা কি সর্ব্বজন সমক্ষে দেখাইতে আছে? এ চিত্র ভারতচন্দ্রের যুগে মানাইত ভাল এবং বিদ্যাসুন্দরের 'বিহারে'র চিত্রের পাশে স্থান-লাভেরও হয়তঃ যোগ্য হইতে পারিত। কিন্তু এই যুগে ইহা কাহারো রুচিকর হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই।

'পাষাণী' শীর্ষক সুদীর্ঘ ও এ-যাবত লিখিত কবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতার ভিতরে প্রেম আত্মবিসর্জ্জনের চিত্র আঁকিবার অবকাশ ছিল। কিন্তু কবির চিত্ত এমনই দৈহিক লালসা ক্ষুধাতুর যে, উন্নত কল্পনা তাঁহার চিত্তে জাগিতে পারে নাই। কবির প্রিয়ার যখন অন্যত্র বিবাহ হইয়া গেল, তখন কবি বালকের ন্যায় পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিলেন এবং প্রিয়ার উদ্দেশ্যে ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিলেন,

'সেই পূজারীরে
কী দিয়াছ প্রতিদান? কোন দিন চেয়েছ কি ফিরে
অভাগার মুখ পানে?
বুঝেছ কি কোন দিন কী বেদনা প্রাণে
বাজিছে নিয়ত তার?'

আবার—

'হায় প্রাণহীণা!
ধনজন লঙ্কার—এই হল কিনা
তোমার চরম পাওয়া? এ ছাড়া কি আর কিছু নাই?
বল প্রিয়া, শুনি আজি তাই?
একটা জীবন কিংবা একটা হৃদয়
সে কি কিছু নয়?'

এইরূপে অনেক কাঁদা-কাটি করিয়া একটুখানি সান্ত্বনা লাভ করিবার পর কবির প্রাণে আত্মবিসর্জ্জন-স্পৃহা জাগিয়া উঠিল। অতঃপর কবি তাঁর প্রিয়াকে অভিশাপ দিলেন,—

'পাষাণি! পাষাণি! তুমি সুখী হও,
চির-জনমের মত মোরে ভুলে রও
তোমার সুখের স্রোতে তুমি ভেসে যাও
তুমি যাহা চাহিয়াছ মনে প্রাণে তাই যেন পাও!

* * *

এ জগতে তুমি মোর কতখানি ছিলে যে আপন
কত যে বিনিদ্র নিশি তোমা তরে করেছি যাপন,
সে-সকল কথা আজি মিথ্যা হয়ে যাক
সব যেয়ে শুধু তব সুখ জেগে থাক্।'

বাস্তবিক, কাব্যহিসাবে এ অভিশাপের চিত্র অতি সুন্দর! সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া শুধু প্রিয়ার 'সুখ'—কামনায় যে গভীর প্রেমের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার চমৎকারিত্ব বলিয়া বুঝানো যায় না। এই খানেই যদি এই কবিতা শেষ হইত, তাহা হইলে 'পাষাণি' বঙ্গ-সাহিত্যের একটী উৎকৃষ্ট কবিতা হইতে পারিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কবির এ আত্মবিসর্জ্জনের আকাঙক্ষা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। কবি বলিতেছেন,

'যদি কেয়ামতে
আকস্মাৎ দেখা হয় চোখে চোখে কভু কোনমতে
ও পাষাণ বুকে যদি জাগে ব্যথা বোধ
অনুতাপে-গলে-যাওয়া আঁখিজল যদি নাহি মানে রোধ,

*　　　*　　　*

তবু এই পণ—
কহিব না কোন কথা ভুলেও তখন।

*　　　*　　　*

কহিব না কথা—
চিরতরে মূক হয়ে রল মোর এই মনোব্যথা'।

আত্মবিসর্জ্জন-মূলক প্রেম আর এখানে নাই। বালক সুলভ অভিমানের সঙ্গে সঙ্গে আবার কবির মনে দেহের ক্ষুধা জাগিতেছে। ফলে কবির আগের আত্মবিসর্জ্জনের গৌরবটুকু এতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নতুবা যত 'সুখ'-টুকু জাগিয়া থাকিবার কামনা কবি ইতিপূর্ব্বে করিয়াছিলেন, মরণের পরেও তার প্রতি এ তীব্র অভিমান তাঁহার থাকিবে কেন? মরণের পরে—অভিমান দৈহিক লালসার অতীত স্থানে কবির এই অভিমান দেহের ক্ষুধার নামান্তর নয় কি?

'পাষাণী'তে একটা মৌলিক উপমা আছে।—

'রাজ-কর্ম্মচারী যথা রাজপথে কর্ম্মে দাঁড়াইয়া
নীরবে চাহিয়া দেখে মৌন দু'টী আঁখি বাড়াইয়া
স্বদেশ-নেতার মৃত্যু-সমাধির বিপুল মিছিল,
যোগ দিতে পারে না'ক, তবু তার কেঁদে যায় দিল—'

কাব্যে আমরা ইতিপূর্ব্বে এরূপ পুলিসী উপমা কখনো দেখি নাই। সেই হিসাবে এ উপমা সম্পূর্ণ মৌলিক, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু সঙ্গীন-স্কন্ধ পুলিস কাব্যে আসিয়া এ উপমার রস নষ্ট করিয়াছে কিনা, তাহা পাঠকই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। যাক, এ সমস্ত সত্ত্বেও 'পাষাণী' কবিতা উপভোগ্য হইয়াছে।

আলোচনা দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে। উপসংহারে আমাদের বক্তব্য, আমরা 'হাস্নাহানা' পড়িয়া মোটের উপর সুখী হইয়াছি এবং অসংখ্য দোষ-ত্রুটী সত্ত্বেও কবির ক্রমবিকশিত শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় ইহাতে পাইয়াছি। 'শ্যালিকা' শীর্ষক কবিতাটী এ কাব্যে সংযোজনের যোগ্য হয় নাই। প্রার্থনা করি, কবির শক্তি দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হউক এবং তাহাতে দরিদ্র মুসলিম বঙ্গসাহিত্য উত্তরোদ্ধত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক। বইখানার ছাপা-কাগজ অতি সুন্দর!'

৫ : ২, শ্রাবণ ১৩৩৪ সংখ্যায় পুস্তক পরিচয় বিভাগের নাম হয়েছে 'নিকষমণি'। এই সংখ্যায় বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে শাহাদাৎ হোসেনের উপন্যাস 'রিক্তা' (মোহাম্মদ বুক এজেন্সি, কলকাতা)। 'রিক্তা'র ভূমিকায় শাহাদাৎ হোসেন লেখেন : ''কোন বিশিষ্ট সমাজের মধ্যে বাস করিতে হইলে ব্যক্তিগতভাবে বা সামাজিকভাবে সেই সমাজের বিধিনিষেধগুলি সাধ্যমতে মানিয়া চলা উচিত। যিনি তাহা না মানেন বা সমাজকে 'লোকাচার' মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, তিনি প্রকারান্তরে উচ্ছৃঙ্খল-তাকে প্রশ্রয় দেন। সমাজের বন্ধন ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সংযমের বাঁধ ধ্বসিয়া পড়ে ; তখন স্বেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করে এবং বে-পরোয়াভাবে তাঁহাকে ধ্বংশ-পরিণতির দিকে টানিয়া লইয়া যায়। ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য।''

উপন্যাসের 'আশরাফ' চরিত্রে লেখক তাঁর এই 'তত্ত্ব' প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন। এ সম্পর্কে সওগাতের নামহীন সমালোচক লিখেছেন :

''আর্ট বজায় রাখিয়া উপন্যাসে তত্ত্ব বুঝানো খুব শক্ত ব্যাপার। অসাধারণ কলাকুশলী শিল্পী ব্যতীত তাহা অপর কাহারো দ্বারা সম্ভবপর নহে। আমাদের মনে হয়, এই তত্ত্বকে পাঠক-সাধারণের চক্ষে স্পষ্ট করিতে গিয়া গ্রন্থকার বইয়ের উপসংহারভাগে ঔপন্যাসিক আর্ট কিঞ্চিত ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। সমস্ত বইখানা একটানা আগ্রহে পড়িয়া আসিয়া উহার উপসংহারভাগে 'তত্ত্বের' উলঙ্গ প্রকাশ দেখিয়া সমঝদার পাঠক আনন্দা-নুভুতিতে বেশ একটু বাধা পাইবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

এই গ্রন্থের চরিত্রগুলি বেশ সজীব ও সুন্দরভাবে আঁকা হইয়াছে। তবে আনু সাহেব রোকেয়া ও আশরাফ চরিত্রের কোন কোন স্থানে প্রসিদ্ধ উপন্যাস-রচয়িত্রী শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর 'দিদি' উপন্যাসের হরবিলাস বাবু, সুরমা ও অমরনাথ চরিত্রের কিছু কিছু ছায়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইল। তা সত্ত্বেও উপন্যাস খানি উপভোগ্য হইয়াছে।''

৫ : ৫, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ সংখ্যায় শেখ ফজলুল করিমের 'আফগানিস্তানের ইতিহাস' (মজিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা) ও কে. এম. আজহারুল ইসলামের উপন্যাস 'আলোকের পথে' (মখদুমী, কলিকাতা) আলোচিত হয়েছে 'নিকষমণি' বিভাগে। প্রথমটি প্রশংসিত ও দ্বিতীয়টি নিন্দিত হয়েছে।

৬ : ৪, কার্তিক ১৩৩৫ সংখ্যায় আলোচিত হয়েছে কাজী নজরুল ইসলামের 'সঞ্চিতা' (ডি. এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা)। নামহীন সমালোচক লিখেছেন :

''ইহা কবির এ-যাবত প্রকাশিত সমস্ত কাব্যগ্রন্থের কতকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতার চয়নিকা। ইহাতে 'অগ্নিবীণা' হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে হালে প্রকাশিত 'বুলবুলের' গজলও উদ্ধৃত হইয়াছে। যাঁহারা কবির সমস্ত কাব্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই, অথচ তাহা পড়িবার দুর্দমনীয় আকাঙক্ষা পোষণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের আশা এই কাব্য-চয়নিকা 'সঞ্চিতা' পাঠে অনেকাংশে পূরণ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

এই একখানা গ্রন্থ পাঠ করিলেই কবির সর্ব্বতোমুখী কবিপ্রতিভার পরিচয় পাঠকের মনে দাগ কাটিয়া বসিবে। একত্র এত রসের সমাবেশ বাঙ্গলার আর কোন কবির রচনার মধ্যে আছে বলিয়া আমাদের ধারণা নাই। যাঁহার লেখনি হইতে 'বিদ্রোহী'র

ভৈরব নাদ বাহির হইয়াছে, তাঁহারই কণ্ঠে গজলের বীণা-নিক্কণ বাজিয়াছে, ইহা ভাবিলে সত্যই, অবাক হইতে হয়—আর এই যুগ-প্রবর্ত্তক প্রতিভার শক্তির অসামান্যতার সম্মুখে সব-রকম বাক্‌-চাতুরী স্তব্ধ হইয়া যায়। এই কবির প্রতিভার যেন কোনরূপ থৈ পাওয়া যায় না,—নিরীহ পাঠক বেচারীকে বারবার বিস্মিত ও চকিত করিয়া সে যেন আপন মনে অভিনব হইতে অভিনবতর পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। 'বিদ্রোহী' পাঠে পাঠকের মনে বিস্ময়ের যে ঘোর সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা কাটিতে না কাটিতে তাঁহার 'পূজারিণী' নূতন বিস্ময় লইয়া উপস্থিত হইল। 'পূজারিণী'র পরে 'সাম্যবাদী' পাঠককে আর এক নূতন বিস্ময়ে অভিভূত করে। সব চেয়ে পাঠককে আশ্চর্য করিয়া দিয়াছে —কবির গজল-গান। এ যেমনি অনুপম, তেমনি অভাবিতপূর্ব্ব!

কবির প্রতিভার এই অপূর্ব্বতার কারণ তাঁর চির-তরুণ চির-নূতন, দুর্দমনীয় আবেগশালী যুবক-মন। এই যুবক-মনের ধর্ম্মই হইতেছে—অতৃপ্তি, অশান্তি. Passion এবং Intense feeling. কাব্যের সজীবতার লক্ষণও ইহাই। নজরুলের কাব্যে এই সমস্ত লক্ষণই পূর্ণভাবে বিদ্যমান। তাই তাঁর কাব্যে জরাজীর্ণতা ও বার্দ্ধক্যের কোন চিহ্নই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কবি মন যখন তৃপ্তিতে ভক্তিগদগদ হইয়া উঠে, তখন আর তাহার মধ্যে কাব্য থাকে না,—যাহা থাকে, তাহা কাব্য নয়—Philosophy. বাঙ্গলা সাহিত্যে অনেক Philosophy ই আজকাল শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহাতে ভাবের গভীরতা হয়ত সুপ্রচুর আছে, কিন্তু কাব্যের সজীবতা খুব কমই আছে। নজরুলের কাব্যে ভাবের গভীরতা, চিন্তার সূক্ষ্মতা হয়ত কম আছে, কিন্তু কাব্যের সজীবতার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ যৌবন লাবণ্য—Passion ; Intense feeling, অতৃপ্তি—সুপ্রচুর আছে—যাহা বাঙ্গলার আর কোন কবির কাব্যে এত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আর পাওয়া যায় না।"

এ ছাড়া এই সংখ্যায় আছে (৬ : ৪) আবদুল লতীফের 'জেবন-নেসা বেগম' (মোসলেম পাব্লিশিং হাউস , কলকাতা), আবুল হুসেনের 'বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা' (মডার্ণ লাইব্রেরী, ঢাকা) ও এস. ওয়াজেদ আলির গল্পগ্রন্থ 'গুলদাস্তা' (ইসলামিয়া আর্ট প্রেস, কলিকাতা) গ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য। ৬ : ৫ সংখ্যায় একই ভাবে সংক্ষেপে মন্তব্য করা হয়েছে আবুল হুসেনের 'মুসলিম কালচার' শীর্ষক অনুবাদগ্রন্থ সম্পর্কে। এটি মার্মাডিউক পিকথলের একটি বক্তৃতার অনুবাদ। অনুবাদটি 'সওগাতে'র পঞ্চম বর্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

৬ : ৯, চৈত্র ১৩৩৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় বিনয়কুমার সরকারের 'ধনদৌলতের রূপান্তর' গ্রন্থের আলোচনা, 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগে। আলোচকের নাম নেই। অধ্যাপক বিনয় সরকারের গ্রন্থটি লাফর্গের গ্রন্থাবলম্বনে রচিত। সওগাতের সমালোচক গ্রন্থ-প্রসঙ্গে লিখেছেন : "গ্রন্থটি ফরাসী-পণ্ডিত ' ' ' লাফার্গের রচিত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। কিন্তু ইহার তর্জমার বিশেষত্ব আছে। তর্জ্জমাগুলি খাঁটি আক্ষরিক অনুবাদ নয়। গ্রন্থকার 'নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর' এবং জার্ম্মাণীর ফ্রেডারিক লিষ্ট প্রণীত 'স্বদেশী ধনবিজ্ঞান' গ্রন্থের ঐতিহাসিক অধ্যায়গুলির অনুবাদে যে-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, এক্ষেত্রেও তাহাই করিয়াছেন। মূল গ্রন্থকারদের প্রত্যেক তথ্য বজায় রাখা হইয়াছে, একটি তথ্যও নিজের তরফ হইতে জুড়িয়া দেওয়া হয় নাই। তাঁহাদের প্রত্যেক যুক্তি যথারীতি রক্ষা করা হইয়াছে, সমালোচনার ওজর করিয়া অথবা বিশদরূপে বুঝাইবার ছলে একটা যুক্তিও বেশীর ভাগ বসাইবার প্রয়াস করা হয় নাই। মূল গ্রন্থকারকে বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালী পাঠকের জন্য বাংলা ভাষায় লিখিতে হইলে ১৯২৪ সালে যে-ধরনের বোল-চাল ও লিখন-কায়দা ব্যবহার করিতে হইত সেই বোলচাল এবং লিখন-কায়দাই এই অনুবাদ-গ্রন্থ দুইটায় কায়েম করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

কার্ল মার্কস্ প্রণীত 'ক্যাপিটাল' (মূলধন) গ্রন্থ লাফার্গের চিন্তার বেদ বাইবেল-স্বরূপ। কার্লমার্কসের মতে মানুষের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আত্মিকজীবন তাঁহার ধনোৎপাদন-প্রণালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। নর-নারীর নীতিশাস্ত্র, অর্থাৎ আইন-কানুন এবং রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থা সমস্তই মানব-সমাজের আর্থিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত।

ভাত-কাপড়ের বিধি-ব্যবস্থা অথবা জীবনের আর্থিক সমস্যা যাঁহারা আলোচনা করেন না, তাঁহারা কোনো জাতির দর্শন, ধর্ম্ম, সুকুমার-শিল্প, সাহিত্য. রীতি, নীতি, জাতিভেদ, দলাদলি, জমিদারী, মহাজনী, আচার, বিচার, আইন, আদালত, পুলিশ—প্রভৃতি পুরাপুরি বুঝিতে অসমর্থ। ইহার নাম 'ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা' অথবা 'সভ্যতার বাস্তব ভিত্তি'। লাফার্গের চিন্তায় আর একজন পণ্ডিত যুগাবতার বিশেষ ইনি ইয়াঙ্কি নৃতত্ত্ববিদ মর্গ্যান। ধন-বিজ্ঞান বিষয় আলোচনায় মার্কস যে সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, সেই সিদ্ধান্তেই মর্গ্যানও নৃতত্ত্ব আলোচনার পথে স্বাধীনভাবে আসিয়া ঠেকিয়াছেন। মার্কস্ মর্গ্যানের সমাজ-দর্শন বর্ত্তমান জগতের অন্যতম বিশেষত্ব।

ফ্রেডেরিক এঞ্জেলস্ প্রণীত 'পরিবার গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র' লাফার্গের ধন-দৌলত বিষয়ক রচনার অগ্রদূত। এঞ্জেল্সে যে সকল তথ্য আংশিকরূপে আলোচিত হইয়াছিল, সেই গুলার উপর সূক্ষ্মদৃষ্টি দেওয়াই লাফার্গের উদ্দেশ্য। মার্কস্-মর্গ্যানের সমাজদর্শন এই দুই কেতাবের সাহায্যে অনেকটা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

এই নবীন সমাজ-চিন্তার সহিত যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা লাভ করিতে হইলে, এই দুইখানা বই ঘাঁটা দরকার। এই বুঝিয়াই গ্রন্থকার উক্ত দুইটী গ্রন্থ একসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন।

'ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা' বর্ত্তমান জগতের নবীনতম সমাজ-চিন্তার অন্যতম বিশেষত্ব। ইয়োরামেরিকান দার্শনিকেরা আজ এই প্রণালীতেই মানবজীবন বিশ্লেষণ করিতে অভ্যস্ত। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যে ইহার ছায়াপাত হয় নাই বলিলেই হয়। ভারতের অন্য কোন ভাষাতেও এ সম্বন্ধে আলোচনা কিছুই হয় নাই। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া গ্রন্থকার যে বিদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহার রিপোর্ট তিনি 'বর্ত্তমান জগৎ' নামক কয়েকখানি গ্রন্থে প্রায় চার হাজার পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা এই বিপুল আন্দোলনের কর্ম্ম কাণ্ড বিশেষ। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-কাণ্ডের সহিতও পরিচয় থাকা দরকার। তাই শ' পাঁচেক পৃষ্ঠা তর্জ্জমা করিয়া 'ধন-দৌলতের রূপান্তর' ও 'পরিবার গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র' নামক দুইখানি বইয়ের মারফৎ গ্রন্থকার এই জ্ঞান-কাণ্ডের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন।

আজ যে ভারতের জাতীয় জীবনে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, শূদ্র-ব্রাহ্মণ সমস্যা প্রভৃতি হাজার সমস্যা ও দলাদলির সৃষ্টি হইয়া উন্নতির পথে নানা বিঘ্ন ঘটাইতেছে, সেগুলির প্রকৃত স্বরূপ কি, ও সেগুলি দূর করিবার উপায় কি, সে সম্বন্ধে এই গ্রন্থখানি যথেষ্ট সাহায্য করিবে বলিয়া মনে হয়। এই বইয়ে লিখিত লাফার্গের তথ্য ও ব্যাখ্যাগুলি আমাদের দেশের বর্ত্তমান বিভিন্ন সমস্যা গুলি সমাধানকারীদের অনেকখানি নূতন আলোক দেখাইয়া দিবে।

যুবক ভারতের উন্নতির জন্য আজ সব চেয়ে বেশী দরকার হইয়া পড়িয়াছে বিশ্ব-পরিচয়; সারা বিশ্বের কর্ম্মপ্রণালীর ও চিন্তা-ধারার সহিত ভারতবাসীর যোগাযোগ রাখিতে হইবে। এইরূপ অনুবাদ-গ্রন্থের যত বেশী প্রচার হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।''

এই সংখ্যায় আরো কয়েকটি গ্রন্থ সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। সেগুলোর নাম: মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলামের 'হজরতের অমৃত বাণী' (ইউনিভার্সল লাইব্রেরী, কলিকাতা, মোহাম্মদ আবদুর রশীদের মুসলমানগিরে অর্থসংকট ও তাহার প্রতিকার (ফরিদপুর) ও এ. জেড. নূর আহমদের পত্রগুচ্ছ 'স্মৃতির দুল'।

৬ : ১০, বৈশাখ ১৩৩৬ সংখ্যায় আলোচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শাহাদাৎ হোসেনের 'পথের দেখা' উপন্যাস (মিনার কোং, কলিকাতা)। এ ছাড়া ঐ সংখ্যায় আলোচিত হয়েছে সিরাজুল ইসলামের 'মোসলেম সমাজ ও সুদসমস্যা' (মুন্সীগঞ্জ), এম. আবদুর রহমান চৌধুরীর উপন্যাস 'আশঙ্কা' (সিরাজগঞ্জ), ও ওষ্মান গ'নীর 'পঞ্চমণি' (বর্ধমান)। নামহীন সমালোচক শাহাদাৎ হোসেনের উপন্যাস 'পথের দেখা' প্রসঙ্গে লিখেছেন:

''গ্রন্থকার আলোচ্য উপন্যাসখানিতে সমাজের একটী দুরূহ সমস্যা সমাধান করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। গ্রন্থের নায়িকা 'নীলিমার' ভিতর দিয়া তিনি সমাজের অত্যাচারে গৃহ-তাড়িতা ও পরাশ্রিতা নারীর একটী করুণ মধুর চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, 'নীলিমা' সুন্দরী কুমারী রঙীন আশা-আকাঙক্ষায় তাঁহার সমস্ত অন্তর ভরপুর, কিন্তু কালের কঠোর কটাক্ষে যৌবন-প্রভাতেই তাহার সে-আশার স্বপ্ন টুটিয়া গেলো, সংসারের অবিরাম ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে সে নিজেকে হারাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিল, এমন সময় তাহার জীবন-পথের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল আজাদ। এই 'আজাদ'কে লইয়াই তাহার জীবনে আবার নূতন বিবাদ শুরু হইল, সে বিবাদে নীলিমা যে ধৈর্য্য তেজ ও দৃঢ়তা নিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহাতে তাহার নিজের ত পদস্খলন হইলইনা, উপরন্তু পতনোন্মুখ আজাদকে তাহার জীবনাদর্শ উন্নয়নের পূর্বে সাহায্য করিল।

আজাদের চরিত্র দোষে ও গুণে লেখকের মৌলিক স্বষ্টি। প্রলোভন ও দুর্ব্বলতার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সে ক্ষত বিক্ষত। তাহার আহত প্রাণের আর্ত্ত অভিব্যক্তি পাঠকের মনকে করুণায় নমিত করিয়া আনে। অন্যান্য চরিত্র গুলিও স্থপরিস্ফুট, পাঠকের মনে একটা স্থায়ী ছাপ আঁকিয়া দেয়।''

৬ : ১১, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ সংখ্যার 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগে অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে, আলোচিত হয়েছে মোহাম্মদ এনামুল হকের কাব্যগ্রন্থ 'ঝর্ণাধারা' (কোহিনূর লাইব্রেরী, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম)। গ্রন্থটি সম্বন্ধে সমালোচকের মন্তব্য বেশ রূঢ়:

''পারস্য কাব্যসাহিত্যের বিচিত্র খণ্ড কবিতা বিশেষের নাম—'রুবাই'। বাঙ্গালা সাহিত্যে পার্শী ও উর্দ্দু রুবায়ীর সামান্য কিছু অনুবাদ মাত্র হইয়াছে, কিন্তু বাংলার রসধারা ও ভাব-বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন রাখিয়া রুবায়ী-রচনার কোনো 'মৌলিক প্রচেষ্টা' আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। গ্রন্থকার আলোচ্য পুস্তিকায় সে চেষ্টা করিতে গিয়াছেন।—রুবায়ী রচনার একটা বিশেষ নিয়ম আছে: চারটী ছত্রে ইহার গাঁথুনি—তাহাতে মাত্র একটী ভাবকে রূপদিতে হয়, প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইনে মিল দেওয়া বাঞ্ছনীয়, তৃতীয় লাইনটী অমিল রাখিতে হয়,—'ঝর্ণা-ধারার' রচয়িতা এই বিশেষ ঢঙটীর দিকে লক্ষ্য দেন নাই, তাই তাঁহার রচিত খণ্ডকবিতাগুলিকে 'রুবায়ী' নামে আখ্যাত করা যায় কিনা, তাহা বিচার সাপেক্ষ।

সাধারণ-নীতিতেই তিনি যে-ভাবে মিল দিয়াছেন, তাহাতেও স্থানে স্থানে ক্ষমার অযোগ্য অক্ষমতার পরিচয় আছে;—

'বলছি সখি! আসুক তারা আমার বুকের ফুল-বনে
ফাগ-মাখা তোর স্মৃতিকণা দোল্ দিয়ে যায় সেই বনে।'
'আমায় যেজন করিল শাসন পরাজয় জয়ে, সেইত জয়ী,
তারে ছাড়া আমি জানিনা জাহানে থাকে যদি কেহ ভুবন-জয়ী!'

তাঁহার ভাব-প্রকাশ মোটেই অপ্রচ্ছন্ন নয়; ছন্দঃ পতনও যথেষ্ট। পুস্তিকার গঠন-পরিপাট্য ও ছাপা তত সুন্দর নহে।"

৬ : ১২, আষাঢ় ১৩৩৬ সংখ্যায় অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় প্রদান করা হয়েছে মোহাম্মদ আলীর সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থের। সমালোচনায় গ্রন্থকার ও সমালোচক উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করা যায়। সমালোচক লিখেছেন :

"এই ক্ষুদ্র বইটিতে লেখক বঙ্গীয় মুসলমান-সম্প্রদায়ের সাহিত্য রক্ষার উপায় নির্দ্দেশ করিতে গিয়া আমাদের কয়েকটি অর্থনৈতিক সমস্যারও অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু কথাগুলি এত সংক্ষিপ্ত এবং তাড়াতাড়িতে ব্যক্ত হইয়াছে যে, কোনটারই সমাধান তিনি দিতে পারেন নাই। মুসলমানদিগকে অমুসলমান-সাহিত্য পাছে পাইয়া বসে, মুসলমান স্কুল-কলেজে-পড়ুয়া-ছেলেদের ভয়ে সমাজের আলেমগণকে 'তওবা' 'তওবা' বলিয়া রাস্তা ছাড়িয়া পলাইতে হয়, এই ভয়ে লেখক ভীত। এই সব সমস্যার তিনি যে-সব সমাধান দিয়াছেন, তন্মধ্যে বাংলা দেশের মুসলমান-মহলে দোভাষী পুঁথির প্রচলনই প্রধানতম। এইটা অবশ্য কাজের কথা, কিন্তু ইহাতেই কি এই জোয়ারের গতি রোধ করা যাইবে?"

৭ : ১, ভাদ্র ১৩৩৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের পরিচয়। প্রথম গ্রন্থটি 'মিসিস্ আর. এস. হোসেন' (বেগম রোকেয়া) রচিত ও প্রকাশিত উপন্যাস 'পদ্মরাগ'। গ্রন্থটি সম্পর্কে সমালোচক লিখেছেন :

"মিসিস্ আর. এস্. হোসেন সাহেবা বাঙ্লার সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিতা। বাঙ্লা-সাহিত্যে যিনি 'মতিচূরের' মতন গ্রন্থ আমদানী করিয়াছেন, তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভা এবং দান যে উপেক্ষার বিষয় নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্রী—'তারিণী-ভবণের' পরিকল্পনায় যে সমস্ত সামাজিক সমস্যার ও সমাধানের স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি সমাজের ক্ষতস্থান সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ, এবং তাহার সুস্থতা-লাভের জন্য তিনি অন্তরে যথেষ্ট বেদনা অনুভব করিয়া থাকেন। সিদ্দিকা খাতুন, মিসেস্ সেন, প্রমুখ যে সমস্ত নায়িকা-নায়কের চিত্র তিনি তাহাতে আঁকিয়াছেন, তাহা সুন্দর ও কলা-কৌশলময়।—গ্রন্থের ভাষা ঝর্ঝরে, ছাপা ভালো, বাঁধাই ও গঠন-পারিপাট্য সুন্দর। এই উপন্যাসখানি বাঙ্লার ঘরে ঘরে পঠিত হউক, ইহাই আমাদের কামনা।"

দ্বিতীয় গ্রন্থটির নাম 'নূরণ্নেছা গ্রন্থাবলী'। নূরণ্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিণী সাহিত্য-সরস্বতী প্রণীত (প্রকাশক—কজী গোলাম মোহাম্মদ, নুরকুটীর, শ্রীরামপুর) এ গ্রন্থ সম্বন্ধে সমালোচক লিখেছেন :

"নূরণ্নেছা খাতুন মুসলমান সমাজের একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখিকা। আলোচ্য 'গ্রন্থাবলী' তাঁহার—'স্বপ্নদৃষ্টা', 'জান্‌কী বাঈ বা ভারতে মোস্‌লেম বীরত্ব,' 'আত্মদান,' 'ভাগ্যচক্র', 'বিধি লিপি', 'নিয়তি'—এই ছয় খানা গ্রন্থের সমষ্টি। নূরণ্নেছা খাতুনের পূর্ব্বে বাঙ্লার মুসলমান-সমাজে পুরুষ বা নারী কেহই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন নাই, তিনি এই ক্ষেত্রে পথ-প্রদর্শিকা। তাই অগ্রদূতী হিসাবে তিনি যথেষ্ট সম্মান ও গৌরব লাভের

অধিকারিণী, সন্দেহ নাই। তাঁহার গ্রন্থরাজি পাঠ করিলে মনে হয় যে, তিনি আমাদের সামাজিক জীবন ভালো করিয়াই অধ্যয়ন করিয়াছেন, আমাদের দুঃখ-বেদনা অভাব-অভিযোগ বেশ স্পষ্ট ভাবেই তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে। তাঁহার 'আত্মদান' বইখানি আমাদের ভালো লাগিল।—'গ্রন্থাবলী'র প্রথম ভাগে গ্রন্থকর্ত্রীর ফটো সন্নিবেশিত হইয়াছে—ইহা কম দুঃসাহসের কথা নহে। গ্রন্থরাজির ভাষা কোথাও জড়িত নহে; ছাপা মনোরম। গ্রন্থাবলীর আকারের তুলনায় মূল্য অত্যন্ত কমই হইয়াছে, বলিতে হইবে।—আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।''

৭ : ২, আশ্বিন ১৩৩৬ সংখ্যায় মুখ্যভাবে আলোচিত হয়েছে কবি জসীমউদ্‌দীনের 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' কাব্যগ্রন্থ। সমালোচক প্রথমে লিখেছেন :

''নক্‌সী কাঁথার মাঠ'' একখানা কাব্য-গ্রন্থ। কবি পল্লীর দরিদ্র চাষী-জীবনের সুন্দর-করুণ একখানা ছবি পাঠক-সাধারণের সাম্‌নে ধরিয়াছেন। গাঁয়ের দরিদ্র চাষার ব্যথা-বেদনা ভরা সঙ্কীর্ণ জীবন ক্ষেত্রেও কত রোমান্স লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহার বিরল-অবসর জীবনেও কেমন করিয়া একদিন সকল সৌন্দর্য্যে চারিদিক পূর্ণ করিয়া বসন্ত জাগিয়া উঠে—প্রেমের পরশে তাহার মধ্যে নব-জীবনের সূচনা হয় এবং বসন্তের অবসানে দারুণ বিরহ-গ্রীষ্মের আবির্ভাবে কেমন করিয়া তাহার জীবন-বৃক্ষের সবুজ পাতাগুলি একটা একটা করিয়া ঝরিয়া পড়ে, জীবন-তাহার শাহারার আকার ধারণ করে—কবি তাঁহার নিপুণ তুলিকায় তাহাই সুন্দর ভাবে আঁকিয়া সাধারণের সাম্‌নে পেশ্ করিয়াছেন।

কাব্যখানার গল্পাংশ অতি ক্ষুদ্র হইলেও, বড় করুণ, বড় মধুর! কবির বর্ণনার ভঙ্গীতে ইহা আরো বেশী করিয়া মধুর হইয়া উঠিয়াছে।...''

এর পর উদ্ধৃতিসহযোগে বিস্তৃত কাহিনী পরিচয় দিয়ে উপসংহারে সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

''...কবি তাঁহার এই পল্লী-কাব্যখানিকে আগা গোড়া পল্লীর ভাষায়ই রচনা করিয়াছেন; পল্লীর ধানে-ঢাকা, জলে-ভাসা, গাছে-ছাওয়া সুন্দর দৃশ্যটি এই কাব্যের মধ্যে পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে দুই-চারিটি মুর্শীদ্যা গান, জারী-গান, ভাটিয়ালী গান সংযুক্ত করিয়া কবি কাব্যখানার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। পুস্তকের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের হইয়াছে। শিল্পী মনীষীদের আঁকা তিন-রঙা প্রচ্ছদ-পটখানা একখানা 'নক্‌সী কাঁথার' মতই সুন্দর হইয়াছে। আমরা তরুণ কবির এই অভিনব কাব্যখানার বহুল প্রচার কামনা করি।''

ঐ একই সংখ্যায় (৭ : ২) প্রকাশিত হয়েছে শাহাদাৎ হোসেনের কবিতাগ্রন্থ 'কল্পলেখা' (মোসলেম পাবলিশিং, কলিকাতা) সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য :

''কল্প লেখা' একখানা কবিতা-পুস্তক। অবতরণিকা, বসন্তের অভিসার, প্রেম রহস্য, কাল বৈশাখী, ভগ্ন-বীণা, সিন্ধু-রহস্য, উপেক্ষিত প্রভৃতি কবির লেখা প্রায় সবগুলি প্রথম শ্রেণীর কবিতাই এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

কবি শাহাদাৎ হোসেনের পরিচয় বাংলার কাব্য রসিক পাঠক মণ্ডলীকে আর নূতন করিয়া দিতে হইবে না; তিনি তাঁহার কাব্য প্রতিভার দ্বারা বহুদিন হইতেই পাঠক সাধারণের হৃদয় হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যে উদ্দীপনাময়ী সাবলীল ভাষার

গাঁথুনীতে তিনি তাঁহার কবিতার রূপ দিয়া থাকেন, তাহার সুরের রেশ কবিতা পাঠ করার পরও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পাঠকের কানের কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেন এক মায়া-লোকের সৃষ্টি করিয়া থাকে—ইহাই কবি শাহাদাৎ হোসেনের লেখার বৈশিষ্ট্য। সুতরাং তাঁহার সবগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতার সংগ্রহ এই 'কল্পলেখা' কেমন হইয়াছে, তাহা না বলিলেও চলিতে পারে।

পুস্তকখানা মোটা এণ্টিক কাগজে ইংলিশ টাইপে তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে ছাপা, সুন্দর আধুনিক ফ্যাশানে বাঁধানো। কাজেই, ভেতরের সৌন্দর্য্যের ন্যায় বাহ্যসৌষ্ঠবেও পুস্তক-খানা চমৎকার হইয়াছে। বাঙলার কাব্য-রসিক পাঠক-মণ্ডলী এই 'কল্প-লেখা' পাঠ করিয়া বাস্তবিকই আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন।''

কাজী আবদুল ওদুদের 'নবপর্য্যায়' দ্বিতীয় খণ্ড (মডার্ণ লাইব্রেরী, ঢাকা) গ্রন্থটি আলো-চিত হয়েছে ৭ : ৩, কার্তিক ১৩৩৬ সংখ্যায়। সমালোচক লিখেছেন : ''কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব বাঙলার মোসলেম-সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম চিন্তাশীল লেখক। তাঁর 'নবপর্য্যায়' ১ম খণ্ড যখন প্রকাশিত হয়, তখনই ইহা লইয়া চারিদিকে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। চিন্তার গভীরতা ও স্পষ্টবাদিতাই তাঁহার লেখার বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য ২য় খণ্ড 'নবপর্য্যায়ে' ও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ এই গভীর চিন্তাশীলতা ও স্পষ্টবাদিতার পরিচয় সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুস্তক খানায় 'নেতা রামমোহন', 'মিলনের কথা' 'ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম', 'বাঙলার জাগরণ', 'চলার কথা' প্রভৃতি মোট নয়টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সকলগুলি প্রবন্ধের মধ্যেই কাজী সাহেবের সত্যিকারের দরদী প্রাণের গভীর অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সমাজকে কতটা ভালবাসেন এবং তাঁহার চিন্তার ধারা কিরূপ সবল ও বে-পরওয়া, প্রত্যেক প্রবন্ধের মধ্যেই তাহা বেশ সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'চলার কথা' নামক প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

'ওঠো—জাগো—হায় ইস্‌লাম—হায় মুস্‌লিম,—জামালুদ্দীন, স্যার সৈয়দ, আমীর আলী থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত অন্তহীন বক্তৃতায়, উপদেশে, সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় কত কণ্ঠে কত সুরেই ত এ কান্না শোনা গেল!—আর কত? এখন মনে হয়, আমাদের বহু খেয়ালের মতো এ কান্নাও হয়ত এক সৌখীন খেয়াল—এক মানসিক বিলাস—দুর্ব্বল প্রকৃতি নারীর জন্য বিলাস যেমন, তার দীর্ঘকাল-ব্যাপী শোকোচ্ছ্বাস! * * * কিন্তু শক্ত প্রশ্ন এই—একটা জাতি বা সম্প্রদায়ের জাগার অর্থ কি? কি-ই বা সঙ্কেত?' অতঃপর নানাদিক আলোচনার পর লেখক নিজেই এই প্রশ্নের জওয়াব দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

'আসলে জাগার অর্থ খাদ্যান্বেষণে সচেষ্ট হওয়া। * * ধর্ম্ম, শিল্প, সাহিত্য, রাষ্ট্র—এ সব এই খাদ্যান্বেষণেরই বিচিত্র ভঙ্গীমা—আহার-পুষ্ট অ-ভীত মানবতার জয়-যাত্রার ইতিহাস!'—এই কথাগুলি দ্বারা ক্রন্দন-বিলাসী মোস্‌লেম সমাজকে কাজী সাহেব ব্যর্থ ক্রন্দনের বিলাস ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম, শিল্প, সাহিত্য, রাষ্ট্র প্রভৃতি সব দিক দিয়াই অপর সকল জাতির মত জয়-যাত্রার যে ইঙ্গিত করিয়াছেন,—আজিকার প্রতিযোগিতায় বিশ্বে পতিত মোস্‌লেমের পক্ষে এই ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করা বাস্তবিকই কর্ত্তব্য!

আমরা মোস্‌লেমের অতীত যুগের গৌরব-কাহিনী লইয়া বড়াই করিয়া থাকি, হয়তবা নিজেদের বর্ত্তমান দুঃখ-দারিদ্র্যময় জীবনে ইহা দ্বারা কতকটা আত্ম-প্রসাদও লাভ করিবার চেষ্টা করি; কিন্তু এরূপ ভাবে পূর্ব্ব-পুরুষের 'অস্থি' চর্ব্বন দ্বারা বাঁচিয়া থাকার সাধনায় কোন জাতিই সাফল্য লাভ করিতে পারে না! 'নবপর্য্যায়ের' লেখক এই সম্পর্কে বলিয়াছেন,—

···'উৎসবের যে আনন্দ তা উৎসব শেষের এঁটো পাতার পরিমাণ করে বুঝতে পারা যায়! উৎসবের আনন্দ বুঝতে চাও? তা' হলে আয়োজন কর নব-উৎসবের। আর সে আয়োজনের যোগ্যতা আছে, ত'ার, যে দেউলিয়া নয়, হা-হুতাশ-আছন্ন নয়, যে প্রসন্ন, যে সমৃদ্ধ—রুদ্ধ নয়, উন্মুক্ত যা'র ধনাগমের উৎস-মুখ!'

আজিকার কর্ম্ম-বিমুখ সব-দিক-দিয়া দেউলিয়া মোস্‌লেম-সমাজের পক্ষে এরূপ স্পষ্ট কথার অনেকখানি মূল্য আছে! পুস্তকখানার সবগুলি প্রবন্ধই এই ধরনের সত্য-কঠোর চিন্তার সমষ্টি। পুস্তকের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই বেশ হইয়াছে। প্রত্যেক শিক্ষিত মোসলমান—যাঁহারা বাস্তবিকই সমাজের কথা চিন্তা করেন—তাঁহাদের এই পুস্তকখানা পাঠ করা উচিত।''

৭ : ৪, অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে জসীমউদ্‌দীনের 'রাখালী' কাব্য সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য। সমালোচক লিখেছেন :

''কবি জসীম উদ্দীন বাঙ্গলার সাহিত্য-রসিকদের নিকট সুপরিচিত। তাঁহার এই নব-প্রকাশিত 'রাখালীতে' তাঁহার সবগুলি ভাল কবিতাই স্থান পাইয়াছে। কবর, কিশোরী, রাখালী, পল্লী-জননী, পাহাড়ীয়া, মেনা শেখ প্রভৃতি কবিতা যখন বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখনই সাহিত্যিক সমাজ এগুলিকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। কাজেই, 'রাখালী' যে কেমন হইয়াছে, তাহা না বলিলেও চলিতে পারে। কবি জসীম উদ্দীনের লেখায় পল্লীর সরলতা-বিমণ্ডিত যে স্বভাব-শোভা ফুটিয়া উঠে, বাস্তবিকই বাঙ্গলা সাহিত্যে তাহার তুলনা বিরল।''

৭ : ৯-১০, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ সংখ্যায় 'গ্রন্থকীট' আলোচনা করেছেন নজরুল ইসলামের 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' (শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স, কলিকাতা)। গ্রন্থকীটের এই সমালোচনা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হল :

''ইতঃপূর্ব্বে অন্য দুজন বাঙ্গালী কবির চেষ্টায় আমরা পারস্যের অমর কবি ওমর খাইয়ামের কাব্য-রস উপভোগ করিতে পারিয়াছি। এবার যুগকবি নজরুল ইসলামের অনুগ্রহে আমরা পারস্যের আর একজন শ্রেষ্ঠ কবি—হাফিজের কাব্যের রসাস্বাদন করিবার সুযোগ পাইলাম। এজন্য কবিকে আমাদের অজস্র ধন্যবাদ। বাঙ্গালী পাঠক সমাজ এজন্য চিরদিন নত মস্তকে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করিবেন।

কবি হাফিজের অপরিমেয় প্রতিভা; তাঁহার রুবাইয়াৎ অনুবাদ করিয়াছেন কবি নজরুল ইসলাম; তাঁহারও প্রতিভা আমাদের প্রশংসার অনেক উর্দ্ধে। একজন মরমী কবি ভিন্ন-ভাষাভাষী আর একজন মরমী কবির অন্তরকে নিজের অন্তরে বসাইয়া বাঙ্গলা কাব্যে তাঁহার পরিচয় প্রস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। তাহা যে রসিক পাঠকের পক্ষে পরম উপভোগ্য হইয়াছে, একথা বলিলে তাহার সম্বন্ধে তুচ্ছতম প্রশংসামাত্র করা হয়। কবি মূল পারসী হইতে রুবায়ীগুলির তর্জ্জমা করিয়াছেন এবং মূল পারসীর যে ছন্দ, অনুবাদে তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কবির এ কৃতিত্বের মহিমা কেবল সমজদার পাঠকই সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ওমর খাইয়াম ও হাফিজের জীবন-দর্শন প্রায় এক। ভোগের আনন্দকেই তাঁহারা ইহজীবনের (অন্ততঃপক্ষে কাব্যজীবনের) চরম আনন্দ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। তাই ওমর খাইয়ামের ন্যায় হাফিজের কাব্যেও সেই শারাব, সাকী, হাসি, আনন্দ, বিরহ-অশ্রু। বস্তুতঃ হাফিজের সমস্ত কাব্যের মাত্র একটী সুর—

'কে আয় বেখবর আজ ফস্‌লে গুল্ ও তর্‌কে শারাব'—ওরে মূঢ়, এমন ফুলের ফসলের দিন, আর তুই কি না শারাব ছাড়িয়া বসিয়া আছিস্ !

'কুঁড়িরা আজ কার্ব্বাবাহী
বসন্তের্ এই ফুল্-জল্‌সায়,
নার্গিসেরা দল্ নিয়ে তার
পাত্র রচে সুরার আশায়।
ধন্য গো সে-হৃদয়, যে আজ
বিম্ব হয়ে মদের ফেণায়
উপ্‌চে পড়ে শারাব-খানার
তোরণ-দ্বারের পথের ধূলায়।'

হাফিজ 'বেখবরী' ছাড়িয়া এইভাবে ধন্য হইতে চান, কিন্তু বন্ধুদের মানা ;—

'ভাবনু, যখন কর্‌ছে মানা
বন্ধুরা সব আগ্‌লে ভাঁটি—
দিলাম ছেড়ে এবার ফুলের
মরশুমে ভাই শারাব খাঁটি।'

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বন্ধুদের মানা টিকিল না, কারণ—

'ফুল বাগিচায় বুলবুলিরা
উঠ্‌ল গেয়ে,—হায়রে বেকুব,
এমন ফাগুন, ফুলের ফসল,
নাইকো শারাব ?—সকল মাটি !'

কবির মনের কথা বুলবুলিরা যখন বলিয়াই ফেলিল, তখন আর কেন ?—

'পরাণ ভরে পিয়ো শারাব্
জীবন যাহা চিরকালের।
মৃত্যু-জরা-ভরা জগৎ
ফিরে কেহ আস্‌বেনা ফের।
ফুলের বাহার গোলাব-কপোল
গেলাস-সাথী মস্ত্-ইয়ার,
এক লহমার খুশীর তুফান,
এই ত জীবন !—ভাবনা কিসের।'

কবি বন্ধুদের মানা এইভাবে কাটাইলেন, কিন্তু মৌলবীদের মানা, তাহার কি করিবেন ?

'মদ্-লোভীরে মৌলোভী কন,—
পান ক'রে এই শারাব যারা,
যেমন মরে তেমনি ক'রে
গোরের পারে উঠ্‌তে তারা।'

কবি বলিতেছেন সে তো বেশ কথা—

'তাইত আমি সর্ব্বদা রই
শারাব এবং প্রিয়ার সাথে,
কবর থেকে উঠ্‌ব-নিয়ে
এই শারাব আর দিল্‌-পিয়ারা ॥'

কবির আরো যুক্তি আছে—

'কোরান হাদিস্‌ সবাই বলে—
পবিত্র সে বেহেশ্‌ত্‌ নাকি,
মিলবে সেথাই আসল শারাব
তন্বী হুরী ডাগর-আঁখি!
শারাব এবং প্রিয়ায় নিয়ে
দিন কাটে মোর দোষ কি তাতে?
বেহেশ্‌তে যা হারাম নহে—
মর্ত্ত্যে হবে হারাম তা কি?'

সুতরাং তাঁহার সকল বাধা-বন্ধ টুটিল। কবির পান-পাত্র আসিল! এখন প্রিয়ের ধ্যান। কবির সাধ—

'আয়না তোমার আত্মার গো—
তরল তোমার ঐ লাবণী।
সাধ জাগে ঐ ধ্যানের চরণ—
করি আমার নয়ন-মণি।'

কিন্তু সে-চরণ কত কোমল! কবির ভয় এইটুকুতেও পাছে ব্যথা বাজে!—

'না, না, আমার ভয় করে গো
নয়ন-পাতার কাঁটায় পাছে
কমল-পায়ে বাজে ব্যথা!
ধেয়ানে থাক সারাক্ষণই ॥'

কবির এত সাধের—তবু এত সঙ্কোচ-সন্তর্পণের সে প্রিয় কেমন? তাহার উপমা পাওয়াই কঠিন—

'বুক হতে তার পিরাণ খোলে
শ্যামাঙ্গী ঐ তন্বী যখন,
ঠিক উপমা পাইনে খুঁজে
সে মাধুরী দেখায় কেমন!
এম্‌নি তরল রূপ গো তাহার—
বুকের তলে হৃদয় দেখায়,
স্বচ্ছ দীঘির কালো জলে
সুডোল পাষাণ-নুড়ি যেমন!'

তাহার রূপেই সমগ্র সৃষ্টি জ্যোতির্ম্ময়ী—

'রবি, শশী, জ্যোতিষ্ক সব
　　বান্দা তোমার, জ্যোতিমতি!
যেদিন হ'তে বান্দা হ'ল—
　　পেল আঁধার-হরা জ্যোতি।
রাগে-অনুরাগে মেশা
তোমার রূপের রৌশনীতে
চন্দ্র হ'ল স্নিগ্ধ-কিরণ
　　সূর্য্য হ'ল দীপ্ত অতি॥'

এমন যে প্রিয়, তাহাকে যেন কবি কাছে পাইয়াছেন কিন্তু কাছে পাইয়াও কবির তৃপ্তি নাই! শুধু এইটুক্? হায়, হায়!—শুধু এইটুক্!—

'আমার করে অলক তোমার
　　জড়িয়ে বীণার তারের মত
এ হৃদি-ভার আমার—শুধু
　　তোমার ঠোঁটে হয় আনত।
চিকণ তোমার ও মুখখানি
ভুখা হিয়ার সান্ত্বনা মোর,
সর্ব্বাশী মোর ক্ষুধার খোরাক
　　ঐ দেহটুক? হায় বিধাতঃ!'

আরো চাই, আরো চাই!—কিন্তু কবির নেশা টুটিল; কোথায় প্রিয়? সে ত কাছে নাই! সে ত কাছে ছিল না!—কবির প্রাণ ব্যথায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল—

'মোমের বাতি! পতঙ্গে এ
　　ভুলেও কিগো স্মরণ কর?
আমার কাছে—ভালোবেসে
　　ভুলে যাওয়া কেমনতর।
তোমার তরে যে বেদনার
ফল্গুধারা বয় এ-হৃদে,
জানে শুধু জীবন-মরুর
　　বালুর চর এ রৌদ্র-খর।'

কবি আরো অনেক কাঁদিলেন, কিন্তু তাহাতে ফল তো কিছুই নাই! শেষে কবি বেদনা ভুলিবার পথ পাইলেন—

'প্রিয়া তোমায় দেছে দাগা?
বন্ধু, পীড়ন সহ্য কর।
আমার পরামর্শ শোন,
　　সকল ভুলে শারাব ধর।'··· —

গোলাবী-নেশা ধরিল। কবি ভাবিলেন—এই ভালো, ওগো এই ভালো—

'সেই ভালো মোর—এই শারাবের
পিয়ালা দিয়ে তর্ করি দিল্,
যে-সাধ আমার পুরল না তা,
ভুলব গো আজ করব বাতিল।' . . .

কিন্তু অবশেষে একদিন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। কবি বলিলেন, আর কেন হাফিজ, শেষ কর!—

'ওরে হাফিজ, শেষ কর, তোর,
কৃত্রিম এই কলমবাজি!
হ'ল সময়-খোলাপাতা
ঝোলায় তুলে রাখার আজি।
নীরব হয়ে বসার পালা
এবার রে তোর,—আজকে শুধু
শূন্য গেলাস টইটুম্বুর
কর্ রে ঢেলে শেষ শিরাজী!'

হাফিজের রুবাইয়াতে (চতুষ্পদী কবিতা মালায়) এই জীবন-দর্শন। মোল্লারা ইহার আক্ষরিক অর্থ ধরিয়া হাফিজকে কম নির্য্যাতন করে নাই। কিন্তু সুখের বিষয় হাফিজের ভক্তসংখ্যা তখনও অল্প ছিল না, এবং এখনও অল্প নহে। তাঁহাদের অনেকে যেমন পূর্ব্বেও বলিতেন, এখনও তেমনই বলেন, হাফিজের শারাব—খোদা-প্রেম, তাঁহার প্রিয় স্বয়ং খোদা, তাঁহার সাকী—খোদা-তত্ত্ব-সন্ধানী পীর।

যাহাহোক, শুধু রুবাইয়াৎ পড়িয়া হাফিজকে ভালো করিয়া চেনা যায় না। কবিকে সম্পূর্ণরূপে চিনিতে হইলে তাঁহার গজল-গানগুলিও সমস্ত পড়িতে হয়। কারণ, হাফিজ তাঁহার পরিপূর্ণ অন্তর-সুধা ঢালিয়া দিয়াছেন তাঁহার গজল-গানে। হাফিজের রুবাইয়াৎ সম্বন্ধে অনুবাদক কবি নজরুল ইসলাম মুখবন্ধে বলিতেছেন—'তাঁর রুবাইয়াৎ বা চতুষ্পদী কবিতাগুলি প'ড়ে মনে হয় এ যেন তাঁর অবসর সময় কাটানোর জন্যেই লেখা। * * * এ যেন তার অতল সমুদ্রের বুদ্বুদ-কণা। তবে এ ক্ষুদ্র বিম্ব হলেও এতে সারা আকাশের গ্রহতারার প্রতিবিম্ব প'ড়ে একে রামধনুর কণার মত রাঙিয়ে তুলেছে।' আমাদের পক্ষে আশার কথা—কবি নজরুল প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তিনি হাফিজের সম্পূর্ণ 'দীওয়ানের' তর্জ্জমা করিয়া তাঁহার কাব্যের পরিপূর্ণ পরিচয় আমাদিগকে দিবার চেষ্টা করিবেন।

হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদ কবি নজরুল ইসলামের হাতে যেরূপ মোহন সুন্দর রূপে ফুটিয়াছে, বাঙ্গলার অন্য কোনো কবির হাতে সেরূপ ফুটিতে পারিত না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস; কারণ পারসী কবিদের অন্তরের সহিত তাঁহার অন্তরের পরিচয় যেমন নিবিড় তেমন আর কাহারো নহে। মুখবন্ধে হাফিজের সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কিছু মন্তব্য করিয়া এবং উপসংহারে হাফিজের জীবনী দিয়া কবি নজরুল অনুবাদখানিকে আরো মনোরম, আরো উপভোগ্য করিয়াছেন। মোটের উপর আমরা এ-কথা জোর করিয়াই বলিতে পারি যে, রসিক পাঠক এই অনুবাদখানি পড়িয়া অপূর্ব্ব আনন্দরসে অভিষিক্ত হইবেন।

এই বইখানিতে হাফিজের ৭৩ টি রুবায়ীর অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ছাপা কাগজ প্রভৃতি কোনো দিক দিয়াই ইহাতে আকাঙ্ক্ষার আর কিছুই নাই। মোট কথা, সকল দিক দিয়া সুন্দর এমন কবিতার বই বাঙ্গলায় অতি অল্পই ছাপা হইয়াছে। বাঙ্গালী পাঠক সমাজে বইখানি বহুল ভাবে সমাদৃত হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।''

৭ : ১২, শ্রাবণ ১৩৩৭ সংখ্যায় বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ 'সন্ধ্যা' (ডি. এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা)। নামহীন সমালোচক লিখেছেন :

''একখানি কাব্যগ্রন্থ। ২৪টী কবিতা এ-গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। এর মধ্যে 'ভোরের পাখী', 'চল্ চল্ চল্', 'ভোরের সানাই', 'যৌবন-জলতরঙ্গ', 'রীফ সর্দ্দার' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা ইতিপূর্ব্বে 'মাসিক সওগাতে' প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।

নজরুল ইসলামের কাব্য সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার ছাপ যেমন তাঁহার প্রত্যেক কাব্যগ্রন্থেই অল্পবিস্তর আছে, ইহাতেও তার ব্যত্যয় হয় নাই। এই কাব্যগ্রন্থের সুরটুকু 'জীবন-বন্দনা' শীর্ষক কবিতায় বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।—

'আমি মর-কবি—গাহি সেই বেদে-বেদুঈনদের গান,
যুগে যুগে যারা করে অকারণ বিপ্লব-অভিযান!
জীবনের আতিশয্যে যাহারা দারুণ উগ্রসুখে
সাধ ক'রে নিল গরল-পিয়ালা, বর্শা হানিল বুকে।
আষাঢ়ের গিরি-নিঃস্রাব সম কোন বাধা মানিল না
বর্ব্বর বলি যাহাদের গালি পাড়িল ক্ষুদ্রমনা,
কূপ-মণ্ডুক 'অসংযমীর' আখ্যা দিয়াছে যারে,
তারি তরে ভাই গান রচে যাই, বন্দনা করি তারে।'

নজরুল ইসলাম জীবনের কবি—যে জীবন উচ্ছল বেগে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চলে, সেই জীবন। কাজেই বৃদ্ধত্বের জরাজীর্ণতা তাঁর কাব্যগ্রন্থের কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। এই গ্রন্থেও তিনি চির-জীবনের গান গাহিয়াছেন। 'ভোরের পাখী'কে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—

'ওরে ও ভোরের পাখী!
আমি চলিলাম তোদের কণ্ঠে আমার কণ্ঠ রাখি।
তোদের কিশোর তরুণ গলার সতেজ দীপ্তস্বরে
বাঁধিলাম বীণা, নিলাম সে সুর আমার কণ্ঠে পুরে।'

নজরুল-কাব্যের এই উদ্দাম যৌবন অনেক সমালোচকের কাছে অসংযত, ধ্বংসকারী বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু এই বৃদ্ধ জ্ঞানী লোকদের জানা উচিত—যে-যৌবন সৃষ্টি করিয়া চলে, তার সৃষ্টির পূর্ব্বে ভাঙার একটি পর্য্যায় আছে। তার জন্য যৌবনের উদ্দামতার আবশ্যকতা আছে। উদ্দামতার মধ্যে চিরন্তনতা না থাকিতে পারে, কিন্তু সৃষ্টির জন্য ইহা মোটেই অপ্রয়োজনীয় নয়।—

'বল তোরা নব জীবনের ঢল!
　　হোক ঘোলা—তবু এই সলিল
চির-যৌবন দিয়াছ ধরারে,
　　গেরুয়া মাটীরে করেছে নীল।'

'সন্ধ্যা' চিরন্তন সৃষ্টি হিসাবে সাহিত্যে স্থান পাইবে কি না, জানি না ; কিন্তু ইহাতে যে নূতন বিরাট সৃষ্টির ইঙ্গিত আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই নবসৃষ্টির ইঙ্গিত বাঙ্গলা সাহিত্যে নজরুলের পূর্ব্বে আর কোন কবির মধ্যে পাওয়া যায় না। এই দিক দিয়া নজরুলের 'সন্ধ্যা' বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। 'ভোরের সানাই' বাঙ্গলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ জাগরণ সঙ্গীতের একটী। সৈনিকগণের 'মার্চ্চ' সঙ্গীত হিসাবে 'চল্ চল্ চল্' গানটী অতুলনীয়।''

এই সংখ্যাতেই (৭ : ১২) আলোচিত হয়েছে একরামুদ্দীনের উপন্যাস 'কাচ ও মণি' (মোহসেন এণ্ড কোং, কলিকাতা)। উপন্যাসটি সওগাতের ১ : ৩-১০, ১২, ২ : ১-৬, ৮-১১, ১২ সংখ্যাসমূহে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এটি সওগাতের প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস। এই ঐতিহাসিক গুরুত্ব সওগাতের সমালোচনায় অনুল্লেখিত। উপরন্তু সওগাতের সমালোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত মন্তব্যমাত্র। সমালোচক লিখেছেন: ''মৌলভী একরামুদ্দীন সাহেব মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্যের অন্যতম খ্যাতনামা লেখক। 'রবীন্দ্রপ্রতিভা'র রচনা তাহার কাব্যরস গ্রাহিতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছে। উপন্যাস রচনাতেও যে তাঁহার হাত আছে, তাহা এই 'কাচ ও মণি' রচনা করিয়া তিনি প্রমাণ করিয়াছেন। অবশ্য উপন্যাস হিসাবে ইহাতে যে ত্রুটী নাই, তাহা আমরা বলি না,—ত্রুটী যথেষ্টই আছে। তবে রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয়ও ইহাতে বেশ পাওয়া যায়। 'গ্রন্থকারের নিবেদন' শীর্ষক ভূমিকাটুকু আমাদের মতে না দিলেই ভালো হইত। ছাপা-কাগজ-বাঁধাই ভালো।''

এই সংখ্যাতেই (৭ : ১২) এস. ওয়াজেদ আলির 'মাশুকের দরবার' গল্পগ্রন্থ সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। মননশীল প্রাবন্ধিকের গল্পগুলি সম্পর্কে সওগাতের মন্তব্য নিম্নরূপ :

''মাশুকের দরবারে' ১৯টী গল্প স্থান পাইয়াছে। এগুলিকে ঠিক গল্প বলা বোধ হয় চলে না,—জীবনের সামান্য সামান্য অনুভূতির রেখা-চিত্র বলিলেই বোধ হয় শোভন হয়। গ্রন্থের 'পরিচয়' লেখক শ্রীসৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এ-গুলিকে টুর্গেনিভের Prose-poems-এর সঙ্গে তুলিত করিয়াছেন। আমাদেরও সেইরূপ ধারণা। টুর্গেনিভের রচনায় যেমন অনুভূতির গভীর intensity-র পরিচয় পাওয়া যায়, ইহাতেও অনুভূতিকে সেইরূপ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, কোন কোন স্থানে, অতি-রিক্ত কথন-দোষে সেই intensity নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলেও 'মাশুকের দরবারে'র রচনা এমনি অভিনব যে, আমরা ইহা পড়িয়া আনন্দিত হইয়াছি। স্বভাব-বর্ণনে স্থানে স্থানে লেখকের অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। রচনা সহজ সরল, ভাষাভঙ্গী আধুনিক রুচিসম্মত, পুস্তকের ছাপা-কাগজ-বাধাঁই প্রশংসনীয়। আমরা সাহিত্যরসজ্ঞ পাঠক-গণকে বইখানি পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।''

৯ : ৬, মাঘ ১৩৩৯ সংখ্যায় আলোচিত হয়েছে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌র 'পারস্য প্রতিভা' দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনা। সমালোচক লিখেছেন : ''গ্রন্থকার বাঙ্গলা সাহিত্যে সুপরিচিত, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে নূতন করিয়া কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। পারস্যপ্রতিভা ১ম খণ্ড প্রণয়ন করিয়া ইনি ইতিপূর্ব্বেই যথেষ্ট চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইতে দেখিয়া মনে হয় দেশবাসী তাঁহার রচনার প্রকৃত সমাদর করিয়াছেন।

পারস্য সাহিত্যের ভাব ধারা এবং কবিগণের জীবন ও কাব্যালোচনা 'পারস্য-প্রতিভা' দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয় বস্তু। পারস্যের মহাকবি ফরিদউদ্দীন আত্তার, নাসির খস্‌রু, নেজামী,

জামী প্রভৃতি চিন্তানায়কগণের সুচিন্তিত মতবাদ গ্রন্থকার অতীব অধ্যবসায়ের সহিত পাঠ করিয়াছেন এবং তাহা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় সুশৃঙ্খলার সহিত এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পারস্য সাহিত্যে ধর্ম্ম ও দর্শনের দিক দিয়া তিনি বিস্তৃত ও ধারাবাহিক আলোচনা করিয়াছেন। বিভিন্ন নিবন্ধে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, পারস্যের আধ্যাত্মিকতার সহিত ভারতীয় মুসলমানের আধ্যাত্মিকতার একটা সংযোগ রহিয়াছে।''

৯ : ৭, ফাল্গুণ ১৩৩৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে ফজলুর রহমান অনূদিত 'দীওয়ান-এ-জেব-উন-নেসা' (মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, কলিকাতা) কাব্য গ্রন্থের দীর্ঘ আলোচনা। আলোচক মুজীবর রহমান খাঁ তাঁর আলোচনায় এই মোঘল অন্তপুরের মহিলার কবিত্ব-শক্তি যেমন ফুটিয়ে তুলেছেন তেমনি প্রশংসা করেছেন ফজলুর রহমানের অনুবাদ দক্ষতার। তাঁর ভাষায় : ''দীওয়ান-এ-জেব-উন-নেসার বাংলা অনুবাদে কবি ফজলুর রহমান সাহেব দেশবাসীর চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকবেন। কারণ, নূতন সন্ধানী হবার দুঃসাহস তাঁর যেমন আছে, তেমনি তাঁর যোগ্যতা আছে অপূর্ব্ব। ফার্সী ভাষার অনেক কাব্য-গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে, হিন্দু মুসলমান অনেক কবি তাঁদের সে সব অনুবাদ কার্য্যের জন্য যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জনও করেছেন। কিন্তু তাঁদের সবারই অনুবাদ কার্য্য সীমাবদ্ধ কেবল পারস্য দেশের কবিদের মধ্যে। কবি ফজলুর রহমান সাহেব তাঁদের অনুবাদ কার্য্যের ব্যাপ্তির সীমাকে আরও প্রসারিত করেছেন। এই ভারতবর্ষের গৌরবের দিনে কত কবি পারস্য ভাষায় তাঁদের গানের বীণা বেঁধেছিলেন সে কথা আজ স্মরণ করিয়ে দিলেন ফজলুর রহমান সাহেব এবং তাঁদের মধ্যের একজনের অসামান্য প্রতিভার সঙ্গে আমাদেরে পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর এই অনুবাদ কার্য্যের দ্বারা। ···কবি জেব-উন-নেসার দীওয়ানের বিষয় বস্তু হল প্রেম—সে প্রেমের সন্ধানী ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু হলেন বেদান্ত দর্শনের অনুসারীরা, সে প্রেমের গভীরতায় আত্মহারা হয়ে আছেন পারস্যের সুফী ও য়ুরোপের **Neo-Platonist**-রা আর যারই রস ধারায় অভিষিক্ত হয়ে আছেন বাংলায় বৈষ্ণব রসিকের দল।

'মন ভুলানো বন্ধু আমার, দেখ্‌চো না কি বিশ্বময়
দিল-বিজয়ী নিশান তব লাখো মানুষ করচে জয়!
দেখ্‌চো নাকি সত্য তব বাতাস মুখে ছুট্‌তে চায়,
আরব ঈরাণ? কোথায় তারা? লু'টায় তব রাতুল পায়!'

আবার অন্যত্র আছে :—

'প্রেয়সী গো, তোমার রূপের পান করেচি পাত্রখান—
বিশ্বরূপের ঝরণা-ধারা সে-রূপ দেখে মুহ্যমান!
বন্দী তব রূপের জালে, কার ওপরে কর্‌ব ভর?
কেমন করে চল্‌ব আমি একলা তব পথের' পর।'

লৌকিক ধর্ম্মের সুফী ধর্ম্মের যে ব্যবধান রয়েছে, তা' প্রকাণ্ড। আচার সর্ব্বস্ব লৌকিক ধার্ম্মিকরা খোদাকে বসিয়েছেন ভক্তির সু-উচ্চ সিংহাসনে কিন্তু সুফীর খোদা নেমে এসেছেন তাঁর ভক্তের বুকের মধ্যে। তাঁর সঙ্গে তার সম্বন্ধ হল, ভয়েরত নয়ই ভক্তিরও নয়—সে সম্বন্ধ হল প্রীতি ও ভালবাসার, আশক ও মাশুকের মধ্যে যে সম্বন্ধ বিরাজ করছে সেই সম্বন্ধ হল এখানেও। দীওয়ান-এ-জেব-উন-নেসার এই উদ্ধৃত কয়েকটী ছত্রে সুফী ও তার খোদার মধ্যে সে মধুময় প্রীতির বন্ধনের কথা অনবদ্যভাবে ধরা পড়েছে।···

কবি জেব-উন-নেসার সঙ্গে পারস্যের মনীষী ওমর খাইয়ামের অনেক দিক থেকে তুলনা যেমন চলে বিরোধও রয়েছে, কিন্তু অনেক দিক হতে ওমর খাইয়ামের মত জেব-উন-নেসাও মনে কর্‌তেন এই রহস্যময় ধারার রঙ্গমঞ্চে মানুষ আত্মভোলা পথিক মাত্র। এই সীমাহীন পথের যাত্রী জেব-উন-নেসা ওমরের মত তাই বল্‌ছেন,—

আজকে ভোলা পথিক মোরা চল্‌ছি সবে, মনের ভুল—
জীবন-চোরা বালুর চরে, নাই কিনারা নাইকো কূল;
নিতুই হেঁটে ক্লান্ত চরণ, কোন সুদূরে কোথায় যাই,
মনের কোথা তীর্থ হবে তার যে কোন চিহ্ন নাই।

তাই ওমরের মত ক্লান্ত পথিক দীওয়ানের কবি সাকীর পানশালার রঙীন পিয়ালার স্বপ্নে পাগল হ'য়ে বল্‌ছেন,—

সাকী তোমার পাত্র কোথা? লে আও আজি জলদি চাই,
নেশা পাগল পরাণ দেখো, বল্‌চে শুধু—সময় নাই।

কিন্তু ওমর খাইয়ামের সঙ্গে জেব-উন-নেসার জীবনদর্শনের মিল বোধ হয় এখানেই শেষ, কারণ ওমর খাইয়াম হলেন অত্যন্ত ভোগবাদী—কিন্তু জেব-উন-নেসা দৈহিক ইন্দ্রিয় সুখাদির প্রতি অনেক সময় তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন—

জগতটা তো সেরেফ্, দেখি, দুঃখের ঘন গহীন বন
কামনা-এক সিংহ পশু ঘুরচে সেথা সর্ব্বখন!
তারি সনে লড়্‌তে হলে চিত্ত খাঁটি—অস্ত্র চাই,
শিকারী হে, শিকার বুঝে করবে তব লক্ষ্যটাই!

ওমর খাইয়াম হলেন চরম দুঃখবাদী দার্শনিক (Pessimist) তিনি এই হাস্যময়ী প্রকৃতির অন্তরালে কেবল নৈরাশ্যের কৃষ্ণছায়া দর্শন করেছেন, বেহেশ্‌ত দোজখের চিত্তচমৎকারিণী বর্ণনাকে মোল্লা-পুরোহিতের অলীক প্রলোভন বলেই বিদ্রূপ করেছেন। তাঁর মতে মৃত্যু যে যবনিকা মানুষের নয়ন সন্মুখে উদঘাটিত করবে তার ওপারে কেবল অন্তহীন নৈরাশ্যের রাজত্ব—অন্ধ নিয়তির হাতের ক্রীড়নক হতভাগ্য মানুষ। কিন্তু দীওয়ানের কবি যদিও লৌকিক ধর্ম্মের বিরোধী, মাঝে মাঝে তাঁর কাব্যে মোল্লা পুরোহিতের প্রতি তাঁর তীব্র কটাক্ষেরও পরিচয় মিলে, তবুও তিনি একেবারে আশাহীন নন।

দীওয়ানের কবিও জানেন এ সংসার বড় দুঃখের বড় বেদনার তবু তাঁর মধ্যে সুখের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা তিনি করেছেন তাঁর প্রিয়তমের চরণে আপনাকে নিবেদিত করে—

অত্যাচারী প্রণয় তুমি, বিরাম নাহি একটী দম!
তোমার চেয়ে আমার হিয়া গর্ব্ব সেতো নয়কো কম।
নিঠুর, তব চরণ তলে ক'রচো মোরে নিষ্পেষণ
পরাণ তবু সকল স'য়ে জানায় 'প্রিয়া' সম্ভাষণ!

কবি ফজলুর রহমান সাহেব তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন—দীওয়ান কাব্যে বড় দর্শন—দুঃখকে উপেক্ষা করে সুখের অনুসন্ধান নয়। বিপুল দুঃখের গহীনতায় চির সুখের পরিসমাপ্তি—কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক।

বাংলার সৃষ্টিধর্ম্মী প্রতিভাশালী তরুণ কবিদের মধ্যে ফজলুর রহমান সাহেবের স্থান উপেক্ষণীয় নহে। তিনি চারজনের মধ্যে! আর বোধ হয় কাব্যানুবাদে তাঁহার ক্ষমতা অদ্ভুত! অন্তত দীওয়ানে জেব-উন-নেসা পড়ে সে ধারণাই হয়েছে। স্থানে স্থানে তাঁর অনুবাদ মূলের সৌন্দর্য্যকেও ম্লান করেছে—আর মূলের সৌন্দর্য্য যে তাঁর হাতে সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ রয়েছে তা না বল্‌লেও চলে। যাঁর প্রতিভা নেই তাঁর দ্বারা এমন সুন্দর অনুবাদ অসম্ভব।''

৯ : ৭, সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছে আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীনের শিশুপাঠ্য গল্পগ্রন্থ 'কচিপাতা'। সওগাত সমালোচক লিখেছেন : ''সমুদ্দুরের রাজকন্যা ও জানোয়ারের ভালবাসা এই দুটী গল্প ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে! শামসুদ্দীন সাহেব একজন উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য-সমালোচক। এই তীক্ষ্ণ সমালোচক গ্রন্থকারের হাত হইতে যে এমন সরস-সরল স্বচ্ছ-সাবলীল ভাষায় শিশু-মনের অফুরন্ত খোরাক পাওয়া যাইবে তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি নাই। বইখানি পড়িয়া ছেলে মেয়েরা যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিবে সন্দেহ নাই।''

এই সংখ্যায় ইব্রাহিম খাঁর 'তুর্কী উপকথা' প্রসঙ্গেও সংক্ষিপ্ত মন্তব্য আছে। উল্লেখযোগ্য যে 'কচিপাতা' ও 'তুর্কী উপকথা' গ্রন্থ দুটির ছবিগুলো আঁকেন কবি বন্দে আলী মিঞা। সমালোচক উভয় গ্রন্থ প্রসঙ্গে ছবিগুলোর নিন্দা করেছেন। তিনি 'কচিপাতা'র ছবি প্রসঙ্গে লিখেছেন :

''ভিতরের ছবি কয়খানা না দিলেই ভাল হইত। শিল্পী বন্দে আলী মিয়া ছবি কয়খানার ভিতর দিয়া নিজেকে বিজ্ঞাপিত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাতে এমন সুন্দর বইখানার মর্যাদাহানি হইয়াছে।''

তুর্কী উপকথার ছবি প্রসঙ্গেও সমালোচকের একই মন্তব্য : ''কবি বন্দে আলি মিয়ার মিয়ার অঙ্কিত ছবিগুলি এই পুস্তকের সৌন্দর্য্য অনেকটা নষ্ট করিয়াছে। বোধ হয় মুসলমান সমাজে শিল্পীর অভাব বলিয়াই গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণ এই ছবিগুলির আমল দিয়াছেন। কিন্তু শিল্পীর আস্পর্দ্ধা এই যে এ হেন ছবিগুলির উপর নিজের নামটী বড় হরফে মুদ্রিত করিয়াছেন।''

এই সময় মোহাম্মদী অফিস থেকে একটি 'বারোয়ারী' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ৯ : ৭ সংখ্যাতে ঐ উপন্যাস সম্বন্ধে সওগাত নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য করেন : ''বারোয়ারী উপন্যাস রচনা মুসলমান সমাজে এই নূতন প্রচেষ্টা। আমরা উপন্যাসখানি পড়িয়া সুখী হইয়াছি। মুসলমান সমাজে একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী মওলানা মোহাম্মদ আক্রম খাঁ সাহেব হইতে শুরু করিয়া বারো জন সাহিত্যিকের হস্তে এই উপন্যাস খানি রূপলাভ করিয়াছে। বিভিন্ন চিন্তাধারার লেখক তাঁহাদের চিন্তাগতিকে একমুখী করিয়া একই বিষয়বস্তুর অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিয়া তাহাতে পূর্ণতা দান করিয়াছেন। পুস্তকখানির আগাগোড়া কোথাও বেখাপ্পা ঠেকে না। উপন্যাসের বিষয় বস্তুটীও বেশ চিত্তাকর্ষক।''

১০ : ৩, পৌষ ১৩৪০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে কবি আবদুল কাদিরের 'দিলরুবা' কাব্য গ্রন্থের আলোচনা। সওগাত সমালোচক লিখেছেন :

''আমরা কবি আবদুল কাদিরের এই কাব্য গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। গ্রন্থে ছোটবড় মোট উনিশটি কবিতা স্থান পাইয়াছে। অধিকাংশ কবিতাই ভাব, ভাষা,

এবং ছন্দ-সম্পদে অতুলনীয় হইয়াছে। কবির যে রস সৃষ্টি করিবার শক্তি আছে তাহা গ্রন্থের প্রারম্ভে 'দিলরুবা' কবিতার প্রথম কয়টি লাইনেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—

নিগূঢ় যৌবন-রসে হৃদয়ের বাতায়ন খুলি,
তোমার প্রতীক্ষা করি বসে আছি দু'নয়ন তুলি
হে সুন্দরী প্রিয়া, প্রিয়তমা !

আজি মোর গীত-রাগে
অশোক-মঞ্জরী জাগে,

পলাশের ওষ্ঠপুটে লাগিয়াছে তাম্বুল-সুষমা !
ঘুমন্ত বনের ভালে জ্বলিছে শ্যামল বহ্নিশিখা
উন্মত্ত বায়ুর নৃত্যে কাঁপি কাঁপি মেলিছে মল্লিকা—
গোপন কলিকা।

কবি এই কবিতাটিকে কতদূর সরস, সজীব ও মর্ম্মস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছেন শেষের কয়টি লাইনেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

সৌন্দর্য্য-সুরায় তব পাত্র মম করি সম্পূরণ
আকণ্ঠ করিব পান ; মধু-রাতে কিঙ্কিণী কঙ্কণ
গুঞ্জরিবে মোর কবিতায়।
তব উত্তরীয়খানি
সর্ব্ব অঙ্গে নেবো টানি,
বৈশাখীর নৃত্যে তব বিদ্যুল্লেখা আঁকিব সিঁথায়।

পুষ্পিত প্রাণের রসে পূর্ণ করি মৃত্যুর ভৃঙ্গার
জন্মঋণ শোধ করি ওষ্ঠে আনি ধরিব তোমার
শেষ উপহার।

'দিলরুবা' কবি আবদুল কাদিরের প্রথম কাব্য গ্রন্থ, কিন্তু ইহার মধ্যে আমরা তাহার যে শক্তি ও একাগ্র সাধনার নিদর্শন পাইয়াছি তাহাতে তাঁহাকে অভিনন্দিত না করিয়া পারিতেছি না।''

১১ : ১, ফাল্গুণ ১৩৪১ সংখ্যায় আছে নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ 'গুলবাগিচা' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য :

''কবি কাজী নজরুল ইসলাম গান রচনায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। আলোচ্য গানের বইখানি কবির সে মর্য্যাদা অটুট রাখিয়াছে। পুস্তকখানিতে ঠুংরী, গজল, দাদ্‌রা, চৈতী, কাজরী, স্বদেশী, কীর্ত্তন, ভাটিয়ালী, ইসলামী, ধর্ম্মসঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের গান সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার প্রায় সমস্ত গানগুলি লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। কাজী সাহেবের গানগুলির আরও একটী বৈশিষ্ট্য এই যে উহাদের কাব্য সম্পদও উচচাঙ্গের। ছাপা এবং বাঁধাই বেশ ভাল হইয়াছে। বইখানা সকলের নিকট বিশেষতঃ সঙ্গীতামোদী-দের নিকট সমাদর লাভ করিবে বলিয়া মনে হয়।''

ঐ সংখ্যায় (১১ : ১) বন্দে আলী মিঞার 'ময়নামতীর চর' (ডি, এম, লাইব্রেরী, কলিকাতা) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

''বন্দে আলী মিঞা পল্লী কথা রচনায় যে বেশ হাত পাকাইয়াছেন তাহা গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বুঝা যায়। কবি গ্রন্থের অনেক স্থানে সরস গ্রাম্য শব্দের সমাবেশ করিয়াছেন ; তাহাতে কাব্যের কোনো অঙ্গহানি না হইয়া বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। ছন্দের ধারাও সর্ব্বত্র স্ফুট রহিয়াছে।''

কবি শাহাদাৎ হোসেনের গল্পগ্রন্থ 'রূপায়ণ' (গ্রেট ইস্টার্ণ লাইব্রেরী) সম্পর্কে ১১ : ১ সংখ্যায় সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে গল্পের কোন আলোচনা নেই। সমালোচক লিখেছেন : ''রূপায়ণে' প্রকাশিত গল্পগুলি বিভিন্ন মাসিকে বাহির হইয়াছিল। পাঠক সমাজের নিকট কবি শাহাদাৎ হোসেনের নূতন পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি। উপন্যাস এবং গল্প রচনায় লেখকের ক্ষমতা আছে। রূপায়ণেও আমরা সেই ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছি। আমরা আশা করি, পুস্তকখানি সকলের নিকটই সমাদর লাভ করিবে।''

১৯ : ৪, শ্রাবণ ১৩৪৩ সংখ্যায় কাজী আবদুল ওদুদের 'সমাজ ও সাহিত্য' (প্রকাশক: মোহাম্মদ আফজাল-উল-হক, মোসলেম পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা) গ্রন্থের পরিচয় প্রসঙ্গে সওগাত সমালোচক লিখেছেন : ''আবদুল ওদুদ সাহেব বাঙলার সাহিত্যিক সমাজে সুপরিচিত। সৃষ্টিধর্ম্মী সাহিত্যের চাইতে বরং আলোচনা-সাহিত্যের দিকেই তাঁহার ঝোঁক দেখা যায় বেশী। তাঁহার রচিত 'সমাজ ও সাহিত্য' বইখানাও এই আলোচনা সাহিত্যেরই পর্যায়ভুক্ত। 'সমাজ', 'ছিন্নপত্র', 'সাহিত্য',—এই তিনটী অধ্যায়ের মধ্যে মোট আঠারোটি বিষয়ের সমাবেশে বইখানা রচিত হইয়াছে ; লেখকের ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গী বেশ সুন্দর ও গভীরতাপূর্ণ। ইহা ব্যতীত তাঁহার লেখার মধ্যে বেশ চমৎকার একটা সাহিত্যিক-অন্তর্দ্দৃষ্টির আভাস পাওয়া যায়—যার অভাব আমরা বাঙলার অনেক সাহিত্যিকের মধ্যেই অনুভব করিয়া থাকি।

'সমাজ' শীর্ষক অধ্যায়ে রাজা রামমোহন, ডাক্তার ইক্‌বাল ও মুস্তফা কামাল সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি যেমন ধীর ও স্থিরভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে সাহিত্য জনোচিত মোহমুক্ত-চিত্তের ঔদার্য্যই প্রকাশ পাইয়াছে। 'ছিন্ন পত্র' অধ্যায়ে দিদারুল আলম শীর্ষক লেখাটি আমাদের ভাল লাগিল। কিন্তু, এই অধ্যায়ের শেষে 'বিপ্লব' শীর্ষক লেখাটী পড়িয়া আমাদের মনে হইল যেন সামাজিক বিপ্লব সম্বন্ধে লেখকের ধারণা খুব অস্পষ্ট। বিপ্লব কথাটিকে কমিউনিষ্ট বা সোসিয়েলিষ্টগণ যে ভাব ও অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন লেখক হয়তো তার খবর রাখেন না। বিপ্লব কথাটীকে মনেহয় যেন তিনি অনেকটা সাধারণ দাঙ্গাহাঙ্গামার মত মনে করিয়া লইয়াছেন।

'সাহিত্য' অধ্যায়ে গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথকে লইয়া তিনি যে আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব। গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এমনি গভীরতম উপলব্ধি বাঙলার খুব কম সমঝদারের মধ্যেই জাগিয়াছে। মোটের উপর ওদুদ সাহেবের বইখানা পড়িয়া আমরা বেশ আশান্বিত হইয়াছি। বইখানার কাগজ ও ছাপা বেশ ভালই হইয়াছে। আশা করি পাঠক সমাজে ইহা আদৃত হইবে।''

২০ : ১, অগ্রহায়ণ ১৩৪৩ সংখ্যায় স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের উপন্যাস 'অন্ত্যেষ্টি' (গুরুদাস, কলিকাতা) সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত হলেও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করা হয়েছে। সমালোচক লিখেছেন :

''অন্ত্যেষ্টি' পড়িয়া আমরা অনেক খানি আশ্বস্ত হইলাম। জাতির বর্ত্তমান সমস্যাগুলিই পুস্তকের বিষয়বস্তু। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ এই

উপন্যাসের মূলসূত্র। স্বচ্ছ অথচ সরল ও আলঙ্কারিক ভাষায় লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া নিয়াছেন সেইখানে যেখানে লক্ষ কোটী নরনারী বিনা দোষে দিনে দিনে দুর্দ্দশার শেষ প্রান্তে যাত্রা শুরু করিয়াছে। লেখকের মানসিক গঠন সমাজতন্ত্রবাদমূলক, বিশ্লেষণ ক্ষমতা অপূর্ব্ব। অপরিসীম দরদ হইয়া গ্রন্থকার দলিত মনুষ্যত্বের উদ্বোধন গাহিয়াছেন। বাংলার প্রতি ঘরে এই পুস্তকের সমাদর আশা করি। শ্রীযুক্ত স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্যের লেখনী হইতে আমরা এই জাতীয় আরও প্রাণবন্ত সাহিত্য-সৃষ্টির প্রত্যাশা জানাইতেছি।''

২১ : ৫, চৈত্র ১৩৪৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে সুফিয়া এন. হোসেন (পরে সুফিয়া কামাল) রচিত 'কেয়ার কাঁটা' (নওরোজ, কলিকাতা) গল্পগ্রন্থের আলোচনা। সওগাতের সমালোচক লিখেছেন :

''গ্রন্থকর্ত্রীকে আমরা কবি হিসাবে জানিতাম এবং সাহিত্যক্ষেত্রে কবি হিসাবেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতাম। কিন্তু গল্প-রচনায়ও যে তাঁহার এমন মিষ্টি হাত---আলোচ্য গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাইয়া অমরা খুশী হইলাম।

'কেয়ার কাঁটা' গ্রন্থকর্ত্রীর প্রথম রচিত গল্প গ্রন্থ। প্রথম গল্প 'কেয়ার কাঁটার' নামেই বইখানির নামকরণ হইয়াছে। ইহা ছাড়া---যে নদী মরুপথে হারালো ধারা, বিজয়িনী, দুধারা, সত্যিকার, যদি ব্যথী না আসিবে, সান্ত্বনা, বিড়ম্বিত, অপমান না অভিমান, শামা-পরওয়ানা এবং কমলের ব্যথা শীর্ষক আরো দশটি গল্প আছে। প্রত্যেকটি গল্পই সুলিখিত।

মুসলিম সমাজ-জীবনকে ভিত্তি করিয়া বাংলা সাহিত্যে এখনও যথেষ্ট গল্প উপন্যাস রচিত হয় নাই। মুসলিম নরনারীর সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার ইতিহাস, তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, স্নেহ প্রেম ভালবাসার আলেখ্য বাংলা কথা সাহিত্যে আমরা আরো প্রচুর পরিমাণে দেখিতে চাই এবং দেখিয়া আনন্দলাভ করিতে চাই। জানি আমাদের এ আশা একদিনে সফল হইবে না, দিনে দিনে ও বহুজনের সাধনায় আমাদিগকে সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে। তথাপি একের সাধনা উপেক্ষণীয় নহে। সে জন্যই শক্তিশালিনী লেখিকা বেগম সুফিয়া এন, হোসেনকে কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি এবং তাঁহাকে আমাদের স্বাগতসম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থকর্ত্রী প্রধানতঃ কবি সুতরাং গল্পগুলিতে তাঁহার কবি-মনোভাবই বেশী পরিস্ফুট হইয়াছে। ঘটনা-বহুল না হইয়া গল্পগুলি ভাবপ্রধান, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ। আধুনিক কথা সাহিত্যে এই বিশেষ শ্রেণীর গল্প আদর লাভ করিয়াছে। এই শ্রেণীর গল্প রচনায় ভাষার উপর যে বিশেষ দখল থাকা আবশ্যক গ্রন্থকর্ত্রীর তাহা আছে এবং রচনামাধুর্য্যে গল্পগুলি সত্যই সুখপাঠ্য হইয়াছে।

কথা-সাহিত্যে প্রথম হস্তক্ষেপেই গ্রন্থকর্ত্রী যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা হইতে এ-আশা আমরা অনায়াসেই করিতে পারি যে ভবিষ্যতে তাঁহার নিকট সুন্দরতর এবং মহত্তর জিনিষের সন্ধান পাইব।''

২১ : ৭, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে শামসুন নাহারের 'রোকেয়া জীবনী' (বুলবুল পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা) গ্রন্থের আলোচনা। সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন (৫২১-২২) :

"রোকেয়া জীবনী—মুসলিম-বঙ্গে-নারী-আন্দোলনের অগ্রনায়িকা, সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল বালিকাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী মিসেস আর, এস, হোসেনের জীবনী। রোকেয়া জীবনীর লেখিকা এবং এই জীবনী যাঁহার সেই স্বর্গগতা মহিলা উভয়েই আমার শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়াছেন। বেগম রোকেয়ার যে জীবন-কাহিনী পাঠ করিলাম, তাহা যেমন বিস্ময়কর তেমনি আশাপ্রদ। বাংলার মুসলিম সমাজে এখনও যে যুগ চলিতেছে, হিন্দু সমাজের সেই যুগে একজন নারীর জীবনে ও চরিত্রে এমন শক্তি ও সাহস, এমন নিষ্ঠা ও সত্য-পিপাসা বিরল ছিল বলিয়া মনে হয়। নারীকে হিন্দু যে শক্তির আধার বলিয়া পূজা করে, নারী চরিত্রে যে একটি সহজ মহিমা ও শুচিতা আছে যাহা প্রাকৃতিক শক্তির মত স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং পুরুষের পক্ষে অনেক স্থানেই যাহা সাধন সাপেক্ষ, তাহার পরিচয় পাই এই মহিয়সী নারীর চরিত্র চিত্রে। লতা যেমন আপনিই আলোকের দিকে উন্মুখ হইয়া থাকে, যতই বাধা পাক তবুও সেই দিকেই তাহার গতি—এই নারীর জীবনে সত্য ও সুন্দরের প্রতি একটি অনিবার্য্য প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে, বাল্য ও বিবাহিত জীবনে তাঁহার সেই প্রাণধর্ম্ম যথেষ্ট অনুকূল আবেষ্টনীর সাহায্য পাইয়াছিল। নানা কুসংস্কার, কুপ্রথা এবং অশিক্ষাজনিত মনোভাবের বিরুদ্ধ প্রভাব অতিক্রম করিয়া তাঁহার আত্মা যে স্থানটীতে আরোহণ করিয়াছিল তাহা যে কত সত্য ও ধ্রুব তাহার এই প্রমাণ পাই যে—আমি বাঙ্গালী হিন্দু ঠিক যে নীতি ও যে ধর্ম্মকে প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছি এই বাঙ্গালী মুসলিম দুহিতাও ঠিক তাহাকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন, বাঙ্গালী জাতির জাতীয় প্রেরণাই তাঁহাকে পরিচালিত করিয়াছিল। তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই প্রেরণা এমন করিয়া একজন নারীকেই আশ্রয় করিয়াছে—বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের আত্মা এবং বিবেক-বুদ্ধি এমন ভাবে একটী নারী প্রতিমা-রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। একালে হিন্দু সমাজেও এমন নারী-চরিত্র বিরল। কিন্তু তজ্জন্য হিন্দু আমি কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিতেছি না ; কারণ, বেগম রোকেয়া শুধুই মুসলিম মহিলা নহেন, তাঁহার জীবনবৃত্ত পাঠ করিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে তিনি খাঁটি বাঙ্গালীর মেয়ে।

এই 'জীবনী' যিনি লিখিয়াছেন তিনিও সামান্যা নহেন। তিনি যে এমন ভাবে এই চরিত্রটী গড়িয়া তুলিয়াছেন, তার কারণ তিনি এই জীবনকে মনে ও প্রাণে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন—আমরা যে চিত্রখানি পাইয়াছি তাহার ছায়া-আলোকের সুষমা ও বর্ণ-বিন্যাসের পারিপাট্য তাঁহারই ধ্যান-কল্পনাময় সহানুভূতির পরিচয় দিতেছেন। এমন করিয়া একান্ত হইতে না পারিলে তিনি 'রোকেয়া জীবনী' রচনা করিতে পারিতেন না। যে আদর্শ ওই জীবনে ও চরিত্রে বিদ্যমান ছিল, সেই আদর্শকে তিনি নিজের অন্তরে চাক্ষুষ করিতে পারিয়াছেন—তাঁহার হৃদয়ও ঐ এক ছাঁচে গড়া। এই 'জীবনী' রচনায় যে আত্মপরিচয় তিনি দিয়াছেন তাহাও পাঠকের দৃষ্টি এড়াইবে না। আশা করি, ওই একটি মহৎ জীবন আরো অনেকের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বকে উদ্বুদ্ধ করিবে ; বেগম রোকেয়ার ভাব্‌দেহ বহু সন্তানের জননী হইবে।"

২১ : ৭, সংখ্যাতে কামালুদ্দীন আলোচনা করেছেন মুহম্মদ হবীবুল্লাহ রচিত জীবনী-গ্রন্থ 'ওমর ফারুক' (বুলবুল, কলিকাতা)। সমালোচক লিখেছেন : "বাংলায় সত্যিকারের শিশু সাহিত্য এখনো গড়িয়া উঠে নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে ছেলেদের জন্য লেখা বই যথেষ্ট থাকিলেও তাহাতে তাহাদের মন গড়িয়া তোলার উপাদান খুব অল্পই পাওয়া যায়। এর প্রধান কারণ হইতেছে এই সব বই লিখার পেছনে একটা প্রপাগাণ্ডার প্রেরণা সব সময় লেখকদের মোহগ্রস্ত করিয়া রাখে। বিদ্যাসাগরের জীবনী লেখা যেন ছেলেদের শৈশব হইতে নূতন করিয়া হিন্দু করিয়া গড়িয়া তোলার একটা নূতন ফন্দি : বিদ্যাসাগরের চরিত্র শুধু একটা bait মাত্র। বর্ত্তমান লেখকের লেখায় এর ব্যতিক্রম দেখিয়া আমরা

আশান্বিত হইয়াছি। প্রপাগাণ্ডার ভাব এর লেখায় মোটেই নাই এবং এইটাই এর শিশু-সাহিত্য সৃষ্টির সুন্দর বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে হয়।

ইতিহাসের অতি নীরস ঘটনাগুলোকেও কাহিনীর মত সচ্ছন্দ ও সুন্দর করিয়া ছেলেদের নিকট বলিবার ক্ষমতা লেখকের আছে। ছোট ছোট ভাই বোনদের হাতে বইটী তুলিয়া দিতে মন আনন্দে ভরিয়া ওঠে। লেখকের সাবলীল তুলির প্রলেপ শিশু-মনে স্বপ্নের ছবি ফুটাইয়া তুলিবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

শুধু শিশুরা নয় বইখানি যুবক ও বৃদ্ধদেরও কাজে আসিবে। শিক্ষিত সমাজে বই-খানির যে আদর হইয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণই তাঁহার প্রমাণ। এর ভূমিকা লিখিয়াছেন রায় যোগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর।

২১ : ৮, আষাঢ় ১৩৪৪ সংখ্যায় মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী অনূদিত 'স্মার্ণানন্দিনী' (প্রকাশক, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা)। গ্রন্থটির আলোচনা করেছেন আনোয়ারা চৌধুরী। তিনি লেখন: "১৯২০ খৃষ্টাব্দের এক শুভ্র প্রভাতে মোস্তফা কামাল পাশা তুর্কী বীরাঙ্গনা খালেদা খানমের সঙ্গে বসিয়া প্রস্তাবিত আঙ্গোরা সরকারের গঠনতন্ত্র সম্পর্কিত এক খানি দলিলের মুসাবিদা করিতেছিলেন। এমন সময় চিকাগো ট্রিবিউন পত্রিকার প্রতি-নিধি মিঃ উইলিয়াম আসিয়া কামালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কথোপকথনের পর কামাল ও খালেদার ফটো নেওয়া হয়। ঘটনাক্রমে ফিল্‌মে খালেদার ছবি কামালের পেছনে উঠিয়া যায়। মিঃ উইলিয়াম তাহা খালেদাকে দেখাইয়া বলেন কামালের পশ্চাতের মহীয়সী নারী আপনিই—আপনিই the woman behind Kemal। এর পর হইতে খালেদা পাশ্চাত্যে woman behind Kemal নামে পরিচিতা হন।

দিল্লী জামেয়া মিল্লিয়ার অতিথি হিসাবে খালেদা কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিয়া-ছিলেন। জামেয়া মিল্লিয়ায় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতা যিনি শুনিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। ভারত ভ্রমণের পর খালেদার সম্বন্ধে বাঙ্গালী জনসাধারণের ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রাজনীতিক বক্তা ও সমাজ-সংস্কারক হিসাবে খালেদা বর্ত্তমান জগতে সুপরিচিত হইলেও তিনি অমর হইয়া থাকিবেন প্রধানতঃ সাহিত্যিক হিসাবে। তাঁহার আত্ম-জীবনী, কয়খানি উপন্যাস ও ছোটগল্পের বই ইতিমধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে খালেদার সমরস্মৃতির অনুবাদ সওগাতে প্রকাশিত হইয়ছিল। জগদ্বিখ্যাত উপন্যাসটীর অনুবাদ করিয়া সুলেখক ওয়াজেদ আলী সাহেব বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

কাহিনীটী বিয়াসী নামক একটী তুর্কী সেনানীর মুখ হইতে বাহির হইতেছে। সে আহত হইয়া হাসপাতালে আসিয়াছে। দু'খানি পা-ই তার কাটা গিয়াছে। তার উপর আবার অস্ত্র চালানো হইবে। মৃত্যুর তুহিনস্পর্শ আগে হইতেই সে যেন একটু একটু করিয়া পাইতেছে। এই অবস্থায় সে তার জীবনস্মৃতি লিখিতেছে ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও।

স্মার্ণানন্দিনীর নায়িকা আয়শা। তুর্কী জাতি নবজন্ম লাভের জন্য যে অগ্নিমন্ত্রের সাধনা করেন তারই প্রচারিকা এই স্মার্ণানন্দিনী। উপন্যাসখানির পাতায় পাতায় লেখা সেই অগ্নি-বচন যার তেজে স্মার্ণার ভস্মস্তূপ হইতে বাহির হইল এক নব-বলদৃপ্ত

জাতি। আয়শার হস্তে দীক্ষিত সেনানী ও সৈনিকদের ভীষণতম পরীক্ষা, দুর্ম্মদ রণ-তৃষাতুর এই নারীর সাহস ও আত্মত্যাগ, মুহর্মুহু গোলাবৃষ্টির মাঝখানে শত সহস্র তুর্কী সন্তানের আত্মবলিদান—সত্যই বড় ভীষণ, বড় সুন্দর, বড় মহান! প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই সবেরই মনোজ্ঞ বর্ণনায় বইখানি ভরপুর।

বাঙ্গলার নারী-জাগরণের নবপ্রভাত এই বইখানির অনুবাদ সত্যই সময়োচিত হইয়াছে। এই বই হইতেই আলোকপন্থী বঙ্গনারী যথেষ্ট পাথেয় সংগ্রহ করিতে পারিবেন, আশা করা যায়। খালেদার অন্যান্য গ্রন্থ—হান্দান, সবীয়ে তালিব, আর্জ্জরুমের নারী, কানানের মেষ-পালক, ইশিলদাকের স্বপ্ন—এ সবের অনুবাদও আশা করি শীঘ্রই বাঙ্গলায় প্রকাশিত হইবে।''

২১ : ৩, শ্রাবণ ১৩৪৪ সংখ্যায় 'কাজী' নামের আড়ালে কাজী নজরুল ইসলাম আলোচনা করেছেন আবুল মনসুর আহমদের 'আয়না'। নজরুল তাঁর অনুকরণীয় ভাষায় লিখেছেন :

''একবুক পাঁক ঠেলে চলতে চলতে হঠাৎ এক পুকুর ফোটা পদ্ম দেখলে বিষিয়ে ওঠা দেহ-মন যেমন পুলক আনন্দে নেচে ওঠে, ঠিক তেমনি বাংলা সাহিত্যের আবর্জ্জনা ঘাঁটতে ঘাঁটতে শিল্পী আবুল মনসুর রচিত 'আয়না'র গল্পগুলি পড়ে বিরক্তি-ভরা চিত্ত রস-পুলকে ভরে উঠলো। বহুদিন পরে মনে হলো, হাঁ, একখানা বই পড়া গেল।

বাংলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় সাহিত্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের একটা অভিযোগ আছে। অভিযোগটি এই।—বাংলা সাহিত্যিকরা সেরেফ্ ব্যঙ্গরসে চুইয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে জানেন না। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়।

আবুল মনসুরের হাত থেকে এমন একটা অনাবিল স্বচ্ছ রসধারা বিনা আয়াসে কি করে যে বেরিয়ে এল, তা ভাবলে সত্যি বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। হুযুর কেবলা, গো-দেওতা-কা-দেশ, নায়েবে নবী, লীডারে কওম, মুজাহেদীন, বিদ্রোহী সঙ্ঘ ও ধর্ম্মরাজ্য এই সাতটি গল্প নিয়ে 'আয়না' তৈরী। প্রত্যেকটি গল্পই আবুল মনসুরের অননু-করণীয় রচনার বৈশিষ্ট্যে একটা পূর্ণরূপ গ্রহণ করেছে। যেমন সাবলীল প্রকাশভঙ্গি তেমনি অপরূপ তাঁর রচনার স্বচ্ছন্দ গতি। পীর সাহেব, সুফী সাহেব, লীডারে কওম, মুসলিম নেতা, হিন্দু-নেতা মায় গো-নেতা (সরদার বলদ) সকলেই গভীরভাবে আমাদের সাথে আলাপ জমাতে পেরেছে। পাতার পর পাতা উল্টালে যখনই যার সাথে দেখা হয়, সেই অতি-পরিচিত হাসি এনে হাত ধরে বিনা সঙ্কোচে একেবারে গা ঘেঁসে বসে পড়ে। মাষ্টার সাহেব, সুধারামী সাহেব, মৌলুবী সাহেব, সবারই মুখ, চেনা মুখ; কোথায় যেন এঁদের দেখেছি।—কত কালের যেন দহরম মহরম সবারই সাথে। সাতটি গল্পে ছোট বড় সব জুটিয়ে কম লোকের সাথে তো আর সাক্ষাৎ হোল না।—কিন্তু আশ্চর্য্য, পুলিশের বড় কর্ত্তা, সার্জ্জেণ্ট, এঁরা সব 'সাহেব লোক' হলেও চেনা-চেনা তাঁদের মুখ। নজরুলের সেই পূজারিণীর ছত্রটি,—'সব মুখ এযে চেনা-চেনা অতি' আয়নায় সত্যরূপ পেয়েছে।

আবুল মনসুরের ভাষা বড্ড জোরালো, খুব Expressive কিন্তু অসম্ভব সংযত। ঠিক যে-টুকু প্রয়োজন সেই টুকুই তিনি বলেছেন। একটি বাক্যও কোথাও বেশী বলেন নি। অথচ তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা ওই সংযত ভাষার ভেতরই সম্পূর্ণরূপে বলা হয়েছে। লেখকের বক্তব্য এমন সুষ্ঠুভাবে ভাষায় রূপ পেতে খুব কম বাংলা বইয়ে দেখেছি।

এই গল্পগুলি পড়তে গিয়ে হাসির হুল্লোড়ে হুটোপুটি খেলেও হাতে রুমাল রাখতে হয়। চোখের দু-কোণে বার বার অশ্রুবিন্দু জমে উঠে। হাসির তলে তলে চলে

ফল্গুধারার মত অশ্রুজলের খেলা। মনসুর সাহেব হাসাতে গিয়েও প্রকৃতিকে অনুকরণ করেছেন। বিরামবিহীন একটানা খুব বেশীক্ষণ হাসলে মানুষ মাত্রেরই শুষ্ক চোখেরও দুকোণ যে ভিজে ওঠে, এতো আমরা কতবার লক্ষ্য করেছি।

আবুল মনসুরের গল্পগুলি রাজনৈতিক জগতের চিত্র। এইদিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে আবুল মনসুর সম্পূর্ণরূপে একক। বাংলা সাহিত্যে রাজনৈতিক-রস-সাহিত্য এ পর্য্যন্ত যে কেউ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন নি, একথা সত্যের খাতিরে স্বীকার করতেই হবে।

আমরা বাংলা সাহিত্যের প্রথম রাজনৈতিক-রস-সাহিত্যের স্রষ্টাকে তাই সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি।''

২২ : ৬, বৈশাখ ১৩৪৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার প্রথম কাব্য-গ্রন্থ 'পশারিণী'-র আলোচনা। সওগাত সমালোচক লিখেছেন :

''মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা তাঁদেরই একজন, মুসলিম মহিলা কবি হিসাবে বাংলায় যাঁরা সুপরিচিতি লাভ করেছেন। আলোচ্য পশারিণী তাঁর প্রথম কবিতার বই। এতে মোট চুরাশীটি কবিতা আছে। কবিতাগুলি পড়ে স্বতঃই মনে হবে, সিদ্দিকা সাহেবা সত্যি-কারের কবি। প্রত্যেকটি কবিতায় কবি-চিত্তের প্রবল আবেগ ও আবেদন একটা করুণ ছায়া ফেলে অপার মাধুর্য্যের সৃষ্টি করেছে। মানব মনের প্রতি একটা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্লেষণ কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য।

সবগুলি কবিতার ভেতরে একটা চাপা কান্নার সুর যেন স্রোতের মত বয়ে চলেছে। আর সেই ব্যথিত সুরকে সরব করে তুলবার পথে বাধা হয়েছে এঁর প্রবল আত্ম-অভিমান। তাই কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে একাধারে স্বয়ম্ভু এবং মর্য্যাদাবান। শুধু ছন্দের ক্রটী আমাদের মনকে পীড়া দিয়েছে।''

২২ : ৯, শ্রাবণ ১৩৪৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে আবুল ফজলের 'মাটির পৃথিবী' (প্রকাশক—আলবার্ট লাইব্রেরী, ঢাকা।) গল্পগ্রন্থের আলোচনা। সওগাত সমালোচক লিখেছেন :

''বাংলার মুসলমান সমাজে কথাসাহিত্যের দৈন্য শুধু লক্ষণীয় নয় অত্যন্ত লজ্জাকর। এই দৈন্য ও লজ্জার প্রতিকারের প্রবল স্পৃহা নিয়ে, যে ক'জন মুষ্টিমেয় মুসলমান অগ্রণী হন এবং সফলতা লাভ করেন : আবুল ফজল বি-এ, বি-টি, সাহেব তাঁদের অন্যতম।

মুসলমান সমাজে যখন ছোট গল্প ছিল না বললেই চলে, অর্থাৎ অত্যন্ত দুর্ব্বল ভাষা ও ভঙ্গীহীন ছিল যখন তাদের ছোট গল্পের কাঠামো ; সেই দিনে অকস্মাৎ বলিষ্ঠ ভাষা, উন্নত ষ্টাইল ও অপূর্ব্ব টেকনিকে গল্প লিখে আবুল ফজল এসমাজে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন।

'মাটির পৃথিবী' এঁর ১৩৩৪ থেকে ১৩৪২ সন পর্য্যন্ত লেখা ১৮টি ছোট গল্পের সমষ্টি।

নির্ভীকভাবে সত্য কথা বলবার সাহস এর প্রতি গল্পে পরিস্ফুট। গোড়ামী বা ভীরু-তার স্পর্শে কোন গল্পই হঠাৎ সঙ্কুচিত ও অনুজ্জ্বল হয়ে পড়ে নি। নির্ভীকতা ও মুক্তবুদ্ধিই আবুল ফজলের গল্পের বৈশিষ্ট্য। ভাষা যেমন সবল ও আধুনিক তেমনি রসঘন।

কিন্তু হাসি ও ঔজ্জ্বল্যের পাশে পাশে একটা গভীর বেদনা করুণ ও কৃষ্ণায়িত হয়ে আছে। সশব্দ হাসিতে হাসিতে হঠাৎ দেখা যায় দুই চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুও গড়িয়ে এসেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'লাঠ্যৌষধী' গল্পটীর উল্লেখ করা যেতে পারে। অনেকগুলি গল্পে তিনি সমাজের বহু শ্রেণীর ভণ্ডামীর বুকে রূঢ়ভাবে আঘাত করেছেন। আধুনিক মনো-বিশ্লেষণেও তাঁর শক্তি প্রচুর। 'একখানি হাসি' গল্পে রফিকের সাইকোসজী পাঠকের মনকে কিছুক্ষণের জন্য বিস্মিত ও বিমূঢ় করে তুলবে।

'নবাব, আমীর, বাদশাহ' গল্পটী গোড়া ও অন্ধ মুসলিম সমাজের এক করুণ ও লজ্জাকর চিত্র।

আবুল ফজল মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির অধিকারী একথা আমরা পূর্ব্বেই বলেছি। কিন্তু আধুনিক কাল মানুষের বুদ্ধিতে যে পরিমাণ দীপ্তি আশা করে তা হয়ত তাঁর নেই। সেদিক দিয়ে গল্পগুলি আরও উন্নত হলে আমরা অপেক্ষাকৃত বেশী গৌরব অনুভব করতাম। প্রচ্ছদপটে মৌলিকতা না থাকলেও মন্দ হয়নি। মুসলিম সমাজের কথা সাহিত্যের সঙ্গে যারা পরিচিত হতে চান, এ বই তাদের অন্যতম প্রধান পাঠ্য।"

২৩ : ৩, মাঘ ১৩৪৭ সংখ্যায় কাজী নজরুল ইসলাম আলোচনা করেছেন গিরীণ চক্রবর্তী রচিত ও সংগৃহীত 'গ্রাম্যগানের বই' 'সুজনের গান' (হিজ মাষ্টার ভয়েস কোং কলিকাতা) আলোচনা প্রসঙ্গে নজরুল লেখেন : "শ্রীমান্ গিরীন চক্রবর্ত্তী সঙ্গীত-শিল্পী রূপেই বিশেষভাবে পরিচিত। এই পরিচিতির উর্দ্ধে তাঁর যে নির্ব্বিশেষ-রূপ, সেখানে তিনি কবি। পল্লীসঙ্গীতের প্রতি তাঁর প্রীতি—তিনি নিজে পল্লী কবি ব'লে। ভুঁই-চাঁপার মালা-পরা ভুঁইমালির মেয়ের মত তার কবিতার নিরাভরণ-রূপ—'কালচারের' কাল্'চে-পড়া আভরণ-বহুল বিলাসী মনের কাছে হয়ত নিখুঁত মনে হ'বে না। পল্লী-মেয়ের মত এর ছন্দ ও গতি স্বচ্ছন্দ। শহুরে সভ্যতায় ক্লান্ত চোখ ছুটিতে গ্রামে গিয়ে তার অর্দ্ধ-অনাবৃত সহজ সুন্দর রূপ দেখে যেমন জুড়িয়ে যায়, আমার চোখ তেমনি জুড়িয়ে গেছে শ্রীমান্ গিরীণের সংগ্রহ ও স্ব-রচিত গানগুলির অনাড়ম্বর শ্রী দেখে। এঁর গানগুলি প'ড়ে মনে হয়, পল্লী-সঙ্গীত সংগ্রহ কর্‌তে কর্‌তে এর রসের আনন্দের ছোঁয়া এঁর হৃদয় স্পর্শ ক'রেছে। সভ্যতার আওতায় মানুষ হ'য়ে আমরা আমাদের অনুভূতিকে প্রকাশ করি যত রকমে পারি জটিল কুটিল ক'রে। প্রকাশের জটিলতাই আধুনিক সভ্য কবিদের ভঙ্গী বা 'ডিক্‌শন্'। পল্লী-কবিদের প্রকাশ-ভঙ্গী পল্লী-বাসিনীর মতই সহজ সরল—কোথাও হয়ত অর্দ্ধ-নগ্ন। কিন্তু সে নগ্নতায় কামনার আমন্ত্রণ নাই—আছে আত্ম-ভোলা মগ্ন-মনের মাধুরী। আজকালকার কবিতার মিলের 'মিল-এরিয়া' পেরিয়ে যে উদার আকাশ, উন্মুক্ত প্রান্তর, নগ্ন খাল-বিলের সহজ শ্রী—তাকে দেখ্‌তে হ'লে আমাদের পড়্‌তে হয় নিরক্ষর পল্লী-কবিদের গান ও কবিতা। এঁরা যেন প্রকৃতির অন্তরঙ্গ—এবং এঁরাই প্রকৃতির অন্তরে স্থান পেয়েছেন।

সেই আন্তরিকতার প্রেম শ্রীমান গিরীণ পেয়েছেন—শুধু এইটুকু বলার জন্যই আমার এই ভূমিকা। শ্রীমান গিরীণকে জানি, চিনি, তাঁর লেখাতেও তাঁর সেই সহজ সাবলীল পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। তিনি নিজেকে ফাঁকি দেন নি, যা নন তা হ'তে চাননি ; এতেই তাঁর লেখা সার্থক হ'য়েছে।"

২৩ : ৮, আষাঢ় ১৩৪৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে বিশ্ববিশ্বাসের উপন্যাস 'মজদুর' (প্রকাশক—বর্ম্মন পাবলিশিং হাউস) গ্রন্থের সমালোচনা। সমালোচক তাঁর সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে লিখেছেন :

"অধুনালুপ্ত 'অগ্রণী' নামক মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে আলোচ্য উপন্যাসখানা বাহির হইয়াছিল। শ্রমিক ও কৃষকদের জীবন যাত্রাকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য দেশে অনেক সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে—আমাদের দেশ সে দিক দিয়া এখনো বহু পশ্চাতে। বিশ্ববাবুর এই মজদুর উপন্যাসখানা এই দিক হইতে বাঙ্গালার সাহিত্যকে যে অনেকখানি সমৃদ্ধ করিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা দেশের বৃহত্তম শিল্প পাট ও শিল্পের মজুরদের কেন্দ্র করিয়াই উপন্যাসটী রচিত হইয়াছে। নির্য্যাতিত শ্রমিকদের জীবন-যাত্রা, লাঞ্ছিত মানুষের বিদ্রোহ ও ব্যর্থতা, কোলাহল ও সংঘর্ষের মধ্যে নরনারীর বিরহী হৃদয়ের প্রেম ও বেদনা এই উপন্যাসখানিতে সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

২৩ : ১২, কার্তিক ১৩৪৮ সংখ্যায় দুটি গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমটি এস. এ. জাফর (সিকান্দার আবু জাফর) রচিত উপন্যাস 'পূরবী' (প্রকাশক : সালাউদ্দিন আজাদ, কলিকাতা)। সমালোচক লিখেছেন :

"এস, এ, জাফর সাহেবের এই সুদীর্ঘ উপন্যাস 'পূরবী' পড়িয়া আমরা পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। লিখিবার ভঙ্গি এবং ঘটনাসংস্থান চমৎকার হইয়াছে। ভাষা আধুনিক তবে তেমন বলিষ্ঠ নয়। অপূর্ব্ব ও পূরবীর চরিত্র সত্যই অপূর্ব্ব।

ঈর্ষা-বিদ্বেষ এবং স্বার্থকলুষিত গ্রাম্য-জীবনের মাঝে অপূর্ব্ব ও পূরবী বিশ্বস্রষ্টার আশীর্ব্বাদস্বরূপ। ছোট ছোট চরিত্রের মধ্যে শিবু, পিসিমা, ওয়াজেদ ও ওসমান অতি অল্প কথার মধ্যেই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দুষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে যামিনীবাবু ও মাধব প্রায় নিখুঁত।

তবে আমাদের একটু অভিযোগ আছে। অবশ্য সাহিত্যিকের গণ্ডী সমাজ বা ধর্ম্মের সীমা অতিক্রম করিয়াই বিস্তৃত। কিন্তু সাহিত্যিকের স্বসমাজকে উপেক্ষা করাও গৌরব জনক নহে। মুসলমান সমাজের বিস্তৃত ক্ষেত্র শক্তিশালী কথাসাহিত্যিকের জন্য বহুকাল অপেক্ষা করিতেছি।

যা হোক জাফর সাহেব যে ভবিষ্যতে উপন্যাসের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইবেন এবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।"

ঐ সংখ্যায় আলোচিত দ্বিতীয় গ্রন্থ অধ্যাপক শামসুন নাহার মাহমুদ প্রণীত 'শিশুর শিক্ষা' (বুলবুল, কলিকাতা)। আলোচনা করেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অপূর্বকুমার চন্দ। তিনি লিখেছেন : "শিশুর শিক্ষা ও চরিত্রগঠন সম্পর্কে মনস্তত্ত্বমূলক আলোচনা। কেমন করে শিশুকে নির্ভীকতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, সত্যপরায়ণতা ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হবে, কেমন করে তার মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাতে হবে পুস্তকখানিতে তা'ই আলোচিত হয়েছে। শেষ অধ্যায়টি নার্সারী স্কুল সম্বন্ধে। রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি ও স্যার এম, আজিজুল হকের ভূমিকা বইখানির গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষা সম্বন্ধে খুব কম বই-ই লেখা হয়েছে। তার বেশীর ভাগই পাঠ্য-পুস্তক গোত্রী—কাজেই প্রায় অপাঠ্য বলা চলে। তাদের পাঠক গোষ্ঠী সীমাবদ্ধ সেই দুর্ভাগ্য পাঠকদের মধ্যে যাদের পরীক্ষা পাশের জন্য বইগুলো পড়তে হয়। এ বইখানি কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন ঢঙে লেখা। লেখিকা তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য লিখেছেন সরস ভাষায়—পাণ্ডিত্য দেখিয়ে পাঠকদের তাক লাগাবার চেষ্টাও করেন নি। কাজেই বইখানা সত্যিকার বই হয়েছে ; পড়ে আনন্দ পাওয়া যায়।

যাঁরা শিক্ষা চর্চা করেন তাঁদের কাছে বইখানি আদরণীয় হবে। যাঁরা উৎসুক মন নিয়ে বই পড়েন, তারা উপকৃত হবেন। লেখিকাকে সকৃতজ্ঞ অভিবাদন জানাচ্ছি।''

২৪ : ৬, বৈশাখ ১৩৪৯ সংখ্যায় আলোচিত হয়েছে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত ম্যাকসিম গোর্কির উপন্যাস 'একদিন যারা মানুষ ছিল' (প্রকাশক : শ্রীভুবনমোহন মজুমদার। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা)। সমালোচক লিখেছেন :

''হামসুনের 'হাঙ্গার' অনুবাদ করে পবিত্রবাবু সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি তাঁর পূর্ব্ব-গৌরব অক্ষুণ্ন রেখেছেন।

সর্ব্বহারা জীবনের সঙ্গে যাঁর ছিল গভীর ব্যক্তিগত পরিচয়, নিঃস্ব নিপিষ্ট মানবাত্মা যাঁর জীবনকে ঘিরে অহোরাত্র আর্ত্তনাদ করেছে, সেই ম্যাকসিম গোর্কির উপন্যাস---অনুবাদক পবিত্রবাবুও রূঢ় বাস্তব জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত, সুতরাং অনুবাদে আন্তরিকতা স্বতঃই প্রকাশমান।

একটী দুর্ভাগার দল। 'একদিন যারা মানুষ ছিল', কিন্তু এখন আর নেই। সমাজ, রাষ্ট্র ও পারিপার্শ্বিক হীনতা তাদের ছুঁড়ে ফেলেছে অন্ধকারের অতল গভীরে। অধঃপতনের শেষ ধাপে তারা নেমে গেছে। অথচ এরা একদিন মানুষ ছিল, থাকতে পারতো। এই মাতাল মানুষগুলির জীবনযাপন প্রণালী গোর্কির শক্তিশালী তুলিতে মর্ম্মন্তুদ রূপ লাভ করেছে।

ক্যাপ্টেন আরিস্তিদ কুবালদা একটি অদ্ভুত চরিত্র। যে জীবনকে সে অপরিসীম ভালবাসতো সেই জীবনকে সে আজ পথের ধুলির মত তুচ্ছ করে। মাঝে মাঝে ঘৃণাও করে। মানুষের প্রতি তার এককণা বিশ্বাস নেই। ভূতপূর্ব্ব মাষ্টার ফিলিপ, মার্তিয়ানফ্ টিয়াপা এরা সবাই যেন এক একটা অসাধারণ মানুষের প্রেত। পৃথিবীর শ্রদ্ধায় এদের অধিকার ছিল, কিন্তু আজ এদের দেখলে ভয় হয়, ঘৃণা হয়।

পবিত্রবাবু গভীর দরদ দিয়ে এই বিখ্যাত উপন্যাসের অনুবাদ করেছেন। ভাষা ও ষ্টাইল মনোরম। মৌলিক গ্রন্থ বলে ভুল হতে পারে। ছাপা ও প্রচ্ছদ প্রশংসার যোগ্য। এ বইয়ের বহুল প্রচার সম্বন্ধে আমাদের কণামাত্র সন্দেহ নেই।''

২৭ : ৬, বৈশাখ ১৩৫২ সংখ্যার পুস্তক-পরিচয়ে বসুধা চক্রবর্তী আলোচনা করেছেন ফররুখ আহমদের কাব্য গ্রন্থ : 'সাত সাগরের মাঝি' (নওরোজ পাব্লিসিং হাউস, কলিকাতা)। সমালোচক লেখেন : ''মুসলমান এ-দেশের রাজা ছিল, সে বেশী দিনের কথা নয়। রাজ্য সে হারাল বিদেশীর চক্রান্তে কিন্তু বৃহত্তর কারণ বোধ হয় তার নিজের আত্ম-বিচ্যুতি। যে বিদেশী রাজত্ব দেশে স্থাপিত হলো তার সঙ্গে কোনো সংযোগ স্থাপন করতে স্বভাবতই সে পরান্মুখ হলো, ইত্যবসরে অন্যান্য জাতি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের কার্যকর অবস্থায় ঠাঁই নেবার আহ্বান গ্রহণ করলে।···

ইতিহাসের গতিপথে তারপর এলো ভারতের জাতীয় জাগরণ। সে দিন মুসলমান আশা করেছিল সে জাগরণের মধ্যেই নিজেকে ফিরে পাবে। আশার আরও কারণ ছিল এই যে, জাগরণের সূচক ও পরিপূরক যে রাজনৈতিক আন্দোলন তাতে মুসলমানের ধর্ম্মীয় আত্মমর্যাদা রক্ষা করবার সঙ্কল্প স্বীকৃত ছিল। কিন্তু অচিরে সে সঙ্কল্পের প্রত্যক্ষ কারণ হলো বিগত; এবং দেখা গেলো যে, জাতীয় আন্দোলনের গণ্ডীতে ও পরিপ্রেক্ষিতে

মুসলমানের সম্পূর্ণ অভীপ্সার নিশানা নেই। ইতিমধ্যে ব্যাপক জাগরণের ধাক্কায় ও প্রেরণায় প্রত্যেক লোকসমষ্টি নিজের দিকে ফিরে চাইচে; সংখ্যালঘিষ্ঠ লোক, সম্প্রদায় অনুভব করচে যে, দেশে জাগরণকে তার নিজস্ব প্রয়োজনে প্রসারিত করে না দিলে তার সম্পূর্ণ মুক্তি নেই। রাজনৈতিক জাগরণ চাইল সামাজিক আত্মোদ্বোধনে বিস্তৃত হতে। কেবল ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে নয়। কৃষক শ্রমিকের শ্রেণী চেতনার তাইতে উন্মেষ, নারীজাতির রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার এবং সামাজিক অধিকার অর্জনের তাইতে শুরু। অচিরে মুসলমান অনুভব করলে জাতীয় আন্দোলনে তার বিশিষ্ট প্রয়োজনের অস্বীকৃতি। অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তা তার পক্ষে যথেষ্ট হলো না, কেবল এই জন্যে নয় যে তাতে তার নিজস্বতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি ছিল না। অবিলম্বে সে জাতীয়তা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভাবনার রঙে রঞ্জিত হয়ে দেখা দিল। মুসলমান বোধ করলে যে তাতে তার আশ্রয় নিঃশেষিত হয়েছে। তারপর জাতীয়তা ক্ষমতা অর্জন করতে আরম্ভ করেচে। তখন মুসলমানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যরক্ষার আকাঙক্ষার সঙ্গে মিশল রাজনৈতিক নিরাপত্তার ব্যগ্রতা। আত্মসম্বিৎ ফিরে পাবার জন্যে আগ্রহ হলো তার প্রবল। যে প্রাণশক্তিতে ইসলাম একদা জয় করেছিল এ'দেশ, জয় করেছিল বহু দেশ, তাই সে ফিরে পাবার জন্যে ব্যাকুল হলো। একদা বাংলাদেশে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর শেষের দিকের রচনায় সে ব্যাকুলতাকে সত্যরূপ দিতে চেয়েছিলেন; এখন ফররুখ আহমদের কাব্যে তা' যেন প্রথম সমগ্র রূপ পেলো:

সে বিপুল প্রাণবহ্নি তবু আজো মরে নাই জানি।
হে বলিষ্ঠ! যদি তুমি ফিরে এস এ-পথে বারেক,
এই মৃত মরুতটে যদি তুমি দাঁড়াও সন্ধানী,
মানুষের এ মিছিলে দিতে পারো যদি গতিবেগ,
অনায়াসে সেই ঝড় আবার তুলিবে তারা টানি,...

এ' প্রপাগাণ্ডা নয়। এতে আছে সমগ্র জীবনের জাগরণের অঙ্গিকার। কেবল সমষ্টির জাগরণের নয়। মানুষের ব্যক্তিজীবনও এতে চরম আশ্রয় যাঞ্চা করচে। রাজনীতি-অর্থনীতি পেরিয়ে এতে আত্মার পরম আকুতি। তাইতে এ' কাব্য-দ্বন্দ্বও আঙ্গিকে সম্পূর্ণ রসোত্তীর্ণ হলো। কবিতার পর কবিতা পড়ে' চলি; অনুভব করি পূর্ণ প্রাণের তরে পূর্ণ জাগ্রত মানুষের আকুলি-বিকুলি। আজকের জীবনের অপূর্ণতা, আজকের বাস্তবের বেদনা আকুলতাকে আরও দুর্দম করে তুলল:

আর যেন ক্লিষ্ট নাহি হয়,
আর যেন ত্রস্ত নাহি হয়,
পথে দেখি পীড়নের ফাঁদ;
আর যেন ভ্রষ্ট নাহি হয়
মানুষের ভবিষ্য দিনের আউলাদ।

আল্লার দরবারে কবি ফররুখ আহমদ ফরিয়াদ জানিয়েছেন। তবে কি তিনি বিপ্লবী নন? এ' প্রশ্নের উত্তর দেবার দায়িত্ব তিনি নেন্ নি। শুধু দেখি, পথের পাশে অনাহারে মৃতজনের লাশ দেখে তার অন্তরাত্মা ক্ষোভে জ্বলে উঠল:

মানুষ তোমার হাতে করিয়াছে ক'বে আত্মদান,
তারি শোধ তুলে নাও হে জড়-সভ্যতা শয়তান!
শিশুর শোণিত হেসে অনায়াসে করিতেছে পান,
ধর্ষিতা নারীর দেহে অত্যাচার করিছ অম্লান,

জনতার সিঁড়ি বেয়ে উঠে অতি অনায়াসে
তারে তুমি ফেলে দাও পথপ্রান্তে নর্দমার পাশে।

জাগরণ যদি সত্য হয় তবে কি তা' আপনার সম্পূর্ণ পথ ক'রে নেবে, না? কবির প্রয়োজন জীবনের হারানো সূত্র খুঁজে ফিরে পাওয়ার, সবাইর হাতে তা তুলে দেবার। তাই তিনি ইসলামের প্রাণের জোয়ারে পাড়ি দিতে চান সাত সাগরে। মানুষের বেদনার তরঙ্গভঙ্গে তার সে যাত্রা : এই তার অপরূপ প্রকাশ :

তবু শুন্‌বে কি, তবু শুন্‌বে কি সাত-সাগরের মাঝি!
শুক্‌নো বাতাসে তোমার রুদ্ধ কপাট উঠেছে বাজি;
এ নয় জ্যোছনা—নারিকেল শাখে স্বপ্নের মর্মর,
এ নয় পরীর দেশের ঝরোকা নারঙ্গী-বন্দর
এবার তোমার রুদ্ধ কপাটে মানুষের হাহাকার,
ক্ষুধিত শিশুর কান্নায় শেষ সেতারের ঝংকার।

বইটির প্রতি কবিতারই রসাবেশ সৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে। কথা উঠেছে আরবী-ফারসী শব্দের অত্যধিক ব্যবহার নিয়ে : কিন্তু সম্পূর্ণ ভাব-যোজনার জন্যে বোধ হয় তার দরকার ছিল। কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন যে, ঐ শব্দগুলির মানে আলাদা লিখে দিলে ভালো হতো। তা' হয়তো কিছুটা হতো, কিন্তু শুধু আলাদা অর্থ পড়ে ভাবের সম্পূর্ণ অনুসংগ বোঝা সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। স্বীকার করতেই হবে যে, সুস্থ সাংস্কৃতিক আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে বাংলা ভাষায় নতুন এক সমস্যা জেগে উঠেছে। ভাষার দ্বিত্বের সম্ভাবনাও একেবারে অলীক নয়। কিন্তু সে বিচারে বর্তমান কাব্য-প্রসঙ্গকে বিড়ম্বিত করবার প্রয়োজন নেই। বাংলার সুদূরতম পল্লীতেও আজ মুসলমান আত্মোপলব্ধিতে পেতে চাইছে নূতন প্রাণ। তার সঙ্গে বাস্তব সংযোগ যার আছে তার এ' খবর জানা আছে। তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাবার প্রয়োজন প্রতি বাঙ্গালীর যদিও এ' প্রয়োজন এখনও বেশী লোকের উপলব্ধিগত নয়। ফররুখের কাব্যে তার মর্মগত পরিচয়; এ-কাব্যের আছে গভীর চিত্তোদ্ভূত রস-সমৃদ্ধি।"

এস. ওয়াজেদ আলির দুইটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ : 'ভবিষ্যতের বাঙালী' (প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা) ও 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' (দি বুক হাউস, কলিকাতা) আলোচিত হয়েছে ২৭ : ১, অগ্রহায়ণ ১৩৫১ সংখ্যায়। সংক্ষিপ্ত ঐ আলোচনায় সমালোচক লিখেছেন :

"যুগোপযোগী চিন্তাধারা জাতির সংস্কৃতিপুষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইলে সমাজ-জীবনের প্রাণস্রোতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই দিক হইতে আমরা বরাবরই কাঙাল। আমাদের সমাজে প্রবন্ধকার মুষ্টিমেয় তাহার মধ্যে অনেকেই ইদানিং লেখনী চালনা প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ রাখিয়াছেন। যাহারা এখনো সাম্প্রতিক সঙ্কট-বিপর্যয় সম্পর্কে দেশের মানুষের দৃষ্টি কৌতূহলী রাখিতে যত্নবান রহিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে যশস্বী এস. ওয়াজেদ আলি সাহেব অন্যতম।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা কোনক্রমেই সার্থক সাহিত্যজীবীর পক্ষে উপেক্ষার বিষয় হইতে পারে না। মানুষ আজ মানুষের মতই বাঁচিতে চায়। অকথ্য যন্ত্রণা, অত্যাচার, অবিচারের জগদ্দল পাষাণের চাপ হইতে বাহির হইয়া আজকের মানুষ নূতন জগত—নূতন রাষ্ট্র—নূতন সাহিত্য—নূতন জাগরণের ভিতর তাহার সত্যিকার স্থান খুঁজিয়া লইতে চরম উৎসুকী। ওয়াজেদ আলি সাহেবের 'ভবিষ্যতের বাঙালী' ১১২ পৃষ্ঠার প্রবন্ধের

বই । এই পুস্তকটির লেখন চাতুর্য্য অদ্ভুত দরদে ও মনুষ্যধর্ম্মের সৌকুমার্য্যে সার্থক উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাঁহার স্বপ্ন সাহিত্যিক-উল্লাসে অবাস্তমুখী হয় নাই ; স্বাধীন রাষ্ট্রে মানুষের মর্য্যাদা—রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্বন্ধ-সংযোগ—জাতীয় জাগরণে মানুষের ধর্ম্ম, তদুপরি হিন্দু ও মুসলমানের অচ্ছেদ্য ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল আলোকে রূপায়িত হইয়াছে,—যাহা চরম সত্য, জীবনে এবং সমষ্টিগত মানুষের কৃষ্টিগত প্রাণস্রোতে যাহা যথার্থই সম্ভাবিত সত্য, তাহাকে তিনি এড়ান নাই, নিজের চিন্তাধারাকেও দ্বিধাবিভক্ত হইতে দেন নাই।

দ্বিতীয় পুস্তক, 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' পরিবেশনে ভিন্ন ধর্ম্মীয় হইলেও ইহারও প্রয়োজন আছে। গম্ভীর চিন্তাশীল মানুষের মনোবিকলনে যে-সব সাধারণ চিন্তাজাল সময়-সময় আনন্দরসের সঞ্চার করিয়া থাকে, তাহার ৩৩টী তরঙ্গ হাল্কা আমোদে-ঝঙ্কারে আমোদিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে 'সাকী ও কবি'—'মাছ ধরা'—'জীবনে প্রকৃতির প্রভাব'—'পিকনিক'—'প্রদীপ ও পতঙ্গ'—'বাক্যলাপ'—'বেড়ানর আনন্দ' আশ্চর্য্য রকমের সহজ ভাষায় পূরোপূরি রসোত্তীর্ণ সুন্দর রচনা। আমরা পুস্তক দুইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।''

২৭ : ৭, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২ সংখ্যায় বসুধা চক্রবর্তী আলোচনা করেছেন কবি মহীউদ্দীনের গল্পগ্রন্থ 'নির্যাতিত মানবতার নামে' (দি বুক এম্পোরিয়ম লিমিটেড, কলিকাতা।) তিনি লিখেছেন : ''বর্তমান রাষ্ট্রীক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে নির্যাতিত মানুষের যে তীব্র বেদনা লোক-চক্ষু অন্তরালে নানা ঘটনার স্রোতে বয়ে চলেছে, সাদা চোখে তার পরিচয় আমরা বিশেষ পাইনে : পাই, যখন কেউ দরদ দিয়ে তা দেখেন ও লেখেন। আলোচ্য বইটির প্রথম গল্পটি তারই এক নিখুঁত ও সমগ্র প্রকাশ। বিশেষত মুসলমান সমাজের ঘনিষ্ঠ আবেষ্টনে যে রূপ ধরেছে মানুষের বেদনা, তার সাক্ষাৎ পাই আমরা প্রায় সব গল্পগুলিতে। আর পাই কেকায়েৎউল্লা শিকদারের মতো বিচিত্র অথচ আত্মস্থ চরিত্রের সাক্ষাৎ।

কিন্তু, লেখকের বেদনা কোন বিশেষ সমাজের বেদনা নয় ; সকল মানুষের বেদনা তার অন্তরে-বাইরে উদ্বেল হয়ে উঠেচে। 'রবীন্দ্রনাথের শব' নামক মর্মস্পর্শী কথিকাটিতে প্রকাশ পেলো মহাকবির মৃত্যু মুহূর্তের মর্যাদা রক্ষা করতে জনতার অসামর্থ্যে তীব্র ক্ষোভ। 'দেবতা' গল্পটিতে নিগূঢ় রূপে ফুটে উঠেলো মানুষের মনুষ্যত্ব, সে সরল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যাকে আশ্রয় করে আছে রূপোপজীবিনীর হৃদয় শত-বিচ্যুতির মধ্যে থেকেও। সব শেষে ওলফতের চোখে ভেসে উঠ্লো আজকের ধ্বংস-লীলা পেরিয়ে নূতন প্রভাতের স্বপ্ন ; ছুটলো সে ন্যায়ের কুঠার হাতে নিয়ে। এ বই না পড়লে জীবনের পরিচয় লাভ আমাদের অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, এ অত্যুক্তি নয়।''

২৮ : ২, পৌষ ১৩৫২ সংখ্যায় সমালোচক শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ 'চন্দ্র-সূর্য' (অভিবাদন গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা) সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হল :

''প্রগতিশীল সাহিত্যসমাজে শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নাম অপরিচিত নয়। বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা গল্প প্রবন্ধাদি প্রকাশ করে তিনি প্রশংসিত ও নিন্দিত দুই-ই হয়েছেন। 'চন্দ্র-সূর্য' তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ।

'কল্পকুয়াশা', 'ক্রোড়পত্র', ও 'ইশতেহার' এই তিনভাগে বিভক্ত গ্রন্থখানিতে আত্ম-কেন্দ্রিক স্বপ্নবিলাসী কবিমনের সুস্পষ্ট প্রগতিশীল পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। প্রথম খণ্ডে

সামরিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত এমন কতকগুলি কবিতা আছে যা নজরুল ছাড়া বাংলা সাহিত্যে আর কেউ আমদানী করেন নি। দ্বিতীয় খণ্ডে সবগুলিই প্রেমের কবিতা আধুনিক বামপন্থী কবিরা প্রেমের প্রতি যে একটা ধিক্কারজনক 'আনন্দমঠী' ভাবধারা পোষণ করে থাকেন শান্তিরঞ্জনে তার ব্যতিক্রম দেখে খুশী হলুম। কবির মূল সুর, সমাজ-বিদ্রোহের বাণী, মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে তৃতীয় খণ্ডে। এখানে তিনি নির্ম্মম নিঃশঙ্ক। অহিংসাবাদে আচ্ছন্ন পাঠকের কাছে এটা অস্বস্তিকর ঠেকলেও কবির প্রদীপ্ত ভঙ্গি ও বলিষ্ঠ মননশীলতা অনস্বীকার্য্য।''

ঐ সংখ্যায় জুলফিকার হায়দারের কাব্যগ্রন্থ 'ভাঙা তলোয়ার' (মৃত্তিকা, কলিকাতা) আলোচনা করেন নেপালশঙ্কর সেন। তিনি লেখেন :

''কবি জুলফিকার হায়দার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে অবিদিত-নামা নহেন ; কিন্তু 'ভাঙা তলোয়ার'ই তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্য-সঞ্চয়নের যে বৈশিষ্ট্য সর্ব্ব-প্রথমেই পাঠকের চিত্তকে আকৃষ্ট করে, তাহা কবির অকপট আন্তরিকতা ও তাঁহার চিন্তাধারার সুদৃঢ় পৌরুষ। 'ভাঙা তলোয়ার' কতকগুলি বিভিন্ন বিষয়ক কবিতার সঙ্কলন হইলেও, কবিতাগুলির অন্তর্নিহিত ভাবধারার ঐককেন্দ্রিকতা ও সৌষম্য গ্রন্থখানিকে একটি সুসংহত পরিপূর্ণতার মর্য্যাদা দান করিয়াছে।

'ভাঙা তলোয়ার' নাম হইতেই এই গ্রন্থের ভিত্তিভূত ভাবধারার একটি স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায়—তাহা কবির বৈপ্লবিক জীবন-দৃষ্টি। রাষ্ট্রে ও সমাজ-ব্যবস্থায় যুগান্ত-প্রবাহী অত্যাচার-উৎপীড়নের যে হলাহলস্রোত মনুষ্যত্বের অন্তরতম অমৃত-সত্যকে অবমাননা করিতেছে, তাহারই বিরুদ্ধে কবির লেখনী অগ্নি বর্ষণ করিয়াছে। তাঁহার এই বৈপ্লবিক চিন্তা রাষ্ট্রনীতিবিদের নিঃসত্ত্ব-গবেষণাসঞ্জাত নহে ; এই চিন্তার উৎসমূলে রহিয়াছে তাহার গভীর মানবিকতা ও মমত্ব-বোধ ; তাঁহার বিপ্লব তাই শুধু ভাঙ্গিবার সুর গাহে না, গড়িবার স্বপ্নও দেখে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কৈফিয়ত' কবিতাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে শোচনীয় চারিত্রিক ক্লৈব্য অধঃপতনের সর্ব্ববিধ্বংসী স্রোতধারায় বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে, তাহার প্রতি কবির কঠোর নির্ম্মম কশাঘা-তের মূলে রহিয়াছে জাতির প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম মমত্ব-বোধ। এই মমত্ব-বোধই কবিতাটির শেষাংশে জাতির কল্যাণ কামনায় উদ্বুদ্ধ বিপ্লবীপ্রতিজ্ঞাকে একটি বিশিষ্ট মহনীয়তায় মণ্ডিত করিয়াছে।

কবির এই বৈপ্লবিক চিন্তার সঙ্গে তাঁহার ইস্‌লমীয় আদর্শবাদও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইস্‌লাম যে মহাসাম্যের আদর্শ বিশ্বজনের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছে, তাহার মধ্যে বস্তুতঃ একটি অসাধারণ বৈপ্লবিক শক্তিমত্তা রহিয়াছে। বিশ্বসভ্যতার এই চরম সঙ্কটলগ্নে, স্বার্থদ্বেষের সংঘাতসম্ভূত তীব্র বিষে জগৎ যখন জর্জ্জরিত, তখন এই উদার ইস্‌লামীয় আদর্শবাদের দ্বারা অনাচার ও নিপীড়নকে নির্ম্মূল করিয়া মানব সমাজকে নবজীবন দানের স্বপ্ন কবি দেখিয়াছেন।

ছন্দের দিক দিয়া গ্রন্থখানিকে দু'এক স্থলে বিচ্যুতি লক্ষিত হয় ; কিন্তু কবির ভাষার ওজস্বিতা ও সজীবতা উল্লেখযোগ্য। অস্পষ্টতার কুহেলীজালে সমাচ্ছন্ন অতি-আধুনিক বাংলা কবিতার যুগে আলোচ্য গ্রন্থখানির ভাষার অনাড়ষ্ট অর্থবত্তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'ভাঙা তলোয়ার' কবিতাটির শেষাংশে কাজী নজরুল ইস্‌লামের প্রভাব সুস্পষ্ট হইলেও ভাবধারায় যে একটি সুপরিলক্ষিতব্য স্বকীয়তা আছে তাহা অনস্বীকার্য্য। ছন্দনৈপুণ্যে ও ভাবের মৌলিকতার দিক দিয়া 'সাগর জল' কবিতাটি বিশেষ প্রশংসনীয়। 'তুমি' কবিতাটিও ভাবের আধুনিকতার দিক দিয়া লক্ষণীয় ও স্মরণীয়।''

২৯ : ৩, মাঘ ১৩৫৩ সংখ্যায় ইবনুল আরাবী আলোচনা করেছেন মতিউল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ 'ফরিয়াদ' (আল্‌হাম্‌রা লাইব্রেরী, কলিকাতা)। সমালোচক লিখেছেন :

''আধুনিক মুসলিম কবিদের মধ্যে যাঁরা পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন তাঁদের মধ্যে মতিউল ইসলাম একজন। আলোচ্য 'ফরিয়াদ' বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কবিতার সংকলন। কবি হিসাবে কম-বেশী সুনাম অর্জন করলেও আমাদের অনেক কবিরই কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় না নানা কারণে তার মধ্যে আর্থিকটাই সর্বপ্রধান। 'ফরিয়াদ' প্রকাশিত হওয়ায় আমরা তাই আনন্দিত। কাব্যাদর্শ তাঁর মৌলিক নয়, অনেক স্থলে তার প্রকাশও অত্যন্ত সাধারণ--

তুমি যত চাও তার বেশী পাও মোর নাই কানাকড়ি,
আমি ক্ষুধাতুর, তোমার প্রাসাদে অন্নের ছড়াছড়ি!

তবু আজকের জীবনে এইটেই সবচেয়ে বড়ো সমস্যা, যে সমস্যা নিয়ে সারা পৃথিবীতে একটা সংগ্রাম-ঘূর্ণায়িত হয়ে উঠছে। এই ফরিয়াদই আলোচ্য কবিতা গ্রন্থের বড়ো কথা, যদিও একমাত্র কথা নয়। প্রথম দিকের 'দাবানল' থেকে 'সেতু' পর্যন্ত কবিতার পটভূমি গত আগষ্ট দাংগা। এই দাংগার 'অতল সমুদ্রে লুপ্ত মনের ভাস্কর'---

তোমার সূর্য, তোমার কৃষ্টি, তোমার যে গৌরব
দুর্যোগ ঘন অগ্নি-ঝড়েও মানে নাই পরাভব
তোমায় আজিকে ছড়াতেই হবে সে পথের সৌরভ।

যদিও তোমার রাস্তা রুখেছে অসংখ্য জল্লাদ
যদিও ফুঁসিছে কুটিল সর্প, শ্বাপদের অনুনাদ
সম্মুখে তবু এগুতেই হবে পাহাড়ের ভেঙে বাঁধ।

'এবার নূতন দেশ' থেকে শেষ পর্যন্ত কবিতার বিষয়বস্তু শ্রেণী চেতনা শিল্পসর্বস্ব নীতি বা কল্পনাবৃত্তি মতিউল ইসলামের পেশা নয়, 'ফরিয়াদ' তাঁর জীবনবোধের কবিতা। প্রেম, বা আধুনিক কবিতার এর দোষ—সমাজ-জীবনের কতকগুলো লোভনীয় পংকিলতা— তাঁর কবিতায় স্থান পায়নি। পূর্ণতর জীবন তাঁর লক্ষ্য—

মুছে ফেলো অসুস্থ হৃদয়
দুরন্ত সূর্যের প্রেমে ভরে দাও অন্ধ বনতল,
ছায়া থাক ছায়া হয়ে কায়ার বিচ্ছেদ কর জয়
জীর্ণ ফলে এ জীবন হোক্ দীপ্ত সত্য সমুজ্জ্বল।
মৃত্তিকা কুমারী যেথা স্ফীতবক্ষ সাহসে দুর্জয়
ফলাও সেখানে তুমি বলস্ফূর্ত সোনার ফসল।

বিপ্লবপন্থী না হলেও, ক্লীব দুঃখবাদ মতিউল ইসলামে নই। 'ফরিয়াদ'-এর সুর আশাবাদের সুর।

জীবনের সঙ্গে কাব্যের সংযোগ হবে গভীর আজকের দিনের এই দাবী তাঁর কবিতায় প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে সব আধুনিক কবি নিছক বুদ্ধিবৃত্তির বশে আবেগহীন দুর্বোধ কবিতা পাঠকদের ঘাড়ে চাপিয়ে কাব্যের প্রতি তাদের মন বিরূপ করে তুলেছেন, তাদের

ফ্যাশন-এর মোহ মতিউল ইসলামকে পেয়ে বসেনি এজন্য আমরা আনন্দিত। তাঁর সীমাবদ্ধ-তার প্রথমদিকে উল্লেখ করেছি। এই সীমাবদ্ধতার জন্য তাঁর কবিতা সুস্পষ্ট হয় উঠতে পারেনি, তবু এটা ভুললে চলবে না যে, 'ফরিয়াদ' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রত্যেক পাঠককেই কাব্যগ্রন্থখানি আনন্দ দেবে।''

২৯ : ৪, ফাল্গুন ১৩৫৩ সংখ্যায় আলোচিত হয় শামসুল হুদা সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ 'কয়েকটি কবিতা' (নূর লাইব্রেরী, কলিকাতা) ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর 'প্রেরণায় ও প্রভাবাধীনে যাঁরা কাব্য সাধনা করেছেন তাঁদের বাছাই কবিতার সংকলন এটি।' গ্রন্থটির ভূমিকা (পরিচিতি) লেখেন কাজী আবদুল ওদুদ। সমালোচক গ্রন্থটি প্রসঙ্গে লিখেছেন :

''দুঃখের বিষয়, প্রথমেই বলতে হচ্ছে যে সংকলনটি আমাদের নিরাশ করেছে। কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব লিখিত 'পরিচিতি পড়ে উক্ত সাহিত্য-সমাজকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে ধারণা হয়, কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে তার কৃতকার্যতা যদি এই সংকলনখানিতে বিধৃত হয়ে থাকে তবে নিরাশ হওয়ার কথা বই কি। নজরুলের 'উদ্বোধন-গীতি'কে স্থান দেওয়ার অর্থ বুঝি, কিন্তু তাঁর 'গজল-গান', এ, এফ, এম, আবদুল হকের 'কিশোরী', এ, জেড, নূর আহ্‌মদের 'আসমানী' এবং আরো বহু কবিতায় 'বুদ্ধির মুক্তি' ও 'জীবনের অশেষ সম্ভাবনা' খুঁজতে হবে না নিশ্চয়ই? তাছাড়া, অনেক কবির এমন কবিতা সংকলিত হয়েছে যেগুলো তাঁদের প্রতিনিধিস্থানীয় নয়। উদাহরণ : নজরুলের 'গজল-গান' সুফী মোতাহার হোসেনের সনেটটি, সানাউল হকের 'এই চাঁদ' ছাড়া অন্য কবিতাগুলো, জসীম উদ্দীনের কবিতা দু'টি। কিন্তু এর চেয়েও বড়ো ত্রুটি সংকলনখানির আছে।

'পরিচিতি'তে ওদুদ সাহেব নিজেই বলেছেন : 'কাব্যকলার দিক দিয়ে নিখুঁৎ কবিতার সন্ধান এতে যাঁরা করবেন তাঁরা মোটের উপর হতাশ হবেন'। কাব্যক্ষেত্রে অনগ্রসর মুসলমান আমরা নিখুঁৎ কাব্যকলার সন্ধান করে পেরে উঠবো না জানি, অতএব, খুঁৎ থাকলেও কবিতা পেলেই আমরা সন্তুষ্ট হতে রাজী। 'কয়েকটি কবিতা'য় এই বস্তুটিরই অভাব আমরা বিশেষভাবে অনুভব করেছি। এরূপ অবস্থায় কবিতা গুলোর 'অকৃত্রিমতা, ঋজুতা আর অর্থপূর্ণতা'-র কথা আদৌ ওঠে না। কাব্য ও শিল্পকলার এই গুণগুলোর মূল্য অনস্বীকার্য, 'বুদ্ধির মুক্তি' ও 'জীবনের অশেষ সম্ভাবনা'র প্রতিও আমাদের সহানু-ভূতি আছে, কিন্তু সর্বপ্রথমে যা প্রয়োজন তা কাব্যগুণ। আলোচ্য সংকলনখানিতে এই গুণটির বড় অভাব। অবশ্য কবিতাও এতে আছে, যেমন—দিদারুল আলমের 'চির-চপল', মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'মাধুরীলোকে', আবদুল কাদিরের 'আঁখি ও আকাশ', সুফী মোতাহার হোসেনের 'হার-মানা', সানাউল হকের 'এই চাঁদ' এবং কচিৎ আর দু একটি। কিন্তু কবিতা নয় এরূপ রচনার সংখ্যাই বহুগুণ অধিক। এই কারণে সংকলনখানিকে আমরা সার্থক মনে করতে পারিনি।''

ঐ একই সংখ্যায় (২৯ : ৪) সমালোচক ইবনুল আরাবী আবুল ফজলের উপন্যাস 'চৌচির' ও 'সাহসিকা' প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন :

''আবুল ফজল সাহেবের 'চৌচির' বা 'সাহসিকা' কোনোটিই উপন্যাস হয়ে ওঠেনি। উপন্যাসের বিস্তার ও গভীরতা কোনোটিরই নেই। 'চৌচির'-এ তিনি সমাজের সংকীর্ণ-তাগুলো সম্বন্ধে কতকটা সচেতন, কিন্তু ঔপন্যাসিক সত্য, ঔপন্যাসিক বাস্তবতা তাঁর আয়ত্তাতীত। 'সাহসিকাতে' এই দুর্বলতা আরও অধিক। আজকের এই অর্থনৈতিক ও নৈতিক ভাঙনের দিনে, ভারতের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মাঝখানে সমস্যাসংকুল

জীবনের সহিত সম্পর্কহীন ও নিছক দুর্বল কল্পনা দিয়ে বুননো উপন্যাস প্রকাশের কোনো সার্থকতা নেই। 'সাহসিকা' বদ্ধ পাগলের অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ কাহিনী মাত্র। বাস্তববোধবিবর্জিত ভাবপ্রবণতায় পূর্ববর্তী উপন্যাসখানিও ভারাক্রান্ত।''

এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে পরের সংখ্যায় (২৯ : ৫, চৈত্র ১৩৫৩) ইবনে বতুতা 'চৌচির' ও 'সাহসিকা' শিরোনামেই যা লেখেন তা উল্লেখযোগ্য। সমালোচক লেখেন :

''গত ফাল্গুন সংখ্যা সওগাতের সমালোচনা বিভাগটি নিয়ে ক'টি কথা প্রসঙ্গেই এই আলোচনার অবতারণা—অসমীচীন মনে না হলে সহৃদয় পাঠক পাঠিকার কাছেও আমার বক্তব্য পেশ করতে পারেন।

ঐ সংখ্যার পুস্তক সমালোচক ইবনুল আরাবী সাহেব মোট ৭৪টি শব্দে আবুল ফজলের 'চৌচির' ও 'সাহসিকা'র সমালোচনা করেছেন। বড় ছোট মোট সাতটি বাক্যের একটি মাত্র সুর : 'চৌচির' ও 'সাহসিকা' নেহাৎ দুর্ব্বল ও অসার্থক রচনা।

তিনি বলেছেন, দুটির কোনোটিই উপন্যাস হয়ে ওঠেনি ; তিনি বলেছেন উপন্যাসের বিস্তার ও গভীরতা কোনোটাতেই নেই ; তিনি আরো বলেছেন ঔপন্যাসিক সত্য, ঔপন্যাসিক বাস্তবতা তাঁর (লেখকের) আয়ত্তাতীত আজকের অর্থনৈতিক ও নৈতিক ভাঙন এবং রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত্তের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন—বলেছেন তা থেকে উপন্যাস দুটি বিচ্ছিন্ন।

আরাবী সাহেব কি জানেন, 'চৌচির' কোন সময়কার রচনা ? তিনি প্রথম সংস্করণের সময় তারিখটা লক্ষ্য করেছেন ? তিনি কি মানেন না আজ থেকে বারো বছর আগেকার বাঙালী মুসলিম সমাজ আর এখনকার তারা কোনো দিকেই এক নয় ? গত সাত বছরে পরিবর্ত্তনের ঝঞ্ঝাবাতে বাঙালীকে সেই সঙ্গে বাঙালী মুসলমানকে কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে তাতে তাঁর দৃষ্টি অগোচর থাকেনি—তবু বারো বছর আগেকার উপন্যাসে আজকের সমাজ, আজকের ঘূর্ণাবর্ত্ত দেখতে চাইলে সেটা কি আবদারের মত শোনায় না ?

'উপন্যাসের বিস্তার ও গভীরতা' কথাটা বেশ ভারিক্কি—কিন্তু বাঙালী মুসলমান সমাজের পরিবেশে তার পরিধি কোথায় ? দুশো বছরের খণ্ড বিচ্ছিন্ন মুসলমান সমাজের কোথাও ঐক্যবদ্ধ জীবনধারার পরিচয় নেই। মুসলমান কৃষক সমাজে ঔপন্যাসিক বিস্তারের কিছু আশা করা যায়—কিন্তু সেখানেও এক অস্থির স্বল্প পরিচিত মানস মানুষকে অসংবদ্ধ করে রেখেছে।

তার চেয়েও বড় কথা—এ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন আর একটি খণ্ড ক্ষুদ্র সমাজ চৌচিরের উপজীব্য। যেখানে জীবনের পরিধি সংকীর্ণ হয়ে গেছে ভান ও ভণ্ডামীতে ; জীবনের সুকুমার আবেগ যেখানে স্বার্থের কশাঘাতে জর্জ্জরিত। চিত্তের দীনতাকে বিদীর্ণ করে যেখানে জাগতে চায়, নতুন জীবনের সৌরভ।

'সাহসিকা'ও সাম্প্রতিক রচনা নয়—আরাবী সাহেবের সেকথাও অজানা থাকা উচিত হয়নি। এ বইটি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল সন্দেহ নেই।···

এই অর্ধমৃত জীবনে রাজনৈতিক পথ বেয়ে যে জীবন জোয়ার একদিন দেখা দিল তা কেবল আকস্মিক নয়, অভাবনীয় আবেগের···বন্যা যুবকপ্রাণের নবজীবনের বাহন হলেও আবুল ফজল স্বভাবতঃই কেবল মাত্র আনন্দ ও সগর্বদ্রষ্টা।

কিন্তু একটা কথা আমরা ভুলি কেন! কেন ভুলি, যে যে-বলিষ্ঠতম জীবনধারা আজ আমাদের চারপাশে উচ্ছল তার প্রথম উৎস আবুল ফজলদের গোষ্ঠী থেকেই উৎপন্ন।

মাত্র দশ বছর আগে পর্য্যন্তও আবুল ফজল সাহেব ছোট গল্পে মুসলমান সমাজে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আজকের প্রতিদ্বন্দ্বীরাও ভাষা আর প্রকাশভঙ্গি ছাড়া অর্থাৎ দৃষ্টির গভীরতার বা গাল্পিক কৌশলে খুব যে অগ্রসর তা মনে হয় না। যখন আমরা সত্যিই যুগোপযোগী এবং নিখুঁৎ গল্প লিখতে পারবো, প্রসারিত পটভূমিকায় উপন্যাস লিখতে সক্ষম হবো—তখনো যদি আবুল ফজলরা তিরস্কার শব্দে আর সপ্তবাক্যে বিদায় গ্রহণে বাধ্য হন আমাদের অসুস্থ মনের লক্ষণ তাতে সূচিত হবে।

সমৃদ্ধ সাহিত্যের ঐতিহাসিক ধারাকে যাঁরা স্বীকার করেন না—পশ্চাৎভূমিকে যাঁরা মর্য্যাদা দিতে লজ্জা বোধ করেন—তাঁরা অশ্বডিম্ব বিশ্বাসী।''

২৯ : ৬, সংখ্যায় মোহাম্মদ আবদুল হক আলোচনা করেছেন সিকান্দার আবু জাফরের উপন্যাস 'নতুন সকাল' (কথাবিতান, কলিকাতা)। সমালোচক লেখেন :

'পূরবী' ও 'মাটি আর অশ্রু' লিখে কথাশিল্পী হিসাবে জাফর সাহেব সুনাম অর্জন করেছেন। 'নুতন সকাল' তাঁর সুনাম বর্দ্ধিত করবে।

জাপানী বিমান আক্রমণ পরবর্তী ব্ল্যাক মার্কেট-রিক্ত এবং মন্বন্তর-বিধ্বস্ত বাংলা নতুন সকাল-এর পটভূমি। যাদের হৃদয়াবেগ আর স্বার্থের সংঘাতে এই উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত তারা কেউ-ই আত্মকেন্দ্রিক নয়, তারা তৃপ্তিহীন বাসনায় সমসাময়িক বাংলার নাগরিক—তাদের জীবনে সমসাময়িক বাংলার জীবন প্রতিফলিত।

যুদ্ধ-কালীন বিপর্যয়ের সুযোগে অপরিমেয় মুনাফার তৃপ্তিহীন বাসনায় ধনতন্ত্রীরা বাংলার ঘাড় ভেঙে রক্তচুষে খেতে লাগলো। বাংলার মানুষ বিবর্ণ হয়ে উঠলো। জীবনের আশ্বাসে তারা ভিড় করলো কলিকাতার রাজপথে, সেখানে তারা সাক্ষাৎ পেলো মৃত্যুর—দৈহিক আর নৈতিক দুটোই। এই পরিস্থিতির মধ্যে একজন গরিব মেধাবী ছাত্রের জীবন-সংগ্রাম 'নতুন সকাল'-এর উপজীব্য।

মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, 'নতুন সকাল' কাহিনী প্রধান উপন্যাস। কাহিনী গ্রন্থনে জাফর সাহেবের স্বতোস্ফূর্ত দক্ষতা আছে যা নিয়ে তিনি অনায়াসে পাঠকের মন আকৃষ্ট করতে পারেন। কিন্তু সেই পরিমাণে চরিত্র চিত্রণের দিকে তিনি মনোযোগ দেন নি। 'নতুন সকাল'-এ অগণিত নরনারীর সমাবেশ হয়েছে, কিন্তু একমাত্র রফিক. জাহেদ আর মেহেরুই উজ্জ্বল হয়ে আমাদের মনে বেঁচে থাকার দাবী করতে পারে। এদের প্রত্যেকেই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, এবং এরাই 'নতুন সকাল'-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র। এদের মধ্যে রফিক সবচেয়ে বাস্তব চরিত্র সে নিজের লাভ খুব বোঝে—প্রেম ও অর্থ উভয় সম্পর্কিত ক্ষেত্রেই এবং এজন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে তার কিছুমাত্র বাধে না। নৈতিক প্রশ্ন তার কাছে অর্থহীন কিন্তু মেহেরুর প্রতি তার আকর্ষণ আন্তরিক এবং নির্মল। জাহেদ আর মেহেরু আদর্শ চরিত্র। মানুষ হিসেবে জাহেদকে দুর্বল মনে হয়, বোধ হয় সে অত্যন্ত ভালো মানুষ এবং Passive বলে, অথচ চরিত্র হিসেবে তার মধ্যে একটা বিরাট সম্ভাবনা ছিল। মেহেরু চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে সে মরু বাতাসের প্রাণী, সামাজিক ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণরূপে আধুনিক। কিন্তু তার মনটি নির্মল নিষ্পাপ স্বভাবা মুসলিম তরুণীর। একটা বেহেশতী শুভ্রতায় সে নম্র, স্নিগ্ধ। চরিত্র হিসেবে তার মধ্যেও বিরাট

সম্ভাবনা ছিল। তার ও জাহেদের চিত্রণে, রফিকের পরাজয় আর মেহেরু ও জাহেদের মধ্য দিয়ে সত্য-ন্যায়ের অন্তিম বিজয়ে জাফর সাহেবের মহৎ আদর্শবাদিতা পরিস্ফুট।

চরিত্র চিত্রণ ব্যতীত আর্টের অন্যান্য দিক দিয়ে 'নতুন সকাল'-এর কয়েক জায়গায় আমার আপত্তি জানাবার আছে। সরোজের সমালোচনা সম্বন্ধে সুলেখার শেষ মন্তব্যটি (৫৮ পৃ:) শুধু সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, আর্টের ক্ষেত্রেও সত্য। জাহেদের মেসে মেহেরুর স্থান। দেওয়া আমার কাছে একটু আকস্মিক মনে হয়েছে। মোটর দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে মেহেরু-রফিক সংযোগ রোমাণ্টিকতার জন্য এযুগের সাহিত্যে আপত্তিজনক নয় কি? জাহেদের সিরাজ সম্বন্ধীয় রচনাটি, শ্রদ্ধানন্দ পার্কের বক্তৃতা এবং 'মৈত্রী'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি, রবীন্দ্র-নাথের ভাষায়, 'জায়গা জুড়েছে'। উপন্যাসের প্রথম দিকে জাহেদ, সরোজ আর মকবুলের দীর্ঘ বক্তব্যের মধ্যে তাদের ব্যক্তিত্ব ডুবে গেছে, সংলাপ বক্তৃতাগুচ্ছে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু এসবের মধ্যে দিয়ে, বস্তুতঃ সমগ্র 'নতুন সকাল'-এর মধ্য দিয়ে জাফর সাহেব সমসাময়িক জীবনের সমালোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন। আধুনিক জীবনের আনাচ-কানাচ তাঁর অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের জীবনের সব গ্লানি, নীতিরিক্ততা ও স্বার্থপরতার উপর তিনি নির্মম কশাঘাত করেছেন। তাঁর মানবতাবোধ বইখানিকে জনপ্রিয় করবে।''

২৯ : ১২, কার্তিক ১৩৫৪ সংখ্যায় শওকত ওসমান আলোচনা করেছেন সুবোধ মজুম-দারের উপন্যাস 'অন্তর ও বাহির' (ডি. এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা)। আলোচনায় শওকত ওসমানের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আছে, এবং তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শওকত ওসমান লেখেন :

''মামুলী' উপন্যাস লেখকের বিষয়বস্তু অবশ্য খুব তারিক্কি ধরনের। কিন্তু লিপিকুশলতার অভাবে উপন্যাস উৎরোয়নি। প্রথমেই তিনি বলেছেন যে, অন্তর ও সমাজের সামঞ্জস্য সাধনেই মানুষের জীবনের চরম বিফল হোতে পারে। কথাটা খুব সত্যি। কিন্তু তার পথ কোথায়—সে-দিকে লেখকের চিন্তা দানা বেঁধে ওঠেনি। উপন্যাসও তাই টুক্‌রো এলোমেলো চিত্র-সমষ্টি। যে-কোন সামাজিক শ্রেয়-বোধ সুষ্ঠু কর্ম্ম-পন্থার অভাবে কেবলমাত্র আইডিয়াতে পর্য্যবসিত থাকে, লেখক তা ভালরূপে উপলব্ধি করেননি। মহাত্মা গান্ধী বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব। হুম্যানিজম আদর্শ হওয়া উচিত প্রত্যেকের, কিন্তু আদর্শ আদর্শ-ই থেকে যায় সঠিক কর্ম্ম-পন্থার অভাবে। আদর্শের এই বাস্তব-রূপায়ণ-ই মানুষের আসল কাজ, তাই আদর্শ ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করা হয়ত যায়—কিন্তু সমাজগতরূপ দেওয়া কঠিন যদি না তার পশ্চাতে কর্ম্মপন্থার সঠিক নির্দ্দেশ থাকে। অহিংসা ব্যক্তিগতভাবে সকলের আদর্শ। কিন্তু তার বাস্তব রূপায়ণ যে 'সত্যাগ্রহ' দিয়ে সম্ভব নয়—দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট হোয়ে পড়ে। বিনা রক্তপাতে অহিংসায় দেশের স্বাধীনতা এসেছে বলে একদল গান্ধীবাদী সত্যাগ্রহের ঔৎকর্ষের প্রমাণ দিয়াছিলেন। পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশের ধূমায়িত সাম্প্রদায়িকতা তা ব্যর্থ করে দিয়েছে। গান্ধীজীর চেতনার বিকাশ আর সম্ভব নয়—তিনি আর এক যুগের মানুষ। তাঁর চেলারা যদি দেশের দিকে চোখ ফিরিয়ে আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের পথ না খোঁজেন—সমগ্র ভারতের পক্ষে তা' চরম দুর্দ্দশা টেনে আনবে। হাজার হোক আপনার মন সরল, আপনার ইচ্ছা সাধু, কিন্তু সমাজ-কে পরিবর্ত্তনের জন্য সামাজিক পরিবর্ত্তনের নিয়ম সুষ্ঠু অনুধাবন করতে হবে। ইতিহাস কোন ব্যক্তির Fancy দিয়ে গড়ে ওঠে না। সামাজিক গতি-প্রকৃতি ঠিক-মত অনুধাবন করে দেশের আন্দোলন গড়ে-তোলাই প্রকৃত নেতার কাজ। গতি-প্রকৃতি যিনি ভাল বোঝেন তিনি প্রকৃত নেতা।

wishfulfilment-এর মন নিয়ে ধর্মের সংস্কারক হোতে পারেন একজন, বিপ্লবের নেতা হতে পারেন না। মাইনরীটী সমস্যাই ভারত-বিভাগ ও সাম্প্রদায়িকতার আসল কারণ, ধনতান্ত্রিক সমাজে সংখ্যা-লঘুদের সমস্যা প্রত্যেক দেশেই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করেছে। তার সমাধান সমাজের গতি-প্রকৃতির বিশ্লেষণে সঠিক কর্ম্মপন্থার উপর হোতে পারে। রাশিয়ায় জারের আমলে বর্তমান ভারতের অবস্থাই বর্তমান ছিল। ইহুদী-শিয়া-নাস্ত্রী ও অন্যান্যদের আত্মঘাতী কলহ। আজ সেখানে কি করে এত জাতির অদ্ভুত সহযোগিতা নূতন সমাজ গড়ে তুলছে? দুর্ভাগ্য আমাদের প্রবীণ নেতাদের কারো চোখ সেদিকে পড়ে না। কেউ প্রাচীন পাদ্রীদের মতে বলছে: ভালবাসো প্রেম বিলাও। কেউ বল্ছিল: ভারত-ভাগই একমাত্র পথ। পক্ক কেশ এই সব নেতারা ভারতের বর্তমান রক্তস্রোতের আসল হোতা। উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদের টেক্সট বুক গড়া আইনজ্ঞ নেতাদের কাছ থেকে আর কী আশা করা যায়? মহামানব গান্ধীজীর সাধু প্রচেষ্টার ব্যর্থতা সমাজ-প্রেমিকদের নূতন পথ-সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করুক। সুবোধ বাবু এ-সব বিষয় তলিয়ে দেখেননি। আইডিয়ালিষ্ট দার্শনিকদের মত কচ্ছপের খোলে তিনি নিজে গুটিয়ে বসে আছেন। সমাজে অর্থনৈতিক শক্তির প্রভাব মান্‌লে অন্ততঃ ঐ তুরীয়-দশা ছাড়তে হয়। সংস্কৃতির আলো সব মানুষ-কে পৌঁছে দেওয়া যায় না, যদি অর্থনৈতিক ভিত্তি তাদের না থাকে। দেওয়ানের পুত্র 'মহাত্মা' হোতে পারেন—খাদ্যের নানা রকম পরীক্ষা করে লেবুর রস, ছাগলের দুধ, বেছে নিতে সক্ষম হন। কিন্তু গরীবেরা কী করে জীবন নিয়ে এই পরীক্ষা চালাতে পারে? অথচ বৃহত্তর জীবন-গঠনের সাধনায় পরীক্ষা অনিবার্য্য। মহাত্মার আদর্শ বাস্তব করতে হোলে অর্থনৈতিক দিকটা কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না। কিন্তু প্রাচীন ধর্মীয় সংস্কারকরা যেমন মুরুব্বী চালে, জনগণের পিঠে হাত চাপ্‌ড়াতেন আজ-ও তার নজীর চল্‌ছে। সব মহাপুরুষেরা ভুল করেছেন মুরুব্বীর জায়গা নিয়ে, আজও তার জের কাটেনি। সব ধর্মই ত এক কথা বলে গেছে, তবে এত হানাহানি সাম্প্রদায়িকতা কেন? মানুষের ভুল? সামাজিক অবস্থা মানুষ-কে টেনে নিয়ে যেতে বাধ্য করে। জমিদারী-প্রথা রাখলে রাজা প্রজার মাঝখানে বেড়া তোলা হোল। মানুষ-কে সমান অধিকার দেওয়া হোল না—যতই ধর্ম স্বস্তি-জল ঢালুক। এই ফাঁক একদিন বেড়ে যাবেই। তা ধর্ম বা মানুষের দোষ নয়—ওই আর্থিক বন্ধনের অপরাধ। তা না মুছ্‌লে মানবতা ফিরে আস্‌বে না।

সুবোধ বাবু এই সব-কথা তলিয়ে দেখেননি। ভারতবর্ষ যেমন আধা-ফিউডাল (নচেৎ ধর্ম নিয়ে এখন-ও রাজনীতি চলে) আধাধনতান্ত্রিক। সুবোধ বাবুর মন তারই পরিচয় দিয়েছেন উপন্যাসে। জোড়াতালি-মার্কা প্রগতি সর্ব্বনাশ-ই টেনে আনে। তা-ও কোন দোষের নয়—যদি তিনি উপন্যাসের জাত না মারতেন। ঘুম প্রয়াসী পাঠক ছাড়া তিনি বিশেষ পাঠক পাবেন না। আমার মত পাঠক? সম্পাদকের খাতিরে শুধু।

সুবোধ বাবু-কে আর একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই: পৃথিবীর প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা আশি-জন আর্থিক-স্বচ্ছল পরিবার-উদ্ভুত।"

৩০ : ২, পৌষ ১৩৫৪ সংখ্যায় আহ্‌সান হাবীবের 'রাত্রিশেষ' কাব্য গ্রন্থটি আলোচনা করেন বসুধা চক্রবর্তী। সুলিখিত এই আলোচনায় বসুধা চক্রবর্তী লেখেন: "বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে জেগেচে বাঙালী সমাজে ধনতন্ত্রের প্রথম পদপাত। কোটি কোটি লোকের নিরাশ্বাসের ভিত্তিতে মুষ্টিমেয় লোক গড়ে তুলতে চায় তাদের কামনা-বাসনার স্বর্গ। হতভাগ্য মধ্যবিত্ত আজ ধনিকের প্রসাদ পাবার অপেক্ষায় আছে; কিন্তু তারও পায়ের তলার মাটি স'রে গেছে। এ' সংবাদ জানা আছে সবাইর: নূতন ক'রে বলবার প্রয়োজন নেই। আমার, শুধু বলবার এই যে কবি আহ্‌সান হাবীব এ অবস্থার মাঝখানে রয়েচেন, তিনি এর মুখোমুখি দাঁড়িয়েচেন।

আহ্‌সান হাবীবের কবিতাতে পাঠক চারদিকের দিশেহারা পরিবেশের ছাপ বহুদিন যাবৎই দেখ্‌তে পেরেচেন। কবি নিজের জীবনের গতিবেগে যে পরিবেশে এসে পড়েচেন সাংবাদিকের ভাষায় তাতে তাঁর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জগতের কৌতুক ও আগ্রহের বস্তু। দিশেহারা পরিবেশে আহ্‌সান হাবীব নিজেও দিশেহারা ; কিন্তু, পরাজয় বা পলায়ন তাঁর ধাতে নেই। এ' ধরণীর সাথে যে পরিচয়, তাঁর লাভ হ'লো তা' সুখের পরিচয় নয়। প্রথম আশার দিন পলাতক হলো ; কিন্তু তিনি সেজন্যে মাটীর সাথে চেনাশোনা অসম্পূর্ণ রাখ্‌লেন না। এর ফল হলো এই :

বুঝেছি সেদিন মানুষ এমনি দীন,
এ মাটির কাছে আছে আমাদের এমনি অশেষ ঋণ!
অনাদি কালের বন্ধন আর বঞ্চনা একসনে
চির-জীবনের শৃংখল সম জড়ানো মানব মনে!
তাই বেদনার বহ্নিও প্রাণে মাধুর্য্যে সুনিবিড়,
ঝরা পালকের ভস্মস্তূপে তাই বাঁধলাম নীড়।
তীক্ষ্ন নখর উদ্যত যার তারে ভালোবাসলাম ;
দু'নয়নে যার হিংস্র আগুণ আজো জপি তার নাম।
নিবিড় রঙের আবরণ-ঘন যে আভরণের তলে
এই পৃথিবীর কুৎসিত প্রাণ হীন কামনায় জ্বলে,
প্রেমহীন সেই বন্ধুর দেশে নীড় বাঁধলাম তবু,
এই মন আর এ-মৃত্তিকায় বিচ্ছেদ নাই কভু!
(এই মন এ-মৃত্তিকা)

আলোচ্য বইটি কবির প্রথম প্রকাশিত কবিতার বই। চারভাগে এ বিভক্ত। প্রথম ভাগে নির্ম্মম আত্মপরিচয়, নিঃসংকোচ আত্মস্বীকৃতি। ঈদের দিনে বাঞ্ছিতাকে নিয়ে ছকুমিয়ার হোটেলে খাওয়া আর রিকশা চড়ে সিনেমা দেখতে যাওয়ার অকুণ্ঠ ঘোষণা। এ' যে প্রোলেটেরিয়ান তৃপ্তির অব্যাহত আত্মঘোষণা। বিংশ শতাব্দীর ধনতন্ত্রী সমাজের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে এ' শুধু আত্মঘোষণা নয়, জীবনের আত্মপ্রচারও বটে।

জীবন-যুদ্ধের কথা প্রতিভাত—'সৈনিক' কবিতাতেও। তার সাথে মনে পড়ে পুরনো দিনের কথা, ইতিহাসে মিশেচে যেদিন সেদিনের কথা। অতীতের পথ বেয়ে কবির সে ঐতিহাসিক ভ্রমণ। তারপর বর্ত্তমান অভিশপ্ত•••ক্রূর হাসি. যে মৃত্যু গ্রাস করতে চাইল জীবনকে, তাকে স্বীকার করে জয় করবার ইংগিত।

অবশেষে কবির প্রতিশ্রুতি, মহৎ প্রতিশ্রুতি . যে জীবন শুধু অভিশপ্ত সেই অভিনন্দিত করবে আগামী দিনকে :

'কাল যারা এসেছিল তারা আজ স্মরণ-নির্ভর.
আগামী দিনের যারা—
এই মৃত স্তূপের উপর
তারা যদি ঘর বাঁধে ;
ভাঙা-চোরা দিনের ফাটলে
তারা যদি ভালবেসে নতুন সূর্য্যের মত জ্বলে,
তাদের কি দেব না হৃদয়?
সূর্য্য থেকে এ পৃথিবী
আরেক সূর্য্যের পানে বিস্তৃত কি নয়?'
(প্রদক্ষিণ)

বাঁশির আজ অসি হবার প্রয়োজন; প্রয়োজন সে আগুনকে আবাহনের শতাব্দীর জঞ্জাল যে জ্বেলে পুড়ে ছাই ক'রে দেবে। কবি আজ রাজ পথে এসে নেমেছেন, জনতার হাতে হাত রেখেচেন। আজ এলো সংগ্রামের দিন : মৃত্যুকে বরণ ক'রে নয়, যে মৃত্যু জীবনকে বিস্তৃত করে তাকে আবাহনের দিন। জীবনের স্বপ্নের রেশ এসে লাগচে রেড রোডের রাত্রি শেষে, আমাদেরও ব্যর্থ জীবনের আশা জেগে নেই কি কর্জন পার্কে, এসপ্লানেডের মোড়ে চৌরংগীর নৈশাভিসারের পথের ধারে? আহ্‌সান হাবীব আধুনিক সভ্যতার নিকট জীবনের দাবীর কবি। সাময়িক পত্রে প্রকাশিত তাঁর অনেক কবিতাতে লেগেছে মানুষের জন্যে দরদী মনের করুণা; তার সব এ বইতে নেই। এখানে আছে ব্যথাবিস্মিত. বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের সংকল্প, অনন্ত প্রাণের প্রতিশ্রুতি। অবিলম্বে এ মানুষকে উচ্চকিত করবে মহৎ আহ্বানে, জীবনের প্রচণ্ড আত্মপ্রতিষ্ঠার আহ্বানে। আমিও আজ অপেক্ষায় আছি সে আহ্বানের, কান পেতে শুনব সে আহ্বান এ যুগের বাংলার উভয় বাংলার তরুণ তরুণীর এ খবর জানবার দরকার আছে: তাই এ বই পড়বার তাদের জরুরী প্রয়োজন। রাত্রিশেষে তারাও যে নব প্রভাতে জীবনের পদক্ষেপের প্রতীক্ষায়।''

৩০ : ৩, মাঘ ১৩৫৪ সংখ্যায় মীজানুর রহমানের 'বেহেশ্‌তী সওগাত' গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে কাজী মোতাহার হোসেন লেখেন: ''জনাব মীজানুর রহমান সাহেবের বেহেশ্‌তী সওগাত পাঠ ক'রে সত্যিই মন পবিত্রতায় পূর্ণ হয়। গ্রন্থখানি পবিত্র কোরাণ শরীফের শেষ সীপারা 'আমপারার' কাব্যময় তরজমা। আলোচ্য তরজমা-পুস্তকের কয়েকটি বিশেষত্ব আছে—সেগুলি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রথমতঃ এর ভাষা, বর্ত্তমান বাংলাভাষার সঙ্গে শরা-শরিয়তের প্রচলিত উর্দ্দু বা আরবী-ফার্সী বুলির সহজবোধ্য সংমিশ্রণ। নামাজ, রোজা, মোত্তাকী, পরহেযগার, হেদায়েত, ইমান, শুকরিয়া প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ মুসলমান সমাজে প্রচলিত আছে, পুঁথি-সাহিত্যেও প্রচলিত ছিল; অথচ বর্ত্তমান বাংলাভাষায় তার চলন নাই। এ-তে বাংলাভাষার সঙ্গে মুসলমান সমাজের এক অবাঞ্ছিত ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে। কার দোষে এমন হ'য়েছে. সে বিচার এখন নিরর্থক। কাজের কথা এই যে, কেমন ক'রে এই ব্যবধান দূর করা যায়। মীজানুর রহমান সাহেব এক বাস্তব সমাধানের নমুনা দেখিয়ে সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। এতে পরিমাণ-বোধের দিক দিয়ে হয়ত অন্যের সঙ্গে মতভেদ থাক্‌তে পারে কিন্তু সমাধান যে, ঐ পথেই হ'তে হবে, এ সম্বন্ধে বোধ হয় কারো দ্বিমত নাই।''

২. পত্র-পত্রিকা সমালোচনা

সওগাতের সমালোচনা বিভাগে সমকালীন পত্র-পত্রিকার সমালোচনাও নিয়মিত প্রকাশিত হত। ঐ আলোচনায় সওগাতের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ধরা পড়ে। এ সব আলোচনার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা নীচে উদ্ধৃত হল। ১ : ৩ সংখ্যায় নুরুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন লিখেছেন **সহচর** (মাঘ ১৩২৮; সম্পাদক সৈয়দ নওশের আলী) সম্পর্কে;

''···সহচরের আত্মপরিচয় দিতে গিয়া···সামঞ্জস্য হীন ধর্ম্ম মীমাংসার কি প্রয়োজন ছিল বুঝিলাম না, সম্পাদক মুসলমান, তাঁহার আত্ম পরিচয়ে মুসলমানী ভাবের অভাব দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। বাঙ্গালা ভাষার কোন আদর্শের আমরা অনুকরণ করিব, এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে। আমরা যদি ঈশ্বর, হরি, ভগবান, পূজা প্রভৃতি না বলিয়া জন্মগত সংস্কার অনুসারে আল্লা, খোদা, এলাহী, নামাজ, রোজা প্রভৃতি বলি তাহাতে বাঙ্গালাভাষা শ্রীহীন হইবে না। হিন্দু ভ্রাতাগণও তাহাতে আপত্তি করিবেন না।

সম্পাদক আত্মপরিচয়ের এক স্থানে বেহেস্ত লিখিয়া নীচে ফুটনোটে বেহেস্ত, অর্থ—স্বর্গ, লিখিয়া দিয়াছেন। এটা তাঁহার দুর্ব্বলতার পরিচয় মাত্র। আমরা শত শত নামজাদা হিন্দু লেখকের পুস্তকে খোদা, বেহেস্ত প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ দেখিয়াছি। সহচরের মামুলী ধরনের আত্মপরিচয় পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না।"

৫ : ১, আষাঢ় ১৩৩৪ : **শিখা**—প্রথম বর্ষ। সম্পাদক—অধ্যাপক আবুল হুসেন এম-এ, বি-এল। প্রকাশক—আবদুল কাদের, মোসলেম হল ঢাকা। প্রাপ্তিস্থান—অধ্যাপক আবদুল আজিজ তালুকদার, এম এ। মজিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা ও কলিকাতা, মূল্য আট আনা।

'শিখা' ঢাকা মুসলিম সাহিত্য-সমাজের বার্ষিক মুখপত্র। এই সমাজের গত বার্ষিক সম্মিলনীতে যে সমস্ত প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, তাহাই এই 'শিখা'য় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশকের নিবেদনে প্রকাশ, 'শিখার প্রথম সংখ্যায় আমরা যে প্রবন্ধগুলি সন্নিবেশ করেছি, তার প্রত্যেকটী সমাজের দারুণ অভাবের এক একটী দিক লক্ষ্য করে লিখিত হয়েছে। সে জন্য হয়ত অনেক অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করতে হয়েছে। কিন্তু আমরা মনে করি, সমাজের প্রকৃত সহৃদয় সুহৃদবর্গের কেহই সেই অপ্রিয় সত্য হজম করতে নারাজ হবেন না—কারণ নিতান্ত আত্মীয় যে, সেই ত আঘাত দিতে পারে।' আমরা প্রকাশকের উপরোক্ত কথা সর্ব্বন্তকরণে সমর্থন করি। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও বলিতে চাই, অপ্রিয় সত্য সমর্থনীয় হইলেও চিন্তার যথেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা সমর্থনীয় নহে; অথচ এতদুভয়ের মাঝখানে বেশী দূরত্ব নাই—একটী ধাপ মাত্র। সুতরাং অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করিতে যথেষ্ট সাবধানতা ও তীব্র আন্তরিকতা আবশ্যক। আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে, এই 'শিখা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা বা চিন্তার যথেচ্ছচারিতা আছে। আর যদিও বা কিছু থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাও লেখকদের তীব্র আন্তরিকতায় চাপা পড়িয়াছে। খোশখেয়াল-জাত যে উচ্ছৃঙ্খলতা, তাহা ইহাতে নাই, ইহা আমরা সর্ব্বান্তকরণে স্বীকার করিতেছি। তবে কোন কোন প্রবন্ধে সাবধানতার সামান্য ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতে পারে বটে।

'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'—এই উক্তি 'মটো' করিয়া 'শিখা'র নবীন সাধকগণ যে জ্ঞানের শিখা জ্বালিয়াছেন, সমাজের কুসংস্কার ভণ্ডামী ও গলদের প্রতি যে খড়্গাঘাত করিয়াছেন, তাহাতে সমাজ-জীবনে জাগরণ-চাঞ্চল্যের অনুভূতি সঞ্চারিত হউক, ইহা আমরা সমস্ত অন্তর দিয়া কামনা করি। বাস্তবিক 'শিখা' পাঠ করিয়া আমরা যথেষ্ট আশান্বিত ও উপকৃত হইয়াছি। 'শিখা' পাঠ করিয়া আমরা ইহাও বুঝিয়াছি, ঢাকায় এমন একটী সত্যসন্ধ সাহিত্যিকমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে, যাহাদের নিষ্ঠাপূর্ণ সেবায় মুসলিম বঙ্গসাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ হইবার আশা রাখে।

যা'ক এখন আমরা 'শিখা'য় প্রকাশিত রচনাবলী সম্বন্ধে কিঞ্চিত আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। প্রথমেই বঙ্গকবিকুলরবি নজরুল ইসলামের 'খোশ আমদেদ্' শীর্ষক কবিতা—

'তালিবন ঝুম্‌কি বাজায়, গায় 'মোবারক-বাদ' কোয়েলা।
উলসী' উপ্‌চে প'ল পলাশ অশোক ডালের ঐ ডালি।।
প্রাচীন ঐ বটের ঝুরির দোলনাতে হায় দুলিছে শিশু।
ভাঙা ঐ দেউল-চূড়ে উঠ্‌ল বুঝি নৌ-চাঁদের ফালি।।'

শুধু সুন্দর নয়, অতুলনীয়। কবি নজরুলের কবিতা সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। উপরন্তু ইহা ইতিপূর্ব্বে 'সওগাতে'ও প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহার আলোচনা এই পর্য্যন্ত।

অধ্যাপক এ, এফ, রহমান সাহেবের 'অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ' পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। অধ্যাপক সাহেবের বাঙ্গলা রচনা আমরা ইতিপূর্ব্বে আর কখনো দেখি নাই। তাঁহার এই প্রথম রচনা আমাদের মনে যথেষ্ট আশার সঞ্চার করিয়াছে। তাঁহার সাহিত্য সাধনা সফল হউক, এই প্রার্থনা করি। কিন্তু তিনি প্রবন্ধের উপসংহারে যে লিখিয়াছেন—'গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলেই হয়',—ইহা আমরা পরিপাক করিতে পারিলাম না। অধ্যাপক সাহেবের মনে হঠাৎ 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা' করিবার সাধ জাগিয়া উঠিল কেন, তাহার কারণ আমরা বহু অনুধাবন করিয়াও বুঝিতে পারিলাম না। বাস্তবিক, ইহা পড়িয়া ইহাকে যেন কোন হিন্দুর রচনা বলিয়া মনে হয়।

মৌলভী তসদ্দক আহমদ সাহেবের 'সভাপতির অভিভাষণ' অত্যন্ত উপভোগ্য হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ইহা 'সওগাতে'ও প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। আমরা মৌলভী সাহেবকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি।

মৌলভী হাবিবুল্লাহ সাহেবের 'আবাহন' শীর্ষক কবিতা 'শিখা'র মত কাগজে স্থান পাইবার যোগ্য নয়।

মৌলভী কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের 'বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য-সমস্যা' চিন্তাপূর্ণ উপভোগ্য প্রবন্ধ। মুসলিম বঙ্গসাহিত্যে কাজী সাহেবের চিন্তার একটা বিশিষ্ট মূল্য আছে। এ প্রবন্ধেও তিনি জাতির সম্মুখে বিস্তর চিন্তার খোরাক ধরিয়াছেন। প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন, 'দেশে দেশে দিকে দিকে মানুষ যে যেখানে সত্য ও কল্যাণের সন্ধানী হয়েছে, সে আমার ভাই, একথা যদি মুসলমান প্রাণ খুলে বলতে না পারে, তবে বৃথাই তার সাম্য ও একেশ্বরতত্ত্বের অহঙ্কার। আর শুধু মুসলমানের সাহিত্য-সৃষ্টি নয়, তার সমস্ত নবসৃষ্টির উৎস এইখানে বাঁধা পড়ে ক্রন্দন করবে।' কাজী সাহেবের উপরোক্ত কথার দিকে আমরা সমগ্র বাঙ্গালী মুসলমানের—সত্যজীবন-প্রয়াসী নব-জাতীয়তার সাধক বাঙ্গালী মুসলমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। দুঃখের বিষয়, কাজী সাহেবের এই মূল্যবান চিন্তশীলতা তাঁহার ভাষার জন্য সর্ব্বজনবোধ্য হইতে পারে পাই। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। তিনি এ প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন—'এই যে মানুষের দল, মুখের ভাষা যাদের ভিতরে অকর্ম্মণ্য, কিন্তু যাদের জীবনের ভিতরে উপলব্ধি করা যায় যেন আদিম কুর্ম্মের নীরব বীর্য্য, অথবা আদিম প্রকৃতির প্রাচুর্য্য, এদের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনবগত থাকা অস্বাভাবিক নয়।' ইহাতে তিনি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন, ভাষার গোলকধাঁধাঁ ঠেলিয়া সকলে তাহা বুঝিতে পারিবে কি? প্রাইভেট টিউটার রাখিয়া কেহ যে সাময়িক কাগজের প্রবন্ধ পড়িতে বসিবে, ইহাও ত আশা করা যায় না। উপরোক্ত বক্তব্যটুকু সর্ব্বজনবোধ্য সহজ ভাষায় প্রকাশ করাও ত কিছুমাত্র কঠিন ছিল না। তবে মস্তিষ্কের এ অনাবশ্যক ব্যায়ামের সার্থকতা কি? ভাষার সঙ্গে কুস্তি করিয়া যদি ভাবের নাগাল পাইতে হয়, তবে পাঠকহৃদয় কার্য্যকরি হইতে সে ভাব অনেকটা বাধা পায় না কি? কুস্তির স্থান অন্যত্র, সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাহার আমদানী কেন? সাহিত্য হৃদয়ের জিনিষ, —মস্তিষ্ক অপেক্ষা অন্তর লইয়াই তাহার বেশী কারবার করিতে হয়। সুতরাং তার উপরে মস্তিষ্কের এ অযথা বল-প্রয়োগ কেন? তারপর 'বহুভঙ্গিমত' 'মগ্নচৈতন্যরস' প্রভৃতি উৎকট শব্দগুলির প্রয়োগ লেখকের নলিনীকান্তি মোহ যতটা প্রমাণিত করিতে পারিয়াছে, ভাষার সরসতা-সম্পাদন ততটা করিতে পারে নাই।

মৌলভী আবদুল কাদেরের 'বাঙ্গলার লোকসঙ্গীত' উপভোগ্য হইয়াছে। প্রবন্ধের নীচে যে সম্পাদকীয় মন্তব্যটুকু প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা তাহা সমর্থন করিতেছি।

মৌলভী রকিবুদ্দীন আহমদ সাহেবের 'বাঙ্গালী মুসলমানের আর্থিক সমস্যা', মৌলভী শামসুল হুদার 'হজরত মুহম্মদের প্রতিভা,' মৌলভী কাজী মোতাহার হোসেন সাহেবের 'সঙ্গীত-চর্চায় মুসলমান', মৌলভী মমতাজুদ্দীন আহমদ সাহেবের 'শিক্ষা-সমস্যা', মৌঃ আনোয়ার হোসেনের 'মুসলমানের আর্থিক সমস্যা' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি যেমন শিক্ষা-প্রদ, তেমনি উপভোগ্য হইয়াছে। মৌলভী আবদুর রশীদের 'আমাদের নব জাগরণ ও শরিয়ত' শীর্ষক প্রবন্ধে রক্ষণশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মৌলভী আনোয়ারুল কাদির সাহেবের 'বাঙ্গালী মুসলমানের সামাজিক গলদ', মৌলভী আবদুস্ সালাম খাঁ সাহেবের 'নাট্যাভিনয় ও মুসলমান সমাজ এবং মৌলভী আবুল হুসেন সাহেবের 'বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে আলোচনা যোগ্য। উপরোক্ত প্রবন্ধগুলিতে লেখকগণ যে সমস্ত সমস্যার কথা তুলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধ শিক্ষমার্জ্জিত বাঙ্গালী মুসলমানের ভাবিয়া দেখা উচিত। প্রবন্ধগুলিতে স্থানে স্থানে সমাজের প্রতি অতিরিক্ত ঝাল প্রকাশ আছে, বিষয়ের সর্ব্বদিকদর্শন করার ক্ষমতার অভাবও কোন কোন স্থানে আছে এবং তজ্জনিত সীমাতিরিক্ত উদারতার আড়ম্বরও অনেক স্থলে কিন্তু আছে, তা' সত্ত্বেও এগুলি আলোচনাযোগ্য। কারণ এগুলিতে লেখকদের প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়।

যাহা হউক, মোটের উপর আমরা 'শিখা' পড়িয়া আনন্দের সহিত শিক্ষাও লাভ করিয়াছি। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।''

৫ : ২, শ্রাবণ ১৩৩৪ সংখ্যায় 'নূরী' (আবুল কালাম শামসুদ্দীন) লিখেছেন **'প্রবাসী'** সম্পর্কে :

''প্রবাসী' বাঙ্গলা ভাষার একখানা উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র। নিরপেক্ষ বলিয়া বাজারে ইহার বেশ নামডাকও আছে। সাহিত্যিক কিংবা রাজনৈতিক ব্যাপারে ইহাতে যে সমস্ত মতামত প্রকাশিত হয়, তাহা নিরপেক্ষ রসগ্রাহী পাঠকগণকে আনন্দ দান করিতে সমর্থ হয় বলিয়াও অনেকে ইহার প্রশংসা-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

আমরা বহুদিন যাবত 'প্রবাসী' পড়িয়া আসিতেছি। ইহাতে নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশিত হয়, ইতিপূর্ব্বে আমরা ইহাও আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিন যাবৎ ইহার মতামত প্রকাশ ব্যাপারে একটা বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। এখন যেন ইহাতে আর সে নিরপেক্ষতার ভাব নাই, সে সর্ব্বদিকদর্শী সংযত মন্তব্য-প্রকাশের ধারা উল্‌টিয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের অনুমান—ইহার জ্ঞানবৃদ্ধ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু বোধ হয় ইহার সম্পাদন-ব্যাপারে এখন ততটা মনোযোগ দিতে পারিতেছেন না। আমাদের এ অনুমানের কারণও ঘটিয়াছে। রামানন্দবাবু এখন যে ভাবে সভা-সমিতিতে যোগদান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে ইহা মনে করা অন্যায় হইবে না যে, তাঁহার মনে এই জীবনসায়াহ্নে নেতা সাজিবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠিয়াছে।•••

দ্বিতীয়তঃ, 'প্রবাসী'র মতামতের বর্ত্তমান সময়ে রামানন্দবাবুর সেই স্বভাবসিদ্ধ সংযমের পরিচয় পাওয়া যায় না এবং 'প্রবাসী'র সম্পাদনেও আর পূর্ব্বেকার সেই সংযত শ্রী দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা কিছুদিন যাবৎ গভীর ক্ষোভ ও দুঃখের সহিত লক্ষ্য

করিতেছি যে, ইহার মতামতে ও সম্পাদনে একটা অসংযত ও অব্যবস্থিতচিত্ত মানসিকতার পরিচয়ই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে। সুতরাং আমরা মনে করিতে বাধ্য হইতেছি যে, এখন রামানন্দবাবুর হাত 'প্রবাসী'র সম্পাদনের উপর খুব বেশী নাই। উপ-রোক্ত মতের সমর্থনে আমরা এখানে 'প্রবাসী'র মতামত লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী'র 'বিবিধ প্রসঙ্গে' 'রবীন্দ্রনাথের নূতন সম্মান' শীর্ষক একটী সম্পাদকীয় মন্তব্য আছে। তাহাতে প্রবর্ত্তক-সংঘ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া অভিনন্দনপত্রের আলোচনা করা হইয়াছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে,—'আমরা পাশকরা বাঙ্গালীরা মনে মনে এই সন্তোষটুকু লাভ করিতে পারিতাম যে, রবীন্দ্রনাথ যত বড়ই হউন, তাঁহার মনে মনে নিশ্চয়ই এই দুঃখটা আছে যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পারদর্শিতা অনুসারে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ইত্যাদি স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। এবার তাঁহার সে দুঃখ দূর হইল এবং আমাদেরও লুক্কায়িত উল্লাস চূর্ণ হইল। কাগজে দেখিলাম সম্প্রতি প্রবর্ত্তক-সংঘের উৎসবে তাঁহাকে যে অভিনন্দিত করা হয়, তাহাতে লাভ হইয়াছে যে, তিনি নিতান্ত মন্দ ছেলে নন—পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। প্রথম হইয়াছেন শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, এবং দ্বিতীয় শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। এই খবরটী যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পরীক্ষা কি কি বিষয়ে হইয়াছিল এবং পরীক্ষক কে কে হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ও ভক্তগণ কৌতূহলী হইবেন।

ইহার পর আষাঢ় মাসে 'বিবিধ প্রসঙ্গে' 'প্রবর্ত্তক-সংঘ' কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা শীর্ষক মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে—''প্রবর্ত্তক-সংঘ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা বিষয়ে আমরা জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী' তে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা একখানি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরেজী দৈনিকের মন্তব্য পড়িয়া লিখিত হইয়াছিল। প্রবর্ত্তক-সংঘ রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে যে অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিয়ছিলেন যাহা আমরা তখন পাই নাই, দেখি নাই; উহা আমাদের নিকট পরে আসিয়াছে। উহা পড়িয়া বুঝিলাম যে, প্রবর্ত্তক-সংঘ —প্রথমে অরবিন্দ তাঁহাদের আশ্রমে আসিয়াছিলেন, তাহার পর গান্ধী, এবং তাহার পর রবীন্দ্রনাথ আসিয়াছেন—ইহাই বলিয়াছিলেন; ইঁহাদের শ্রেষ্ঠতার ক্রম-নির্দেশ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, তাহা তাঁহারা করেন নাই। আমরা আমাদের ভ্রমের জন্য দুঃখিত।...

ইহা হইতেই 'প্রবাসী'র আলোচনার ধারা অনেকটা বুঝা যায়। মন্তব্য-প্রকাশের বেলায় ইহাতে কিরূপ দায়িত্বজ্ঞানহীন অসংযতচিত্ততার হাস্যকর পরিচয় প্রকট হইয়া উঠে, উদ্ধৃতাংশই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যে বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে হইবে, তাহা স্বচক্ষে দেখিবারও ইহারা আবশ্যক মনে করেন না; অথচ সে সম্বন্ধে অসংযত মন্তব্য-প্রকাশে তাঁহাদের কোনরূপ কুণ্ঠা নাই। ইহা কোন দায়িত্বজ্ঞানশীল মাসিক পত্রের পক্ষেই শোভা পায় না। রবীন্দ্র-ভক্তি খুব ভাল জিনিষ; কিন্তু অতি-স্তাবকতা নিতান্তই জঘন্য ও হাস্যকর। রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে কোন আলোচনা হইলেই ভক্তিতে গদ্‌গদ্‌ হইয়া বাহ্য-জ্ঞানশূন্য হইতে হইবে, ইহা যেমন ভক্তের পক্ষে গৌরবের কথা নহে, ভক্তির পাত্র যিনি—তাঁহারও ইহা কম অগৌরবের কারণ হইয়া উঠে না।

অভিনন্দন দিতে আহ্বান করিয়া কেহ যে অভিনন্দনের পাত্রকে অসম্মান করিতে পারে না, এই সহজ সত্যটাও যাঁহারা মাথা ঠিক রাখিয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন না, তাঁহাদের ভক্তির ঠেলায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও যে বলিয়া উঠিবেন, 'ভগবান, এমন ভক্তের কবল হইতে আমাকে বাঁচাও', তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। 'প্রবাসী'র লেখক বলিয়াছেন—

রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষকদের নাম জানিবার জন্য তাঁহার বন্ধু ও ভক্তগণ কৌতূহলী হইবেন। আমরা বলি,---না, তাঁহার বন্ধু ও ভক্তগণের এ বিষয়ে কৌতূহলী হইবার একটুও কারণ ঘটে নাই, তবে তাঁহার অতি-ভক্ত ও অন্ধ-স্তাবকগণের কৌতূহলী হইবার কারণ আছে বটে! কারণ ভক্তগণ কখনো এভাবে গুরুকে অপমান করিতে পারেনা ; অতি-ভক্ত ও স্তাবকগণের দ্বারাই এরূপ অপকর্ম সাধারণতঃ হইয়া থাকে। ভক্ত ও গুণগ্রাহীগণ কখনো এরূপ দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য লিখিয়া পরে তজ্জন্য 'দুঃখ' প্রকাশ করিয়া নিজেকে ও তাহাদের ভক্তির পাত্রকে এভাবে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিতে পারেন না।

'প্রবাসী'র লেখক দুঃখ প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই ; উপরোক্ত অভিনন্দন-পত্রের ভাষা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা আরও হাস্যকর। তিনি লিখিয়াছেন, 'অভিনন্দন পত্রের ভাষা এরূপ যে, উহা কাহাকেও পড়িতে শুনিলে, স্বয়ং না পড়িলে, উহার অর্থ সম্বন্ধে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা।' ইহা যেন কোন ব্যাপারে জব্দ হইয়া মুখ কাঁচুমাচু করিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইবার ব্যর্থ চেষ্টা! আমরা অভিনন্দনপত্র পড়িয়া দেখিয়াছি ; তাহাতে এরূপ ভ্রম হইবার সম্ভাবনার কথা আমাদের মনে কখনো জাগে নাই।

*　　　*　　　*　　　*

জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী'তে কবি নজরুল ইসলামের 'সর্ব্বহারা' কাব্যের সমালোচনা বাহির হইয়াছে। সমালোচকের যে রসজ্ঞতা ও নিরপেক্ষতার পরিচয় এই সমালোচনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বস্তুতঃই বাঙ্গলার কাব্যরসগ্রাহীদিগকে অবাক করিয়াছে। 'প্রবাসী'র মত কাগজেও যে কাব্য সমালোচনার নামে বিদ্বেষ প্রসূত গরল উদ্‌গীরিত হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বে আমরা ভাবিতে পারি নাই।

কবি নজরুল ইসলাম শুধু কবি নন, আমাদের মতে তিনি একজন যুগপ্রবর্ত্তক কবি। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এইরূপ যুগপ্রবর্ত্তক কবি আর দুইজন হইয়া গিয়াছেন একজন---মাইকেল, আর একজন ---রবীন্দ্রনাথ। যুগপ্রবর্ত্তক কবি আমরা তাহাদিগকেই বলি, যাহারা কাব্য-সাহিত্যের একটা নূতন চেহারা এবং তাহাতে একটা নূতন প্রাণ আনিয়া দেন। অসামান্য প্রতিভা ও নূতন দৃষ্টি না থাকিলে কাহারও দ্বারা এ কাজ সম্ভবে না। সত্যেন্দ্র-নাথ একজন প্রতিভাশালী কবি, কিন্তু তাঁহার সে নূতন দৃষ্টি নাই, যাহার দ্বারা কাব্য-সাহিত্যের ধারায় তিনি একটা নবীনতার সঞ্চার করিতে পারেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুসরণকারী মাত্র তবে ছন্দের দিক দিয়া তিনি কিছু বৈচিত্র্য আনিতে পারিয়াছেন বটে। রবীন্দ্রনাথের পরে কাব্যে নূতন দৃষ্টির পরিচয় পাই আমরা নজরুল ইসলামের রচনার ভিতর। রবীন্দ্রনাথের কোমল মধুর মেয়েলী কবিতা পড়িয়া আমাদের মনে হইয়াছিল, ইহাই কাব্যের চরম---এর উপর আর কবিতা উঠিতে পারে না। এই যে ভাব---রবীন্দ্রনাথেই কাব্য-সাহিত্যের চরম হইয়া গিয়াছে---ইহা কাব্য-সাহিত্যের পক্ষে এক দাস-মানসিকতা। এই দাস-মানসিকতা হইতে কাব্য-সাহিত্যকে উদ্ধার করিয়াছেন নজরুল ইসলাম। যুগ-প্রবর্ত্তক প্রতিভাসমূহের কাজই এই। নজরুল ইসলামের কাব্য-ধারণা ও কবিতা-রচনার ভিতরে অনেক দোষ ক্রটী থাকিতে পারে, কাব্য-সাহিত্যে এযাবত দানের পরিমাণের তুলনায় তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে এখনো অনেক নীচে, তাহাও স্বীকার্য্য ; কিন্তু তিনি কাব্য-সাহিত্যে নূতন রূপ ও প্রাণ আনিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কাব্য-ক্ষেত্রে তাহার 'রুদ্র' ও 'সাম্যে'র সাধনা বাঙ্গলা সাহিত্যে নূতন, এবং ইহা দ্বারা কাব্য-সাহিত্যের ধারা একটা নূতন পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। তাই দেখিতেছি, এই অল্পদিনের মধ্যেই নজরুলের অনুসরণকারী বহু কবির আবির্ভাব হইতেছে। শ্রীযুত মোহিতলাল মজুমদারের ন্যায় নজরুলের ঈষৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী সুকবিও নজরুলের কাব্য-রচনার ধারা হইতে রস সংগ্রহ করিতেছেন। প্রমাণ---'নাদির শাহের জাগরণ', 'বেদুইন' ইত্যাদি।

নূতন যুগপ্রবর্ত্তক কবি-প্রতিভার আবির্ভাবে সাহিত্যের পুরাতনপন্থীদলে অনেক কোলাহল উঠিয়া থাকে এবং তাহা উঠাও স্বাভাবিক। কারণ তাঁহাকে পূর্ণভাবে বরণ করিয়া লওয়া একটু সময়-সাপেক্ষ। কিন্তু যুগপ্রবর্ত্তক কবি হিসাবে না হউক, শুধু কবি হিসাবে বরণ করা নিশ্চয় অধিক সময়-সাপেক্ষ হইতে পারে না। আর নজরুল ইসলাম-কে কবি বলিয়া বরণ করিয়া লইতেও কোন স্থান হইতে আপত্তি উঠে নাই; স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁহাকে কবি বলিয়া বরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। রবীন্দ্রনাথ নজরুলের নামে তাঁহার একখানা কাব্য উপহার দিয়াও নজরুল ইসলামের 'কবি'-খেতাব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়!' রবীন্দ্রনাথের অন্ধভক্ত 'প্রবাসী' নজরুলকে কবি-সমাজ হইতে একেবারে খারিজ করিয়া দিয়াছেন। শুধু তাই নয়, 'প্রবাসী' নজরুলকে 'অসম্বদ্ধ প্রলাপভাষী' বলিয়া অভিহিত করিতেও লজ্জা বোধ করেন নাই। নজরুল ইসলামের কবিতা 'প্রবাসী' বুঝিতে পারেন না, তাঁহার কাব্য-রচনা 'প্রবাসী'র নিকট 'হেঁয়ালী' বলিয়া মনে হয়,—ইহা কি নজরুল ইস্‌লামের দোষ? শপেনহয়রের সেই বিখ্যাত উক্তি মনে পড়িতেছে, —গুণ-গ্রহণে অক্ষম হইয়া নিজের বুদ্ধিকে দোষ না দিয়া ইহারা দোষী করেন গুণীকে!

নজরুল ইসলামের কবিতার রস-মাধুর্য্য উপভোগ করিতে হইলে কতকগুলি আরবী ফারসী শব্দের সহিত আগে পরিচিত হইতে হইবে। তাহা না করিয়া এই 'সনাতন' বিদ্যা লইয়া তাঁহার কবিতা বুঝিতে গেলে তাহা 'হেঁয়ালী' বলিয়া বোধ হইবেই। সেজন্য নিজের অক্ষমতাকে দোষ না দিয়া কবিকে দোষ দিবার কারণ কি?

নজরুল ইস্‌লামের 'অগ্নিবীণা'র গর্জ্জন 'বাঙ্গলা দেশের চির-পরিচিত, সনাতন, নিষ্করুণ ঢাকের বাদ্য' নয়, কাড়া-নাকাড়ার উত্তেজক গম্ভীর ধ্বনি। এ ধ্বনির সহিত পরিচিত বলিয়াই 'প্রবাসী' ইহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারেন নাই। অনবরত ঢাকের বাদ্যের ঘ্যানঘ্যানির ভিতরে ঢুকিয়া থাকিবার ফলেই তাঁহার কাণের এই বধিরতা আসিয়াছে। কাজেই উভয়কে এক মনে করিয়াছেন।

'প্রবাসী' লিখিয়াছেন, 'যাঁহারা চণ্ডীদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত কবিদের রচনা পড়িয়া বাংলা ভাষার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে এই নূতন ভাষা অবোধ্য।' কথাটা কিন্তু সম্পূর্ণ ঠিক নহে।—যাঁহারা চণ্ডীদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সমস্ত 'হিন্দু কবি'দের বাঙ্গলা রচনার সহিত পরিচিত—এই কথা বলিলে বোধ হয় কতকটা ঠিক হইত। তা'ও সম্পূর্ণ ঠিক হইত না;—কারণ ভারতচন্দ্র মুকুন্দরাম প্রভৃতি হিন্দু কবিদের রচনার ভিতরে বেপরোয়াভাবে এমন অজস্র আরবী ও ফারসী শব্দের প্রয়োগ আছে, যাহা আধুনিক বাঙ্গালী হিন্দুর অবোধ্য। বাঙ্গলা দেশ শুধু হিন্দুর নহে, বাঙ্গলা সাহিত্যও হিন্দুর এক-চেটিয়া নহে, বাঙ্গলা ভাষার উপরেও একমাত্র হিন্দুর দখলই সাব্যস্ত হয় নাই। সুতরাং 'চণ্ডীদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত' এই সময়ের মধ্যে আলাওয়াল প্রভৃতি মুসলমান কবি ও পুঁথি সাহিত্য-রচয়িতাদিগকে বাঙ্গলা সাহিত্যের দফ্‌তর হইতে খারিজ করিলে চলিবে কেন? ইহাদের রচনার ভিতরে বিস্তর আরবী ফারসী শব্দ ও বাক্য-বিন্যাস রহিয়াছে; সেগুলি আধুনিক বাঙ্গালী হিন্দুর অবোধ্য হইলেও বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে তাহা উৎখাত করা সম্ভবপর নহে। বাঙ্গলা ভাষা একটা মিশ্রভাবাপন্ন বহু বিদেশী ভাষার শব্দ ইহাতে প্রবেশ করিয়া ইহার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। তাহা তাড়াইবার চেষ্টা এদেশ হইতে মুসলমান-দিগকে তাড়াইবার চেষ্টার মতই অসম্ভব। বাঙ্গালী মুসলমান দৈনন্দিন জীবনে কথাবার্ত্তায় বহু আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করেন; সুতরাং তাহাদের সৃষ্ট সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দের বহুল প্রয়োগ থাকিবে বৈ কি! ইহাতে নাক সিট্‌কাইলে ত চলিবে না। এ ভাষা বাঙ্গালী হিন্দুর কাছে অবোধ্য হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানের কাছে যে

ইহাই সহজবোধ্য সুন্দর স্বাভাবিক ভাষা। নজরুল ইসলামের সৃষ্ট সাহিত্য অবোধ্য ও 'হেঁয়ালী' বলিয়া 'প্রবাসী'র মনে হইয়াছে। কিন্তু আমাদের ত মনে হয়, নজরুল-সাহিত্যে ভাষার প্রাঞ্জলতা ভাব-প্রকাশের স্বচ্ছতা যতটা আছে, আধুনিক কালে এতটা আর কাহারো রচনাতেই পাওয়া যাইবে না। মুসলমান কবির রচনা বুঝিতে হইলে একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া কতকগুলি আরবী ফারসী শব্দের সহিত পরিচিত হইতে হইবে বৈ কি! সাহিত্য সার্ব্বজনীন জিনিষ হইলেও ইহার প্রকাশ-ভঙ্গীতে জাতিত্বের গণ্ডীগত একটা বিশিষ্টতার ছাপ পড়িবেই। সুতরাং এ জন্য 'প্রবাসী'র আফ্‌সোস নিষ্ফল। প্রতিভা আপনার নিজস্ব পথ কাটিয়া চলিবেই; অপর সকলের পক্ষে তাহার অনুসরণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এই জন্যই বাঙ্গলা দেশের সাহিত্যিক ও 'সাহিত্য-রসিক সম্প্রদায় বিনা বাক্যব্যয়ে নজরুলকে কবি বলিয়া মানিয়া লওয়াতে 'প্রবাসী' বিচলিত এবং 'অবাক' হইলেও আর কেহই 'অবাক' হইবার আবশ্যকতা বোধ করে নাই।

'প্রবাসী' 'সর্ব্বহারা' সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া কাজী নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ভাবেই আলোচনা করিয়াছেন। কাজেই নজরুল ইসলামকে বুঝাইবার জন্য আমাদিগকে এত কথা খরচ করিতে হইল।"

৫ : ৩, ভাদ্র ১৩৩৪ সংখ্যায় 'নূরা' **'মাসিক বসুমতী'**—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ সংখ্যার আলোচনায় লেখেন : "'মাসিক বসুমতী' একখানা ব্যবসাদারী মাসিক পত্র। সাহিত্য-সাধনা অপেক্ষা ব্যবসা করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ও আদর্শ ইহার নাই। 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কাগজগুলিতে যেভাবে পাঁচ ফুলের সাজি সাজাইবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে, ইহাতেও সেই গড্ডালিকা-প্রবাহ দৃষ্ট হয়। তফাৎ এই যে, উপরোক্ত দুইখানা কাগজে প্রবন্ধাদি নির্ব্বাচনে যেরূপ সাবধানতা পরিলক্ষিত হয়, ইহাতে সে বালাই নাই। অবশ্য প্রতিযোগিতার জন্য ভাল ভাল রচনা যে ইহাতে একেবারেই দেওয়া হয় না, তা নয়। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, অমৃতলাল প্রভৃতি লেখকদের ভাল ভাল রচনাও সংগ্রহ করিয়া মাঝে মাঝে ইহাতে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বদিক দিয়া ইহার সম্পাদন-প্রণালী লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝা যায়—যাহা পাওয়া যায়, তাহাই নির্ব্বিচারে ছাপানোই ইহার সম্পাদন-নীতি।...

'মাসিক বসুমতী'র আলোচনা দৈনিকের তরল আলোচনার চেয়ে একটুও উন্নত শ্রেণীর নহে। 'দৈনিক বসুমতী' মুসলিম-বিদ্বেষের জন্য বিখ্যাত। আজকাল এই সাম্প্রদায়িক বিবাদ-বিসম্বাদের দিনে মুসলিম-বিদ্বেষ হিন্দুসমাজে খুব বিকায়। সুতরাং চরম ব্যবসাদার 'বসুমতী' এই সুযোগ কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে না। তাই 'দৈনিক বসুমতী'তে মুসলমানের উদ্দেশ্যে যুক্তিহীন গালাগালির প্রাবল্য দেখা যায়। দুঃখের বিষয়, 'মাসিক বসুমতী'তেও ছোঁয়াচে রোগের মত তাহা সংক্রমিত হইয়াছে।...

যাহা হউক, এখন 'মাসিক বসুমতী'র একটা মন্তব্য লইয়া আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। 'মিলনের চেষ্টা' শীর্ষক মন্তব্য আছে, 'মুসলমানেরা বাঙ্গালায় সংখ্যায় হিন্দুর অপেক্ষা অধিক। তবে তাহারা বিশেষ সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন সত্ত্বেও হিন্দুর অপেক্ষা অধিক নির্ব্বাচিত হন না কেন? ইহাতে কি বুঝা যায় না যে, অনেক স্থলে মুসলমান ভোটাররাও মুসলমান প্রার্থীকে ভোট দিতে নারাজ? ইহা কি তাহাদের গুণের বা যোগ্যতার অভাবের পরিচায়ক নহে?'

এরূপ উদ্ভট ও অর্থহীন প্রশ্ন শুধু দায়িত্বজ্ঞানহীন, যুক্তির মস্তক-চর্ব্বনকারী, নিজের প্রশ্ন সম্বন্ধেও অজ্ঞ 'মাসিক বসুমতী'ই করিতে পারেন;—অপর কেহ এরূপ প্রশ্ন করিতে

লজ্জাবোধ করিতেন। বিশেষ সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন' সত্ত্বেও বাঙ্গলার কোথাও মুসলমান হিন্দুর চেয়ে কম সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হয়? আর 'বিশেষ সাম্প্রদায়িক 'নির্ব্বাচন প্রথা' যেখানে আছে সেখানে ত প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক 'সিট' সংরক্ষিত থাকে;—সেখানে কি করিয়া মুসলমানের চেয়ে হিন্দুরা অধিক সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হইতে পারে? কাউন্সিল-নির্ব্বাচনেই বাঙ্গলায় মুসলমানদের জন্য 'বিশেষ সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন' প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহাতে মুসলমান প্রার্থীদিগকে অযোগ্য মনে করিয়া হিন্দু প্রার্থীদিগকে ভোট দিয়া নির্ব্বাচন করিতে মুসলমান ভোটারদের সুযোগ কোথায়?

ফলতঃ এই শ্রেণীর অর্থহীন হাস্যকর প্রলাপই 'মাসিক বসুমতী'র আলোচনার বৈশিষ্ট্য হইয়া উঠিয়াছে। যেনতেন প্রকারে মুসলমানকে খোঁচা দিতে পারিলেই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কারণ তাহাতে তাহার গ্রাহক বাড়িবার সম্ভাবনা আছে।"

ঐ একই সংখ্যায় 'নূরী' **প্রবাসী**—শ্রাবণ ১৩৩৪ সংখ্যা সম্পর্কে লেখেন: "শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথের 'বৃহত্তর ভারত' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। যবদ্বীপ যাইবার পূর্ব্বাহ্ণে 'বৃহত্তর ভারত পরিষদ' কর্তৃক অনুষ্ঠিত বিদায়-সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে ইহা রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা। 'যুবক-বাঙ্গলা' 'যুবক-ভারত' প্রভৃতি নূতন নূতন কথা আজকাল অনেক বিশেষজ্ঞ লোকের মুখেই শুনা যাইতেছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রতি 'বৃহত্তর ভারত' কথাটিরও উদ্ভব হইয়াছে। কথাটার খাঁটি অর্থ কি, তাহা দুর্ভাগ্য বশতঃ আজও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। বুঝিবার চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটী বিশেষ মনোযোগ সহকারে পড়িলাম। কিন্তু লজ্জার সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে, মনের সম্মুখে এখনো 'বৃহত্তর ভারতে'র আসল চেহারাটা স্পষ্ট হইতেছে না। হইতে পারে—ইহা আমাদের বুঝিবার দোষ; হইতে পারে—ইহা তাঁহার বিরাট কবি কল্পনার ভিতরে আমাদের বুদ্ধির প্রবেশ করিবার অক্ষমতা।

তা সত্ত্বেও যতটুকু আমরা আবছায়ার মত বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা হইতেছে এই. সত্য-ভারতের মহান-বাণী বিশ্বে প্রচার করিয়া আমাদিগকে 'বৃহত্তর ভারত' গড়িয়া তুলিতে হইবে,—এবং জাপান এবং চীন নাকি ইতিমধ্যেই 'বৃহত্তর ভারতের' অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে। এখন কথা হইতেছে, সত্য-ভারতের মহান বাণীটি কি? রবীন্দ্রনাথ বলেন, অহংকেই যে-মানুষ পরম ও চরম সত্য বলে জানে, সেই বিনাশ পায়। বিশ্বের প্রতি মৈত্রী-ভাবনাতেই এই অহং-ভাব লুপ্ত হয়, এই সত্যটী আত্মার আলোক। এই আলোক-দীপ্তি ভারতবর্ষ নিজের মধ্যে বদ্ধ রাখতে পারেনি। সুতরাং এইটীই হচ্ছে ভারতের সত্য পরিচয়। আমরা যে ভারতবর্ষে জন্মলাভ করেছি, সে এই মুক্তিমন্ত্রের ভারতবর্ষে, এই তপস্বীর ভারতবর্ষে। এই কথাটী যদি ধ্রুব করে মনে রাখতে পারি, তা হলে আমরা নিজকে বিশেষ করে ভারতবাসী বলতে পারব। সেজন্য আমাদের নূতন করে ধ্বজা নির্ম্মান করতে হবে না।'

এখন, এই 'মৈত্রী-ভাবনা' ও 'আত্মার আলোক' যে একেবারে ভারতের নিজস্ব এবং একচেটিয়া—আরব, তুরস্ক, পারস্য, মিশর, কাবুলের কেহই নহে, তাহা মনে করা কি ঠিক? ভারতই শুধু এই সত্যধনে ধনী, ইউরোমেরিকা এই ধনের কোনই সন্ধান পায় নাই, ইহা ভাবিলে আত্মপ্রসাদ লাভ করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সত্য খুব উজ্জ্বল হইয়া উঠে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। যে ভারতবর্ষে একজনের হাতের জল অপরের অস্পৃশ্য, একজনের ছায়া মাড়াইলে অপরের স্নান করিতে হয়, সেই ভারতই সাম্য-মৈত্রীর গর্ব্ব করিতে পারে বটে এবং সেই ভারতই সাম্য-মৈত্রীর ধ্বজা উড়াইয়া বিশ্বে দিগ্বিজয় করিতে অভিযান করিবে বটে! সকল দেশের পুঁথি-পুস্তকেই মহান বাণীর কিছুমাত্র

কমৃতি নাই। উপরোক্ত মহানবাণী শুধু ভারতের উপনিষদের পৃষ্ঠাতেই বা বৌদ্ধধর্ম্মের শাস্ত্রগ্রন্থেই একচেটিয়া ভাবে নিবদ্ধ নহে—কোরাণ, বাইবেল ইত্যাদি মহাগ্রন্থেও এরূপ মহান বাণীর কিছুমাত্র অভাব নাই। সুতরাং ইহাই ভারতের বৈশিষ্ট্য হইল কি করিয়া, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। তবে যদি কথা উঠে যে, কোরাণ-বাইবেলে উপরোক্ত বাণী থাকিলেও তাহার অনুসরণকারীগণ তাহা মানিয়া চলে না, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, উপনিষদের অনুসরণকারীগণই কি তাহা মানিয়া চলিতেছেন ? ভারতে বিভিন্ন জাতের অস্তিত্ব কি তাহারই নিদর্শন ? সুতরাং পুথিগত বাণীকে সত্য-ভারতের বাণী বলিয়া চালাইয়া কোন লাভ নাই।

তবে নিষ্ক্রিয় সাম্য-মৈত্রীর বাণী ভারতীয় হিন্দুর বিশিষ্ট বাণী বটে ; কারণ বুদ্ধদেব ইহার প্রবর্ত্তক। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতের সত্য-বাণী কি ভারতের হিন্দু-মনের বিশিষ্ট বাণীই ? মুসলমান কি ভারতের কেহই নয় ? বৌদ্ধধর্ম্মের নিষ্ক্রিয় সাম্য-মৈত্রীর বাণী ইস্‌লামের বাণী নয়। ইস্‌লামের সাম্য-মৈত্রী নিষ্ক্রিয় নয়। সুতরাং বুদ্ধদেবের নিষ্ক্রিয় সাম্য-মৈত্রীর বাণী সমগ্র ভারতের সত্য-বাণী বলিয়া চালাইবার কারণ কি ? ভারত যে একচেটিয়া ভাবে শুধু হিন্দুরই নহে—কবে এই সত্যের প্রতি এই সমস্ত 'সত্যদ্রষ্টা' হিন্দু মনীষীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে ?

নিষ্ক্রিয় সাম্য-মৈত্রীর বাণীই যদি ভারতের সত্য-বাণী হইয়া থাকে, তবে এই সত্য বিশ্বে প্রচার করিয়া বর্ত্তমান সময়ে কোন ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না ; কারণ কেহ যে ইহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবেন, আমাদের এমন বিশ্বাস আদৌ নাই। অবশ্য কোন কোন স্বপ্নদর্শক অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ আদর্শবাদী এই বাণীর পরিচয় পাইয়া 'আহা', 'উহু', 'বাহবা' বলিতে পারেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ কেহ ইহা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইবেন না। কারণ ইহা গ্রহণ যোগ্য নহে, কারণ ইহা এই সংগ্রামময় জগতে গ্রাহ্য হইলে এই বিশ্ব তপোবন ও সন্ন্যাসীপূর্ণ হইয়া উঠিবে। জগৎ ইহা বাঞ্ছনীয় মনে করে না। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ-প্রচারিত ভারতের এই সত্যবাণীর পরিচয় জানিয়া দুই একজন স্বপ্নদর্শক 'বাহবা' দিয়া উঠিলেও জগৎ ইহাতে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক মনে করে নাই,—জাপান, ইটালী ইহাতে হাসিয়াছে, তুরস্ক ইহার জন্য রবীন্দ্রনাথকে a poet of the past (অতীতকালের কবি) বলিয়া অভিহিত করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'ভারত বিশ্বের নিকট যে মহত্তর বাণী প্রচার করেছে, তা ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা, আত্মার দ্বারা—সৈন্য দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, পীড়ন, লুণ্ঠন দিয়ে নয়।' আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ত্যাগ, দুঃখ, মৈত্রী, আত্মা এই কয়টা জিনিষ ভারতেরই এক চেটিয়া নহে, অপরাপর দেশেও ইহা প্রচুর পরিমাণেই আছে। তবে ভারতে ইহা যেরূপ নিষ্ক্রিয়ভাবে আছে, অনত্র সেরূপ নহে। এমন কি,' বৃহত্তর ভারতে'র অঙ্গীভূত চীন-জাপানেও ত্যাগ-আত্মা ইত্যাদির অস্তিত্ব নিষ্ক্রিয়ভাবে নাই, উহাদের সঙ্গে দস্তুর মত সৈন্য-অস্ত্র, পীড়ন-লুণ্ঠন আছে। সৈন্য-অস্ত্রাদির সঙ্গে যে ত্যাগ-আত্মাদির সম্পূর্ণ বিরোধ, ইহা বিশ্বের অপরাপর দেশের লোকেরা মনে করে না। কাজেই 'বীর্য্যবান দস্যুদের নাম ভারবর্ষের পুরাণে খ্যাত হয়নি' বলিয়া ভারতকে গৌরব করিতে দেখিয়া অপরাপর স্বাধীন দেশের লোকেরা ইহাকেই ভারতের চির-পরাধীনতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

রবীন্দ্রনাথ 'পলিটিক্‌স্' ও 'ইকনমিক্‌স্'কে উড়াইয়া দিয়াছেন। ভারতের সত্যবাণী মাথায় থাকুক, কিন্তু পলিটিক্‌স্ কি পরাধীন দেশের পক্ষে একটা কম বড় সত্য ? ভারতের পলিটিকেল ও ইকনমিকেল মুক্তি না ঘটিলে ভারতের উপরোক্ত 'সত্যবাণী' প্রচার করা

কি সম্ভব?—তাহা কি ভিক্ষুকের আত্মনিবেদনেই পর্য্যবসিত হইবে না? এযুগে পরাধীন দেশের কোনও বাণীই কেহ শুনিতে চাহে না, একথা বুঝিবার সময় কি এখনও এদেশে আসে নাই? নিতান্ত সেকেলে আদর্শবাদ—বড় বড় অচল বাণী প্রচারের দিন যে, বহুকাল গত হইয়াছে, এই বিজ্ঞানোন্নত বিংশ শতাব্দীতেও কি তাহা আমরা বুঝিব না?"

৫ : ৪, আশ্বিন ১৩৩৪ সংখ্যায় 'নূরী' লিখেছেন তিনটি পত্রিকার আলোচনা :

"**কল্লোল**—ভাদ্র

"কল্লোল' একখানা সুসম্পাদিত মাসিক পত্র। ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ মহাশয়ের ভাল চিত্রশিল্পী বলিয়া নাম আছে। 'কল্লোল'-সম্পাদন দেখিয়া মনে হয়, দীনেশবাবু শুধু ভাল চিত্র-শিল্পী নহেন, ভাল পত্রিকা-সম্পাদক এবং রসজ্ঞ সাহিত্যিকও বটেন। 'কল্লোল' নূতন দলের মাসিক; বাঙ্গলার তরুণদের ভাব, আদর্শ ইত্যাদি ইহার রচনাদিতে প্রতিফলিত হয়। এইজন্য বুড়োর দল 'কল্লোলের' প্রতি ভারি চটিয়া গিয়াছেন। তাই তাহারা কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদির দ্বারা তরুণদিগকেও তাহাদের আদর্শকে বিদ্রূপ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছেন। এই বুড়োর দলের জরাজীর্ণ প্রচেষ্টাকে যে সমস্ত কাগজ সমর্থন করিতেছেন, তন্মধ্যে 'প্রবাসী' অগ্রণী। সম্প্রতি 'বিচিত্রা' নামক নব প্রকাশিত মাসিকও তাহার দোসররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য 'কল্লোল', বা তরুণদল ও তাহাদের সমর্থকদের আতঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই। কারণ যুগে যুগে এইরূপই হইয়া আসিয়াছে। নববলদৃপ্ত তরুণের আবির্ভাবে পুরাতনদল নিজের সঙ্কটাপন্ন অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিবার জন্য বরাবরই এই ভাবে ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া আসিয়াছে। তাহাতে তরুণের গতি ব্যাহত হয় নাই; বাধা পাইয়া তরুণের গতি আরো বেগবতী হইয়াছে মাত্র এবং জীর্ণ পুরাতন হাস্যাস্পদ হইয়া অন্ধকারের কোণে মুখ লুকাইয়াছে।

'কল্লোলে'র আলোচ্য সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ গল্প, কবিতাদি সুনির্ব্বাচিত ও সুখপাঠ্য; ঢক্কানিনাদী সুবিপুল-কলেবর মাসিক পত্রাদির ন্যায় ইহাতে Trash দ্বারা স্থান পূরণের কোনরূপ চেষ্টা নাই। 'ডাকঘর' শীর্ষক ইহার সম্পাদকীয় মন্তব্য গুলি অতি চমৎকার ও সুলিখিত।

কালিকলম—শ্রাবণ

'কালিকলম'ও তরুণদলের আর একখানা মাসিক। ইহাতে প্রকাশিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতাদিও মোটের উপর সুপাঠ্য বলা যাইতে পারে। তবে ইহার কোন কোন লেখায় আর্য্যামীর আস্ফালনের মিথ্যা গোঁড়ামী মাঝে মাঝে দৃষ্ট হয়। তাহার কারণ বোধ হয়, ইহা স্বদেশীযুগের নেতা শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষের দলের কাগজ বলিয়া। পাঠকগণ অবগত আছেন, হিন্দুস্বরাজ স্থাপনোদ্দেশেই এদেশে স্বদেশী আন্দোলন গজাইয়া উঠিয়াছিল। এ দলের মতামত ইহাতে প্রকাশিত হয় বলিয়া ইহাতে আর্য্যামীর আস্ফালন অল্পবিস্তর থাকিবেই। এই সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুত নলিনীকিশোর গুহ লিখিত 'বিচিত্রা' শীর্ষ রাজনৈতিক আলোচনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। নলিনীবাবু স্বদেশীযুগের একজন পাণ্ডা। তিনি সুলেখক স্বীকার করি; কিন্তু তাঁহার লেখায় সেই যুগের বিশেষত্বের ছাপ পড়িয়াছে। তিনি 'রঙ্গিলা রসুল' আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া মুসলমান-দিগকে প্রাণ খুলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, কারণ মুসলমানরা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগকে হীন উদ্দেশ্যে জঘন্য আক্রমণের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটা নূতন আইন করিবার জন্য

আন্দোলন করিতেছে। নলিনী বাবু লিখিয়াছেন—'তবে একথা সত্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদের চরিত্রের সমালোচনা এক কথা—আর হীন উদ্দেশ্যে জঘন্য আক্রমণ আর এক কথা। আইন শেষোক্তকেই সাজা দিতে পারে, প্রথমটিকে নয়।' তাই যদি সত্য হয়, তবে মুসলমানদের প্রতি নলিনীবাবুর দ্বিতীয় রিপু এভাবে চাগিয়া উঠিবার কারণ কি? মুসলমানেরা ত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদের উদ্দেশ্যে হীন জঘন্য আক্রমণের প্রতিরোধের জন্যই এই আইন প্রবর্ত্তনের আন্দোলন করিতেছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি 'রঙ্গিলা রসুল' পড়েন নাই। কাজেই 'রঙ্গিলা রসুলে' হজরত মুহম্মদের ঐতিহাসিক চরিত্র সমালোচনা আছে, না অযথা কুৎসা আছে, তাহা তিনি জানেন না। তবে তিনি কি করিয়া অনুমান করিলেন যে মুসলমানেরা হজরতের ঐতিহাসিক চরিত্র সমালোচনায় ক্ষেপিয়া উঠিয়া আইনের জন্য আবদার ধরিয়াছে? শুধু তাই নহে, তিনি দয়া করিয়া মুসলমানদিগকে হিন্দু সমাজের গুটীকয়েক উদারতার বুলিও শুনাইয়া দিতে ছাড়েন নাই; যথা,—'আমরা হিন্দু হইয়াও আমরা মানুষ যে, এযুগের মুক্তিকামী মানুষ যে, এই কথা ভুলিতে পারি না।' 'মিশনারীরা হিন্দুর আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণের কম কুৎসা করে নাই। কিন্তু হিন্দু এমন আন্দোলন কখনো উপস্থিত করে নাই' ইত্যাদি। হিন্দুরা আন্দোলন করে নাই বলিয়াই যে হিন্দুদের এ আচরণ আদর্শস্থানীয়, একথা নলিনীবাবু মানিলেও যে সকলেই তাহা মানিয়া লইবে, এমন কি মাথার দিব্য আছে? আর তাই বা কেন? শিবাজী ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক নন, ভারতের একজন হিন্দু রাষ্ট্রনায়ক মাত্র। তাঁহার ঐতিহাসিক চরিত্র সমালোচনায় সেদিন যে হিন্দু সমাজ তেলে-বেগুণে জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন, নলিনীবাবু সে সম্বন্ধে কি বলেন? তিনি এ সম্বন্ধে চুপ কেন? এই উপলক্ষে তিনি আরও গুটি-কয়েক হিন্দু উদারতার বুলি মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া কপ্‌চাইলে আমরা অধিকতর সুখী হইতাম! বস্তুতঃ এই শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক উদারতার বুলি কপ্‌চানো শুধু নিরর্থক নহে, হাস্যকরও বটে। 'আমার সমাজ এতটা উদার ও মহান—আর তোমার সমাজ এর তুলনায় কত হীন', এই শ্রেণীর আলোচনায় যাঁহারা নামেন, তাঁহাদের মুখে মানুষের 'স্বাধীন চিন্তা', 'স্বাধীন বুদ্ধি', 'মুক্ত-মনীষার' ব্যাখ্যা শুনিলে হাস্য সংবরণ করা বাস্তবিকই কষ্টকর হইয়া পড়ে।

মাসিক বসুমতী—শ্রাবণ

এ সংখ্যায় 'ভারতীয় নৃত্যকলা বিদ্যা' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার লেখক শ্রীযুত রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ। 'বিদ্যাভূষণ' মহাশয় প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিয়াছেন, 'মুসলমানেরা আমাদের দেশ জয় করিলে তাহাদের অত্যাচারে গৃহস্থ গৃহ হইতে নৃত্যকলা পলায়ন করিল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রমণীগণের অন্তঃপুর সৃষ্ট হইল এবং ঘোম্‌টা প্রথা প্রচলিত হইল।' লেখক এই উক্তির অনুকূলে কোনরূপ প্রমাণ-পঞ্জী উপস্থিত করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তিনি বোধ হয় ভাবিয়াছেন—তিনি যখন একে 'শাস্ত্রী', তদুপরি 'বিদ্যাভূষণ', তখন তাহার উক্তিকে লোকে আপ্তবাক্য বলিয়াই গ্রহণ করিবে! কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের মনে করা উচিত—তিনি শুধু 'বিদ্যাভূষণ' কেন, বিদ্যার জাহাজ হইলেও এ যুগে তাহার এরূপ আনুমানিক কথাকে কেহ আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিবে না। তাঁহার অনুগত টোলের ছাত্রদিগকে, কিম্বা অন্ধভক্ত অনুচরদিগকে একথা সহজেই বিশ্বাস করানো গেলেও জগতের অপরাপর লোকেরা অত সহজে বিনা প্রমাণ-পঞ্জীতে তাঁহার কথা মানিয়া লইতে পারে না। এই সব কথায় বৈঠকী আলাপ বেশ জমিয়া উঠিতে পারে বটে, কিন্তু সাময়িক সাহিত্যের মারফতে যখন তাহা সর্ব্ব-সাধারণের গোচরে তুলিয়া ধরা হয় তখন তাহাতে ঐতিহাসিক প্রমাণ-পঞ্জী উপস্থাপিত করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে—নতুবা পাঠকসাধারণের কাছে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। কারণ এটা মোটেই সত্যযুগ নয়,—কলিযুগ এমনই নির্ম্মম বটে।"

৫ : ৫ কার্তিক ১৩৩৪ সংখ্যায় 'নূরী' লিখেছেন তিনটি পত্রিকার আলোচনা :

''**প্রবাসী**—আশ্বিন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনা 'প্রবাসী'র একটা বিশেষত্ব। আশুবাবু জীবিত থাকিতে 'প্রবাসী'র একটা সংখ্যাতেও এ আলোচনার বিরাম ছিল না। আশুবাবুর ব্যক্তিত্বের সর্ব্বগ্রাসী আবেষ্টনের মধ্যে পড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতার যে আবর্জ্জনা জমিয়া উঠিয়াছিল, তাতে ও-সম্বন্ধে কঠোর নিরপেক্ষ আলোচনার যে খুব প্রয়োজন ছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। 'প্রবাসী' এ আলোচনার সূত্রপাত করিয়া সে সময় খুব ভাল কাজই করিয়াছিলেন। কিন্তু সময়ে সময়ে সে আলোচনায় যেন আশুবাবুর প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষবিষের বিষ ফুটিয়া উঠিত, তাহা অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির 'প্রবাসী'র আলোচনার প্রতিবাদে বুঝিতে পারা যাইত। তা সত্ত্বেও আশুবাবুর জীবিতকালে তাঁহার প্রতি অযথা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রয়োজনীয়তার খাতিরে হয়ত সহ্য করা যাইত, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর নিশ্চয়ই তাঁর উদ্দেশ্যে অশ্রদ্ধেয় ভাষাপ্রয়োগ বা অযথা ঠাট্টা-বিদ্রূপ ভদ্রতাসঙ্গত ও সমর্থনীয় নহে! 'প্রবাসী' কিন্তু পরলোকগত আশুবাবুর উদ্দেশ্যও অভদ্র ঠাট্টা-বিদ্রূপে কিছুমাত্র পিছ্‌পাও নহেন! এই সংখ্যা 'আলোচনা' অধ্যায়ে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আশুবাবুকে বিদ্রূপাত্মক ভাবে 'আগেকার কর্ত্তা' ইত্যাদি বলা হইয়াছে। 'যারে দেখ্‌তে নারি, তার চলন বাঁকা' আশুবাবুর প্রতি এই মনোভাব কি তাঁর মৃত্যুর পরেও 'প্রবাসী' বিসর্জ্জন দিতে পারিবেন না? যদুবাবুকে প্রশংসা করিবেন। বেশ কথা! কিন্তু তাই বলিয়া মৃতব্যক্তিকে এই সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া লাভ কি? তার ঠাট্টা-বিদ্রূপে মৃত ব্যক্তির কি আসিবে যাইবে!

এই শ্রেণীর জঘন্য অভদ্রতা ও বাক্যে সংযম-শালীনতার অভাব বর্ত্তমান 'প্রবাসী'র বৈশিষ্ট্য হইয়া উঠিতেছে। 'বিবিধ-প্রসঙ্গ' অধ্যায়ে মিস্ মেয়োর আলোচনায় তাহা চরমে উঠিয়াছে। মিস্ মেয়োকে 'প্রবাসী' 'একটা মার্কিন স্ত্রীলোক' বলিয়া উল্লেখ করিতে লজ্জাবোধ করেন নাই। শুধু তাই নয়, মিস্ মেয়োর সম্বন্ধে সম্ভ্রমাত্মক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করাও আবশ্যক বোধ করেন নাই। যথা,—'কেথারিণ মেয়ো-নাম্নী একটা মার্কিন স্ত্রীলোক ......'মাদার ইণ্ডিয়া' নামক একখানা বই লিখিয়াছে।' 'প্রবাসী' প্রায়ই নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য গর্জ্জন করিয়া থাকেন; নারীজাতির দুঃখ-দুর্দ্দশায়, অপমান-লাঞ্ছনায় প্রায়ই তার দু'নয়নে 'সাঁতার-পানি' বহে। কিন্তু সেই নারীজাতিরই একজনের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া এইভাবেই 'প্রবাসী' তাঁহাকে সম্মান করিয়াছেন! মিস মেয়োর বই ভাল না হইতে পারে, তিনি ভারতীয় স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে অনেক মিথ্যা কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্য হইতে পারে; কিন্তু তাঁর বইয়ের প্রতিবাদ কি ভদ্র ভাষায় করা যাইত না? ইহাতে নিজের চরম অভদ্রতার স্বরূপ প্রকাশ ছাড়া আর কি লাভ হইতে পারে? আশ্চর্য্যের বিষয়, এই শ্রেণীর হিন্দু সাময়িক পত্রের দেখাদেখি একখানা নব-প্রকাশিত মুসলমান-পরিচালিত মাসিকও এইরূপ অভদ্র ভাষায় মিস মেয়োর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। হিন্দু-সাধারণের 'বাহ্‌বা' লাভ ছাড়া এর আর কি উদ্দেশ্য হইতে পারে? হায়রে দাস-মনোভাব!

'প্রবাসী' পরলোকগত জগ্‌লুল পাশার পরিচয় দিতে গিয়া তাঁহাকে খৃষ্টান করিয়া ছাড়িয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেও 'প্রবাসী'তে একবারে জগ্‌লুলকে খৃষ্টান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল। তখন কয়েকখানা মুসলমান সাপ্তাহিক তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। মৌলভী ফজ্‌লুল হক সেল্‌বর্ষী সাহেব 'প্রবাসী'তেও একটা প্রতিবাদ পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহা উহাতে ছাপাও হইয়াছিল। তথাপি আবার 'প্রবাসী'তে সেই ভুল করা

হইয়াছে। ইহা 'প্রবাসী'র দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, কিংবা নিজ অজ্ঞতাকে আকড়িয়া ধরিয়া থাকিবার চরম অহমিকা ছাড়া আর কি হইতে পারে? তা ছাড়া ইহা 'প্রবাসী'র একটা মৌলিক গবেষণাও হইতে পারে; কারণ নিজ অজ্ঞতাকে মৌলিক গবেষণা বলিয়া চালাইবার চেষ্টাও আজকাল একেবারে বিরল নহে!

কালিকলম—ভাদ্র

এ সংখ্যায় 'বিচিত্রা'-শীর্ষক নিবন্ধে শ্রীযুক্ত নলিনীকিশোর গুহ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদের অযথা নিন্দার প্রতিরোধার্থে আইন প্রণয়ন উপলক্ষে আবার মুসলমানদিগকে গুটিকয়েক উপদেশ খয়রাত করিয়াছেন। তার প্রথম উপদেশ—'কোন কথায় ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বা সাধু ব্যক্তি-দের চেলাদের মনে কষ্ট হইলেই তাহা ধর্ম্মের নিন্দা হয় না।' সাধু! কিন্তু নলিনীবাবু কষ্ট করিয়া এ উপদেশ খয়রাত না করিলেও চলিত, কারণ জজ দলীপসিংহ তাঁহার পূর্ব্বেই মুসলমানদিগকে এ উপদেশ দিয়া চুকিয়াছেন! নলিনীবাবুর দ্বিতীয় উপদেশ—'যাতে অযথা ও বিদ্বেষমূলক মিথ্যা নিন্দা ও কুৎসা বন্ধ হয়, তার ব্যবস্থা বর্ত্তমান আইনেই আছে, নূতন আইন করিয়া আইনের অপপ্রয়োগের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়া দেশের সুস্থ বুদ্ধিকে গলা টিপিয়া ধরিতে সাহায্য করা কর্ত্তব্য নহে।' নলিনীবাবুর এই 'কর্ত্তব্য'-বোধ-উদ্দীপক উপদেশবাণী প্রচার সত্ত্বেও কিন্তু উপরোক্ত আইন ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে অধিকাংশের ভোটে পাশ হইয়া গিয়াছে। 'যাতে অযথা ও বিদ্বেষমূলক মিথ্যা নিন্দা ও কুৎসা বন্ধ হয়, তার ব্যবস্থা বর্ত্তমান আইনেই আছে', একথা আইনজ্ঞ নলিনীবাবু জলের মত বুঝিয়া ফেলিলেও এবং তিনি জজ হইলে মিথ্যা নিন্দা ও কুৎসা-কারীরা যে তাঁর হাতে উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হইত, তাহা নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিলেও ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমরা দেখিয়াছি যে, দলীপসিংহের মত জজ তাহা বুঝিতে পারেন নাই এবং না বুঝিতে পারিয়া এ সম্বন্ধে নূতন আইন প্রণয়নের জন্য উপদেশ দিয়াছেন। এমতা-বস্থায় আইনজ্ঞ লোকদের মধ্যে যাহা লইয়া মতদ্বৈধতা ঘটিয়াছে, সে সম্বন্ধে পাকা আইন হওয়া এমন কি দোষের?—বিশেষতঃ নলিনীবাবু যখন মিথ্যা নিন্দা ও কুৎসার দমন হওয়ার ঔচিত্য স্বীকার করিয়াছেন!

বিচিত্রা—আশ্বিন

ছাপা, কাগজ, ছবি ও সাজসজ্জায় এবারকার 'বিচিত্রা' বাঙ্গলার মাসিক পত্রসমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। 'বিচিত্রা' রবীন্দ্রনাথের বাহনরূপে সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাই রবীন্দ্রনাথের গদ্য, পদ্য—সব রকম রচনায় সমৃদ্ধ হইয়া 'বিচিত্রা' সত্যই বিচিত্র হইয়া বাহির হইতেছে। এ সংখ্যা হইতে রবীন্দ্রনাথের নূতন উপন্যাস 'তিন পুরুষ' আরম্ভ হইল। বার বৎসর পর আবার রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে কলম ধরিয়াছেন। রবীন্দ্র-প্রতিভাকে 'বিচিত্রা' আবার বঙ্গসাহিত্য-সেবায় পরিপূর্ণরূপে নিয়োজিত করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাহার একটা পরম গৌরব।

এ সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় মৌলবী হুমায়ুন কবির প্রসিদ্ধ ইংরেজ-সাহিত্যিক 'যোহান বোয়ারে'র প্রতিভার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লেখায় শক্তির পরিচয় আছে। লেখকের সাহিত্যিকোচিত রসবোধ ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি প্রশংসনীয়। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই শ্রেণীর বিশ্লেষণমূলক রচনার ভাষা আরও প্রাঞ্জল হওয়া দরকার। লেখক অনেক কথা বুঝাইতে চান, কিন্তু ভাষার দোষে তাঁহার আলোচনা সরস ও হৃদয়গ্রাহী হইতেছে না। আমাদের অনুরোধ, লেখক যেন আরও প্রাঞ্জল ভাষায় নিজের বক্তব্যকে গুছাইয়া বলিতে চেষ্টা করেন।"

৫ : ৭, পৌষ ১৩৩৪ সংখ্যায় 'নূরী' তিনটি পত্রিকার সমালোচনা লিখেছেন :

''**বঙ্গবাণী**-কার্ত্তিক

এ-সংখ্যায় 'কাব্য-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক নিজের নাম প্রকাশ করেন নাই। প্রবন্ধটী ক্ষুদ্র হইলেও সুলিখিত ও সুচিন্তিত লেখক বলেন, 'বাঙ্গলা কাব্যে ভাবতান্ত্রিকতা ও রহস্যময়তা চরমে পৌছিয়াছে—মনে হয়, ইহার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আসন্ন এবং সে প্রতিক্রিয়া আসিবে, কাব্যে বস্তুতান্ত্রিকতার অনুশীলনের প্রয়াসে। রবীন্দ্রোত্তর কাব্য-সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের ভাবে বিভোর ও মুহ্যমান হইয়া আছে—এই বিহ্বলতার ঘোর একটু কাটিয়া যাইলেই রবীন্দ্রনাথের ভাব, ভঙ্গি, ভাষা, রহস্যময়তা ও রবীন্দ্র-কাব্যের অন্যান্য সকল উপাদান-উপকরণকে যথাসম্ভব বর্জ্জন করিয়া চলিবার একটা প্রয়াস যে অদূর ভবিষ্যতেই কাব্য-রচনায় আসিবে, সে অনুমান বোধ হয় খুব অসঙ্গত নয়।' লেখক যাহা এখনও 'অনুমানে'র উপর বরাত দিয়া রাখিয়াছেন, আমাদের মনে হয়, তাহা এখন আর 'অনুমানে'র অবকাশের মধ্যে নাই, তাহা বাস্তব সত্যেই পরিণত হইয়া গিয়াছে। কল্পলোকবাসী রহস্যময় কাব্য-সাহিত্য বর্ত্তমানে বেশ একটু 'সেকেলে'ই হইয়া গিয়াছে। নজরুল ইসলামের আবির্ভাবে এবং তদনুকারী বহু প্রতিভাশালী নবীন কবির আগমনে কাব্য-সাহিত্যের এই নূতন যুগ ইতিপূর্ব্বেই সূচিত হইয়া গিয়াছে। এখন আর অবাস্তব কল্পলোকবিহারী কাব্য-বিলাস ভাল লাগে না, রহস্যময় 'বাউলী' ভাষায় লেখা 'সেকেলে' আদর্শের বুলিও অসার্থক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। বর্ত্তমানে মানব-জীবন প্রবাহের গতি কত বিচিত্র, কত বিপুল হইয়া উঠিয়াছে ; এখন এর সম্পর্ক ছাড়া আকাশের গান—ধরিবার ছুঁইবার মত যাহাতে কিছু পাওয়া যাইবে না—এবং সেকেলে আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথার বুক্‌নী বর্জ্জন করিবার চেষ্টা না করিলে বিশ্বের সঙ্গে সমান তালে চলা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। তাই কাব্য-সাহিত্যের আদর্শের এই পরিবর্ত্তন উন্নতির দিকেই হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।...

প্রবাসী-কার্ত্তিক

'প্রবাসী'তে 'ভাবকুমার কাঞ্জিলাল' এই ছদ্মনামীয় এক রস রচনা লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে,—যেহেতু 'পরশুরাম' এই ছদ্মনামীয় একজন যথার্থ রসিক লেখক 'ভারতবর্ষে' রস-রচনা প্রকাশ করিতেছেন। 'ভারতবর্ষে'র সহিত পাল্লা দিতে গিয়া 'প্রবাসী'র এই রসিক (!) লেখকটী ভুলিয়া গিয়াছেন,—মাথা কুটিয়া, উদ্ভট কল্পনাকে জোর করিয়া মন্থন করিয়া রস বাহির করা যায় না। এই সংখ্যা 'প্রবাসী'তে এই লেখকের 'হারুড়ল রশিদের পুনর্জ্জন্ম' শীর্ষক একটা বিদ্‌ঘুটে রচনা বাহির হইয়াছে। 'প্রবাসী' অবশ্য ইহাকে রস-রচনা বলিয়াই ছাপাইয়াছেন! কিন্তু ইহাকে চিবাইয়া রস একবিন্দু পাইবারও সুদূর সম্ভাবনা নাই, পাওয়া যাহা যাইবে তাহা হইতেছে—কস্। রসই সাহিত্যের জিনিস—কস্ নহে। অথচ এই কস্-পূর্ণ রচনাটা লইয়াই 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষে'র সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইয়াছেন! মুসলমানদিগকে অভদ্র আক্রমণ করিলেই রসসৃষ্টি হয় না,—তাহা হয় বিদ্বেষের ক্লেদ! ক্লেদের স্থান নর্দ্দমায়—সাহিত্যে নহে।

'বিবিধ-প্রসঙ্গে' বরাবরের ন্যায় এবারও অনেক নিরপেক্ষ আলোচনা স্থান পাইয়াছে। তার মধ্যে একটী হইতেছে এই—'কুমারী ফাজিলতুন্নেসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। মুসলমান-ছাত্রী দূরে থাকুক, কোন মুসলমান-ছাত্রও ...গণিতে এরূপ পারদর্শিতা দেখাইতে

পারেন নাই, অথচ ইতিপূর্ব্বে মৌলভী আবদুস্ সোবহান এবং মৌলভী মুজীবর রহমান—এই দুইজন মুসলমান এম-এ পরীক্ষায় গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। 'সবজান্তা'-ভাবের মন্তব্যপ্রকাশ 'প্রবাসী'র বিশেষত্ব। কিন্তু মন্তব্য-প্রকাশের বেলায় এই ভাব বজায় রাখিতে হইলে এইটু খোঁজ-খবর লইয়াই লেখা উচিত; তাহা না হইলে তাহা আর বজায় থাকে না—তাহাতে লোকসমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। কিন্তু 'প্রবাসী' তাহা গ্রাহ্য করিবেন না—সব থাকিয়াও তিনি নিজেকে 'সবজান্তা' বলিয়া প্রকাশ করিবেন! এবং ইহাই তাহার নিরপেক্ষ আলোচনার বিশেষত্ব!

'হিন্দু-মুসলমান সদ্ভাববর্দ্ধন' শীর্ষক নিবন্ধে 'প্রবাসী' লিখিয়াছেন, 'বিরোধের কারণ, সামাজিক ও ধার্ম্মিক কতকটা বটে; কিন্তু উহা বেশীর ভাগ রাজনীতিক ও অর্থনীতিক প্রতিযোগিতা ও ঈর্ষা হইতে উৎপন্ন।' 'প্রবাসী' যেটাকে ঈর্ষা বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার বিদ্বেষ-বিকৃত বুদ্ধিতে ঈর্ষা বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা ঈর্ষা নহে,—তাহা সবলের নিকট হইতে দুর্ব্বলের ন্যায়াধিকার প্রাপ্তির চেষ্টা—সবল হিন্দুর অন্যায় চাপ হইতে দুর্ব্বল মুসলমানের আত্মপ্রকাশের ন্যায়সঙ্গত ইচ্ছা। চোখ হইতে বিদ্বেষ ও একদেশদর্শিতার ঠুলি সরাইয়া ফেলিতে পারিলে তিনি তাহা দেখিতে পাইতেন। এখন অবশ্য তাঁহার 'নিরপেক্ষ বিচারে'র দৃষ্টিতে তাহা চোখে পড়িবে না বটে।

মাসিক বসুমতী-আশ্বিন

'মাসিক বসুমতী'র পুরাতন প্রীতি উল্লেখযোগ্য। যত-সব 'সেকেলে'-ভাবের ভাবুক নবীন-প্রবীণ লেখক ইহাতে লিখিয়া থাকেন। তাই ইহাতে পড়িবার মত বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণের 'রস-শাস্ত্রের' মত রচনা হইতে শ্রীযুক্ত অমৃতলালের 'হামিদের হিম্মত' পর্য্যন্ত সমস্ত রচনাই যেন সেই 'সেকেলে' জরাজীর্ণ-ভাবের প্রদর্শনীক্ষেত্র!—মনে হয়, এ-যুগের সাহিত্যের উপর এ যেন একটা অত্যাচার! অমৃত-লাল সেকালের প্রতিভাশালী লেখক ও নাট্যকার। 'শতুরে'র মুখে ছাই দিয়া তিনি বর্ত্ত-মানে আশী পার হইয়াছেন। এ-বয়সে সাধারণতঃ কেহই বড় হস্ত কণ্ডূয়নে প্রবৃত্ত হন না। কিন্তু 'মাসিক বসুমতী'র জ্বালায় অমৃতলালের এ-বয়সেও শান্তি উপভোগের অবসর নাই! 'মাসিক বসুমতী'র এই অত্যাচারের পরিণাম যে অমৃতলালের উপর কিরূপ করুণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তাঁহার 'বন্দনা-গীত' শীর্ষক কবিতার চেহারায় ফুটিয়া উঠিয়াছে,—

'বন্দ সে সারদানন্দ নাম
ধন্য হব স্মরি পুণ্যধাম
সাধুত্তম কর্ম্মযোগী ক্ষণবান্!'

শ্রীযুক্ত মুণীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী নামক এক লেখক 'নেয়ের মেয়ে' শীর্ষক একটী গল্প লিখিয়া এ-সংখ্যা 'বসুমতী'তে প্রকাশ করিয়াছেন। গল্পটী হইতেছে এই,—

মাধব বড়লোক। তিনি একটী অজ্ঞাতকুলশীল বালিকা কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। তিনি দয়াবশে নিজ পরিবারে তাহাকে প্রতিপালন করিতে চান। ইহাতে তাহার পত্নী বাধা দেন; কারণ মেয়েটী কি জাতের, তাহা ত জানা নাই,—কাজেই এমন মেয়েকে নিজ পরিবারে স্থান দিলে পরিবারের জাত নষ্ট হইবে! স্ত্রীর এই অকাট্য যুক্তিতে মুগ্ধ হইয়া মাধববাবু তাহার আশ্রিত মাঝি চরণের উপর এই মেয়ে-প্রতিপালনের ভার দেন। ঐখানে রাখিয়াই তিনি সোহাগকে (অজ্ঞাতকুলশীল কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ের নাম)

প্রতিপালন ও সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন। মেয়ে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য্য সুন্দরী হইয়া উঠিল, এবং লেখাপড়াও বিলক্ষণ শিখিল। শিক্ষিতা মেয়েকে লইয়া মাধববাবু এখন বিবাহের জন্য বেশ একটু মুশকিলে পড়িলেন। মেয়ের রূপ ও শিক্ষা-দীক্ষার কথা শুনিয়া একজন অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পাত্র মিলিল। কিন্তু পাত্র মিলিলে হইবে কি, মাধববাবুর স্ত্রী ইহাতে বাধা দিলেন। কারণ—এমন অনাছিষ্টি কাণ্ডওকি হইতে পারে? তিনি পরামর্শ দিলেন, 'মেয়েটাকে দাইগিরি স্কুলে ভর্ত্তি করে দাও।' এ-কথায় মাধববাবু কি করিবেন ভাবিয়া একটু বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। সংস্কার-বাতিকগ্রস্ত লেখক কিন্তু দমিবার পাত্র নহেন! হঠাৎ এই সময়, কোথা হইতে জ্বর আসিয়া মেয়েটাকে ভীষণ আক্রমণ করিল, এবং মেয়েটাও মরিয়া গেল। বাস্, সমস্ত লেঠা চুকিয়া গেল! মাধববাবু আশীর্ব্বাদ করিলেন, 'মেয়ের মেয়ের আত্মার সদ্‌গতি হউক!'

মেয়ের মেয়ের আত্মার সদ্‌গতি হইয়াছিল কি না, সে-খবর আমরা রাখি না—কিন্তু এই গল্পের আত্মার সদ্‌গতি যে খুব ভাল মতেই হইয়াছে, তাহা আমরা বলিতে পারি। আমরা বলি—সাবাস লেখক, জিতা রহো!"

৫ : ৮, মাঘ ১৩৩৪ সংখ্যায় আলোচিত হয়েছে দু'টি পত্রিকা। লেখকের নাম নেই।

"বাঙ্গলার কথা

৪ঠা পৌষের 'বাঙ্গলার কথা'য় রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রেসিডেন্সী কলেজে রবীন্দ্র-পরিষদের অভ্যর্থনার উত্তরে এই বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছিল। এই বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ তরুণ সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্য করিয়া অনেক কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার স্বদেশ তাঁহাকে বুঝিতে পারে নাই, কারণ সাময়িক ঘটনাবলীর আবরণে তাঁহার প্রকৃত চেহারাটি দেশবাসীর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। তিনি আরো বলেন, ইউরোপ তাহাকে দূর হইতে দেখিয়াছে, কাজেই তাঁহার সত্য এবং সমগ্র মূর্ত্তিটী তাহাদের চক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের এই দর্শন আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। দূরে থাকিলে 'সত্য ও সমগ্র মূর্ত্তিটী' লোকের চোক্ষে প্রতিভাত হইয়া উঠে, আর নিকটে থাকিলে 'প্রকৃত চেহারাটি ফুটিয়া উঠে না', রবীন্দ্রনাথের এই দর্শন বুঝিবার মত সূক্ষ্মবুদ্ধি আমাদের নাই, ইহা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। একটা কবিতায় আছে, 'নিকটে তরঙ্গ, দূরে রজত-রেখা।' 'তরঙ্গ'কে দূর হইতে দেখিলে 'রজতরেখা' বলিয়া ভ্রম হইতে পারে কিন্তু তরঙ্গ তরঙ্গ—'রজত-রেখা' নহে, ইহাত সত্য। 'তরঙ্গ'কে 'রজত-রেখা' বলিয়া ভ্রম, তরঙ্গের সত্য ও প্রকৃত চেহারার পরিচয় নয়। ইউরোপ রবীন্দ্রনাথকে দূর হইতে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের সত্য চেহারার পরিচয় পায় নাই, তাঁহাকে 'রজত-রেখা' বলিয়াই ভ্রম করিয়াছে—একথা বলিবার আমাদের ইচ্ছা নাই। কিন্তু তিনি এই সম্পর্কে যে দর্শন ঝাড়িয়াছেন, তাহার অর্থ ত আমরা এছাড়া আর কিছুই করিতে পারিলাম না।

রবীন্দ্রনাথ দেশের ভালবাসায় অবিশ্বাসী। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর দেশবাসী যখন তাঁহাকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিল, তখনও তিনি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এই অবি-শ্বাসের কথার উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে অপমান করিয়াছিলেন। আমাদের ত মনে হয়, রবীন্দ্রনাথকে দেশবাসী যতটা শ্রদ্ধা-প্রীতি-ভালবাসা দিয়াছে, এতটা আর কাহাকেও দেয় নাই। তাঁহার অসাধারণ কবি-প্রতিভাকে হৃদয়ের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য প্রদান করেন নাই,

বাঙ্গালা দেশে এমন একটী সাহিত্যপ্রাণ ব্যক্তি আছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। তবে তাঁর সঙ্গে মতানৈক্য হয়ত কারো কারো থাকিতে পারে, কিন্তু এই মতানৈক্য তাঁর কবি-প্রতিভার প্রতি অশ্রদ্ধা কারো মনে জন্মাইয়াছে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। মানুষে মানুষে মতানৈক্য থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু উহা প্রতিভার প্রতি অশ্রদ্ধার কারণ হইতে পারে না। সমগ্র বাঙ্গলা আজ তাঁহার রচনাভঙ্গির অনুকরণমোহে উন্মত্ত; তাঁর যা' তা' চিঠি-পত্রও আজকাল প্রথম শ্রেণীর কয়েকখানা মাসিকে স্থান পাইতেছে। এততেও তাঁর চিত্ত ভরিল না? ইহাকে তাঁহার দেশবাসীর দুর্ভাগ্য বই আর কি বলা যাইতে পারে?

রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলার আধুনিক নবীন কবির জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। যেহেতু তাঁর মধ্যে নাকি 'চিরন্তনে'র সাধনা নাই। আমরা মনে করি না, 'চিরন্তন' শুধু রবীন্দ্রনাথেরই একচেটীয়া। তিনি বলিয়াছেন, আধুনিক কবি 'রক্তে'র মত চিরন্তন শব্দের স্থানে মাঝে মাঝে 'খুন' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে ইহা আধুনিক কবির পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইয়াছে। তাই তিনি বলিয়াছেন, 'আমি বল্‌চি— নবীনদিগকে আমরা জায়গা ছেড়ে দেব। কিন্তু চিরন্তন যা, তাকে ত্যাগ করে তারা যদি ডিগ্‌বাজী খায় তাহলে আমরা থাকব, মরেও মরব না, কিছুতেই যায়গা ছাড়ব না, তারা যদি উপদ্রব করে।'

রবীন্দ্রনাথের এই কথা শুনিয়া আমাদের হাসিও পাইয়াছে, লজ্জাও হইয়াছে; কারণ শনিবারের চিঠি-লেখকদের নিকট হইতে আমরা একথা শুনিতে প্রস্তুত থাকিলেও রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতেও আমরা একথা শুনিব, ইহা আমরা কল্পনাও করি নাই। চিরন্তনের সাধনা তাঁহাকে চিন্তার দিক দিয়া এতটা হাস্যকর করিয়া তুলিবে, ইহা আমরা ভাবিতে পারি নাই। বাঙ্গলা সাহিত্য শুধু হিন্দুর সাহিত্য নয়,—ইহা হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত বাঙ্গালীর সাহিত্য। বাঙ্গলাদেশবাসী হিন্দুগণই শুধু বাঙ্গালী নহেন, বাঙ্গলা-দেশবাসী মুসলমানগণও বাঙ্গালীত্বের সমান দাবীদার। বাঙ্গলা সাহিত্যে তাই শুধু বাঙ্গালী হিন্দুগণেরই জীবন-কথা আলাপ-আলোচনা ভাষায় স্থান আছে, তাহা নহে, বাঙ্গালী মুসলমানগণেরও জীবন-কথা, আলাপ-আলোচনা, ভাষার স্থান আছে, থাকা উচিত এবং থাকিবে। এযুগে ইতিপূর্ব্বে প্রতিভাশালী মুসলমান লেখক জন্মগ্রহণ করেন নাই; তাই যে সমস্ত মুসলমান বাঙ্গলা সাহিত্যসেবা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রধানতঃ প্রতিভাশালী হিন্দু লেখকদের অনুসরণ করিয়াছেন—মুসলমানী বৈশিষ্ট্য সাহিত্যে দাগিয়া দিতে পারেন নাই। ইহাতেই হিন্দুগণ যদি একথা ভাবিয়া থাকেন যে চিরকাল মুসলমান সাহিত্যসেবিগণ হিন্দুভাবেরই ভাবুক হইয়া থাকিবেন এবং বাঙ্গলা সাহিত্যের হিন্দু চেহারাই ইহার চিরন্তর চেহারা, তাহা হইলে তাঁহারা ভ্রান্ত। সংগঠনী হিন্দুগণ এদেশকে হিন্দুর দেশ ভাবিয়া থাকেন এবং হিন্দু-কাল্‌চারই এদেশের সমস্ত অধিবাসীর নির্ব্বিচারে অবশ্য গ্রহণীয়, এরূপ প্রচার করিয়া থাকেন। কোন এক সংগঠনী স্বামী নাকি দাবী করিয়াছেন যে, এদেশ হিন্দুর চিরন্তন দেশ,—মুসলমানেরা যদি হিন্দু না হইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে তাহাদিগকে এদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। এই সংগঠনী মনোভাব দেশের অধিকাংশ হিন্দুর মনে ক্রিয়া করিতেছে। হিন্দু-কাল্‌চার এবং মুসলিম-কাল্‌চার এই দুইটা যে আলাদা জিনিস, এবং ইহাদের মিশ খাওয়ানো যে সম্ভব নয়, এখনও অনেক হিন্দু এই কথাটা বুঝেন নাই। তাঁহারা হিন্দু-কাল্‌চারকেই এক মাত্র 'সত্য-সনাতন' মনে করিয়া উহা দ্বারা মুসলিম কাল্‌চারকে পিষ্ট করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ডাঃ আন্‌সারী কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে এই কথাটা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, উভয়কে মিশ খাওয়াইবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া উভয়কেই তাহাদের বিশিষ্ট ধারা বজায় রাখিতে দিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই সংগঠনী

মনোভাব ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাই তিনি 'খুনে'র ব্যবহার দেখিয়া চটিয়া উঠিয়াছেন। তিনি বোধ হয় ভাবিতেও পারেন নাই, মুসলমানদের কাছে ইহাতে তিনি কতটা হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। আরও হাস্যাস্পদ হইয়াছেন তিনি সেইখানে, যেখানে তিনি বলিয়াছেন যে নবীনদিগকে তিনি জায়গা ছাড়িয়া দিবেন না। রবীন্দ্রনাথের 'যদি'র আপত্তি এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক। কারণ তাঁর 'চিরন্তনের' idea সর্ব্ববাদীসম্মত না হইতে পারে। সুতরাং তাঁর নবীনের ডিগবাজী খাওয়ার কথাকে তাঁর নবীন-বরণবিমুখ দ্বিধা-গ্রস্ত মনের অহেতুক পুরাতন-প্রীতির নিদর্শন বলিয়াই অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন। তাঁর এই কথাতেই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে, জায়গা আকড়িয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেও তিনি ইতিপূর্ব্বেই জায়গা ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি নবীন দিগকে অভয় দিয়াছেন, 'আমাকে কেহ ভয় করো না—শঙ্কা করো না।' কিন্তু তিনি ইতিপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি নবীনদের শ্রদ্ধার চেয়ে ভয়ই বেশী আকর্ষণ করিয়াছেন। কারণ মনের দিক্ দিয়া তরুণের দাবী করিলেও তিনি যে অন্তরে অন্তরে একেবারে 'ঝুনো' হইয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার তরুণদিগকে জায়গা ছাড়িয়া না দিবার কথাতেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

নওরোজ—কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ

'নওরোজে'র সম্পাদক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন ইহার সম্পাদক হইয়াছেন মৌলবী মোহাম্মদ মোখ্‌লেসুর রহমান বি, এ—আনোরারী। অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই মাসিক-সাহিত্যে নওরোজ একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু নূতন সম্পাদকের পরিচালনাধীনে এই সংখ্যা 'নওরোজে'র চেহারা দেখিয়া আমাদের বড় কষ্টে মনে হইয়াছে 'তেহিন দিবসা গতা।' প্রবন্ধগুলি কিভাবে সাজাইতে হয়, বর্ত্তমান সম্পাদকের তাহাও জানা নাই। ইতিপূর্ব্বে কয়েক সংখ্যা 'নওরোজে' যে-সমস্ত ছবি ছাপা হইয়াছিল, এই সংখ্যায় তার প্রায় সবগুলি পুনর্মুদ্রিত করা হইয়াছে। কিন্তু ছবি যা ছাপা হইয়াছে, তাতে এ-গুলিকে ছবি বলিয়া চিনিবার উপায় নাই,—কালীর ধ্যাবড়া বলিয়াই ধরা যায়। 'নওরোজে'র প্রায় এক চতুর্থাংশ অন্যান্য কাগজ হইতে চয়ন করিয়া ভর্ত্তি করা হইয়াছে। চয়নের নমুনাও ভারী চমৎকার। আলী ভাইয়ের সহিত মহাত্মা গান্ধীর বন্ধুত্ব বজায় আছে, এইরূপ সংবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া 'কলিকাতার দুর্ঘটনায় মৃত্যু' পর্য্যন্ত সংবাদও সংবাদপত্র হইতে ইহাতে চয়ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর প্রবন্ধ নির্ব্বাচন ?—তার কথা না বলাই ভাল। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল, সম্পাদক হাতের কাছে যা পাইয়াছেন, তাই ছাপিয়া লেখকদিগকে অনুগৃহীত করিয়া দিয়াছেন! আমরা এমনও শুনিলাম, যে-সমস্ত প্রবন্ধ পূর্ব্ব-সম্পাদকের আমলে waste paper basket এ স্থান-লাভ করিয়াছিল বর্ত্তমান সম্পাদক নাকি সযত্নে সেগুলির পুনরুদ্ধার করিয়া 'নওরোজে' ছাপিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এই সংখ্যায় প্রবন্ধ নির্ব্বাচন দেখিয়া একথা সত্য বলিয়াই আমাদের মনে হইল। পূর্ব্ব-সম্পাদক কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত বর্ত্তমান সম্পাদকের কয়েকটি লেখাও নাকি ইহাতে প্রকাশের আয়োজন হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকের লেখা কবিতা 'সন্ধ্যারাণী' আমাদের কথার প্রমাণ। কবিতাটি আদ্যোপান্ত গভীর মনোযোগ সহকারে কয়েকবার পড়িয়াও ইহার অর্থগ্রহণ করা আমাদের সাধ্যে কুলাইল না। কবি স্বয়ং ইহার ব্যাখ্যা না করিলে যে অপর কেহ ইহা বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এমনও ধারণা হইল না।''

মৌলভী আবদুল মজিদ এম-এ সাহেবের 'বাঙলা সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে দীনেশ সেন, শশাঙ্কমোহন সেন, সুনীতি চাটার্জী, A. H. Sayee প্রভৃতি মনীষীদের লেখার অনেক quotation স্থান পাইয়াছে। এই লেখকের quotation-প্রীতির পরিচয় আমরা ইহার

বহু রচনাতেই এযাবত পাইয়াছি। Quatation বিদ্যাবত্তা এবং পড়া-শোনার পরিচায়ক বটে, কিন্তু তাহাতেই সব সময় বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার হয় না। এই লেখকের রচনাদিতে আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, quatation-কণ্টকিত হইয়া ইঁহার রচনা খুব জমকালো আকার ধারণ করে বটে, কিন্তু তাহাতে বক্তব্যের সুসঙ্গতি খুব কমই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। লেখক যদি পাণ্ডিত্য ও পড়া-শোনার পরিচয় দিবার জন্য অতি মাত্রায় ব্যস্ত না হইয়া নিজের বক্তব্য প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই আমাদের মতে তিনি লেখক হিসাবে নাম কিনিতে পারিবেন। আলোচ্য রচনাটীতেও আমরা তাঁহার নিজের বক্তব্যের চেয়ে quatation-প্রীতির পরিচয়ই বেশী পাইলাম।

'সমালোচনা' হেডিংটী ডবলগ্রেট টাইপে দেওয়ার হেতু কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ইহাতে দুইটী বইয়ের সমালোচনা আছে। প্রত্যেক বইয়ের সমালোচনার নীচেই লেখা আছে—'সম্পাদক'। আমরা এই সমালোচনার সমালোচনা করিতে চাই না, কিন্তু যে সমালোচক 'অমৃত নিঃসন্ধিনী ছন্দ' লেখেন, তাঁহার সমালোচনা দরকার নয় কি? সম্পাদক-সমালোচক এক জায়গায় লিখিয়াছেন, 'কি প্রবন্ধের দিক্ দিয়া, কি জাতীয়তার সম্মোহনময় ভাষার ঝঙ্কার দিয়া, কি অবয়ব অনুষ্ঠানের দিক দিয়া 'বৌদ্ধবাণী' হৃদয়-গ্রাহী পাঠক-পাঠিকার মনস্তুষ্টি, সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে।' আমরা 'জাতীয়তার সম্মোহনময় ভাষার ঝঙ্কার', 'অবয়ব অনুষ্ঠান', 'হৃদয়গ্রাহী পাঠক-পাঠিকা' এই কথাগুলি বুঝিতে পারিলাম না। দয়া করিয়া কেহ বুঝাইয়া দিবেন কি?

সর্ব্বশেষে 'মধুরেণ সমাপয়েত' 'সম্পাদকের আত্মনিবেদন।' সম্পাদক লিখিয়াছেন, 'স্বল্প সময়ের মধ্যে 'নওরোজ' যে মেঘ-বিচ্ছুরিত অরুণ রশ্মির মত প্রাণশক্তির স্ফুরণ-চ্ছটা বিচ্ছুরিত করিয়াছে, এ অযোগ্য সেবকের হস্তে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়, এই ভয়-ভীতিতে করুণ বেদনায় প্রাণমন ভরিয়া উঠিতেছে।' সত্যের অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য, এই সংখ্যা 'নওরোজ' দেখিয়া সম্পাদকের উপরোক্ত আশঙ্কা যে অমূলক নহে, আমাদেরও তাহা মনে হইয়াছে এবং ইহাতে আমাদের মনও 'করুণ বেদনায়' ভরিয়া উঠিয়াছে।''

৫ : ৯, ফাল্গুণ ১৩৩৪ সংখ্যায় ''সাময়িক সাহিত্যে'' সমালোচক (লেখকের নাম নেই) তিনটি পত্রিকা প্রসঙ্গে লিখেছেন :

''**উত্তরা**

'উত্তরা'য় প্রবাসী বাঙ্গালীদের সাহিত্য-চর্চার যে-নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। 'উত্তরা'র লেখকগণের সাহিত্য-চর্চা প্রবাস-বিনোদনের খোশ-খেয়াল নহে, পরন্তু সাহিত্যের খাঁটী স্বরূপ তাঁহাদের রচনায় ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাই দেখিতে পাইতেছি, সখ ও খোশ-খেয়াল-জাত অভিজাত সাহিত্যের সমর্থন ইহাতে নাই; পরন্তু জাতির বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-কামনা-সমন্বিত সাহিত্যের গভীর মূল মর্ম্মকথাটুকু ইহাতে প্রকাশিত রচনাদিতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। এ-কথার প্রমাণ 'উত্তরা'র গত আশ্বিন সংখ্যায় সাহিত্যের নব-কলেবর শীর্ষক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটী প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুত রাধাকমল মুখোপধ্যায় মহাশয়ের লেখা। রাধাকমলবাবু এই প্রবন্ধে আধুনিক সাহিত্যের উৎপত্তি ও গতি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। বিগত-প্রায় যুগের অভিজাত সাহিত্যের পরিচয় দিতে গিয়া রাধাকমলবাবু বলেন— 'আমাদের গল্প ও উপন্যাসের মানুষগুলা যেন আপনার আভিজাত্য-গৌরবে মশ্‌গুল, ঘটনাগুলো যেন শুধু এক প্রেমেরই বিচিত্র ফরমাসে গড়া, সমস্ত জিনিষটা যেন

বৈঠকখানায় গল্প-আমোদের মত কৃত্রিম ও পোষাকী। ইহাকে 'নব-নাগরিক সাহিত্য' নাম দিয়া আমি রুশ-সাহিত্যরথিগণের ব্যাপকতর আলেখ্য, প্রত্যক্ষ ঘটনাবস্তু ও করুণ সহানুভূতির কথা বলিয়াছিলাম এবং এই দিকেই যে আমাদের সাহিত্য একটা বিপুল প্রসার ও নবীন জীবনের পরিচয় পাইবে, তাহাও ইঙ্গিত করিয়াছিলাম।'

এর পর আধুনিক সাহিত্যের পরিচয় দিতে গিয়া রাধাকমলবাবু বলেন, 'যে ধনী ও মধ্যবিত্তশ্রেণী বাঙ্গলা সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অতি কঠোর হইতে চলিয়াছে। সুখের বিষয়, ধনীর হাতে আর সাহিত্যভাণ্ডারের চাবি-কাটি নাই।···সাহিত্য যখন রাজবেশ এবং উকিল-ব্যারিষ্টার-কেরানীর ধরাচূড়া ত্যাগ করিয়া একেবারে কাঙ্গাল সাজিয়া দিন-মজুরের সহিত রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন ঘটনা ও রসের বৈচিত্র্য ত হইবেই।···পূর্ব্বেকার সাহিত্যের ঘটনাবস্তু অধিকাংশই সাধারণ পারিবারিক ও সামাজিক জীবন হইতে সংগৃহীত। তাই ঘটনার সমাবেশে একটা বৈচিত্র্যহীনতা, এমন কি সৌসাদৃশ্য-দোষ অনেক সময়ে এড়াইতে পারা যায় না। একটা ব্যাপকতর জীবন হইতে ঘটনা-বস্তু আহরণ করাতে আধুনিক সাহিত্য খুব নূতন ও বিচিত্র হইয়া উঠিল। প্রেমের এখানে একঘেয়ে অবাধ প্রভুত্ব নাই।'

এর পর রাধাকমলবাবু আধুনিক সাহিত্য যে আর্ত্তনিপীড়িত জনগণমনের উত্থানমন্ত্র প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, এ-কথা বুঝাইয়া বলিয়াছেন—'রুশ-সাহিত্য এই নূতন জাগরণের সহায় হইয়াছিল। আমাদের নবীন সাহিত্যও নির্য্যাতিতের মুক্তির বাণী প্রচার করুক।'

প্রবন্ধের উপসংহারে রাধাকমলবাবু নবীন সাহিত্য-রচকদের মধ্যে কয়েকজনের নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং তাদের কৃতিত্বের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই নব-সাহিত্য-রচকদের মধ্যে পুরোহিত যিনি, রাধাকমলবাবু তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই। কেন করেন নাই, তাহা আমরা বিশেষ অনুধাবন করিয়াও বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের মতে নজরুল ইসলামই এই নব-সাহিত্যের অগ্রদূত।···

বঙ্গবাণী

'সাহিত্যধর্ম্ম' সম্বন্ধে বাঙ্গলা সাহিত্যে যে কথা কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে, তাই নিয়া নরেশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে পত্র-ব্যবহার চলিয়াছিল, তাহা গত পৌষ-সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত হইয়াছে। নরেশচন্দ্রের প্রতি লেখা রবীন্দ্রনাথের এক পত্রে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ নরেশচন্দ্রের চরিত্রে আক্রমণ করিয়াছেন। বুড়োবয়সে মানুষের বুদ্ধির গোলমাল হয়, এরূপ একটা কথা আছে। কিন্তু এই বুদ্ধিভ্রষ্টতা যে এক ভদ্রলোককে আর একজন ভদ্রলোকের চরিত্রের প্রতি কদর্য্য ইঙ্গিত করিয়া প্ররোচিত করিতে পারে, তাহা আমাদের জানা ছিল না। বিশেষতঃ 'তারুণ্যে'র দাবীদার রবীন্দ্রনাথ যে এইভাবে নিজেকে খেলো করিতে পারেন, তাহা বিশ্বাস করা খুবই মুশকিল। কিন্তু মুশকিল হলেও তাহাই হইয়াছে,—অন্ততঃ সেই চিঠিখানা দেখিয়া তাহা বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই। বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথের এই অধঃপতনে আমরা যার পরে নাই ব্যথা বোধ করিতেছি। সমগ্র বাঙ্গলা তাঁহাকে সাহিত্য-গুরুর আসনে বসাইয়া রাখিয়াছে। তাঁহার মত লোকের এরূপ সূক্ষ্মচর্ম্মী হওয়ার দৃশ্য বাঙ্গালীকে দেখিতে হইল, ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। বাঙ্গলাদেশ ইউরোপের ন্যায় তাঁহার সমগ্র স্বরূপ বুঝিয়া উঠিতে না পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বাঙ্গালীকে তাঁহার সূক্ষ্মচর্ম্মের স্বরূপ দেখাইবেন, ইহাও ত সে আশা করে নাই।

রবীন্দ্রনাথের অধঃপতনের এখানেই শেষ নহে,—দেখিতেছি, তাঁহার সাহিত্য-শিষ্য তরুণদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্যও তিনি কোমর বাঁধিয়া নামিয়া পড়িয়াছেন। নতুবা তিনি সাহিত্য-সম্রাটের সুউচ্চ সিংহাসন ছাড়িয়া 'শনিবারের চিঠি'র গালাগালির গালিচায় আসিয়া অধিষ্ঠান করিবেন কেন? শুধু তাই নহে, তিনি এই চিঠির ঝুড়ির আস্তাকুড়ের আবর্জ্জনাকে আর্ট বলিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন। অধঃপতন আর কাহাকে বলে? তরুণ-দলের শক্তিশালী লেখকদের কথা তার চোখে পড়ে না' বলিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, —কিন্তু মেছুহাটা-সুলভ এই সমস্ত গালির আবর্জ্জনাগুলি তাঁহার চোখ এড়ায় না, তা বেশ বুঝা যাইতেছে। কেন? এগুলিতে আর্ট আছে বলিয়া, না এতে তাঁর তোয়াজ আছে বলিয়া? ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমরা যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, এগুলিকে আর্ট বলিলে আর্ট কথাটার একেবারে জাতমারা হয়। এগুলি ত আর্ট নয়ই,—এগুলি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, ঈর্ষা, বিটকেলেমীর বস্তাপচা আবর্জ্জনা। রবীন্দ্রনাথ কিসে এর আর্টের গুণে মুগ্ধ হইয়া গেলেন? একি অন্ধভক্তের তোয়াজের মিষ্টতা, না তাঁর বিরুদ্ধ-বাদীদের প্রতি উদ্দিষ্ট গালাগালির বহর?

প্রবাসী

'বৃহত্তর ভারত' আবিষ্কারের অন্যতম পাণ্ডা অধ্যাপক শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'যবদ্বীপের পথে' শীর্ষক প্রবন্ধে যাভা-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ইহাতে যতটুকুই থাকুক এবং তাহা যতই চিত্তাকর্ষক হউক বলিবার মুরুব্বিয়ানা ভঙ্গিটুকু চমৎকার চিত্তাকর্ষক হইতেছে। সিঙ্গাপুর প্রবাসী মোহাম্মদ আলী নামাজী নামক জনৈক ইরাণী মুসলমানের আলোচনা-প্রসঙ্গে অধ্যাপক মহাশয় 'প্রবাসী'র পৌষ সংখ্যায় বলিতেছেন 'নামাজীর মধ্যে একটুও গোঁড়ামী ছিল না। সত্য কথা বলতে, হাজার শিক্ষিত হলেও সাধারণতঃ ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ে তর্ক করতে সাহস হয় না; কারণ কোথায় কার মনের কোন্ গোপন কোণে অন্ধ ধর্ম্মবিশ্বাস পোষিত হয়ে আছে, আমাদের সোজাসোজি প্রশ্নে কোথায় কার স্পর্শকাতরতায় আঘাত করবে, এত সব এড়িয়ে খোলাখুলি বিচার সম্ভব না। ...কিন্তু এই ইরাণীদের সঙ্গে আলাপ—সে যেন এক নূতন বিচার-বুদ্ধির আলোকে উদ্ভাসিত জগত—সেখানে ভারতের নব্য ইসলামী গোঁড়ামীর অন্ধকারের লেশমাত্র নাই।...

এ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুত তারকানাথ দাসের 'ভবঘুরের চিঠি' শীর্ষক প্রবন্ধের এক স্থানে আছে—'ভারতের মুসলমান নেতারা সৈয়দ আহমদের সময় হইতে আবদুর রহমানের সময় পর্য্যন্ত হিন্দুদের বিরুদ্ধে গিয়াছেন এবং তাহারা ভারতের কল্যাণটা প্রধান মনে করেন না। মুসলমান জগতের কল্যাণই তাহাদের উদ্দেশ্য। কাজেই একদল মুসলমান নেতা ইংরাজের কাজ করিতেছে, অপর একদল যথা মহম্মদ আলী ইত্যাদি হিন্দুদের সঙ্গে ও কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিবার ভান করিয়া হিন্দুদের নিকট হইতে মুসলমানদের জন্য অধিক স্বত্বের লাভের সম্মতি লইতে যত্ন করিতেছে। এবং অপর দল ভারতীয় মুসলমানদের দলবদ্ধ করিয়া গুণ্ডাদের দিয়া হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিয়া ও ভয় দেখাইয়া নূতন দাবী চাহিতেছে। তলে তলে এই তিন সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা যথা আগা খাঁর দল, মহম্মদ আলীর দল ও আবদুর রহমানের দল মিলিয়া কাজ করে।... সাম্প্রদায়িক ও স্বার্থসিদ্ধিপরায়ণ মুসলমানদের পায়ে তেল দিয়া স্বরাজপন্থীরা দেশের জাতীয়তার কাজের ক্ষতি করিতেছেন। যাহারা হিন্দু দেশকে পৃথক করিয়া দিয়া বঙ্গে বিভাগে মত দেন, তাহারা দেশের শত্রু বলিলে অত্যুক্তি হয় না।...যাহারা সমস্ত ভারতের উন্নতির সূত্রে নিজেদের ছোটগণ্ডীর মধ্যে ভেদবাদ প্রচার করেন তাহাদের মুখে স্বদেশ-ভক্তির ও হিন্দু-মুসলমান মিলনের কথা শুনিলে হাসি পায়।''

৫ : ১১, বৈশাখ ১৩৩৫ সংখ্যার 'সাময়িক সাহিত্যে' আলোচিত পত্রিকাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রবাসী ও কল্লোলের প্রসঙ্গ ; সমালোচকের নাম নেই।

"প্রবাসী

'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দবাবু বিগত 'সুরমা-সাহিত্য-সম্মিলনে' সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সেই সম্মিলনে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসকে বাজেয়াফ্‌ত্‌করণ উপলক্ষে গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের নিন্দা করিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। বিষয়-নির্ব্বাচনসমিতিতে এই প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয়। পরে কয়েকজন প্রতিনিধি সম্মিলনের প্রকাশ্য সভায় উহা উপস্থিত করিবার জন্য একটী আবেদন করেন। কিন্তু সভাপতি রামানন্দবাবু উক্ত প্রস্তাবকে রাজনৈতিক প্রস্তাবের পর্য্যায়ে ফেলিয়া তাঁহাদের আবেদন অগ্রাহ্য করেন। রামানন্দবাবু এই সম্পর্কে আরো বলেন যে 'পাথের দাবী' তিনি পড়েন নাই ; সুতরাং তিনি তার সম্বন্ধে মতামত কিছুই প্রকাশ করিতে পারেন না। রামানন্দবাবু 'পথের দাবী'—সম্পর্কিত উক্ত আচরণকে উপলক্ষ করিয়া কয়েকটী দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত হয়। তার কৈফিয়ৎ স্বরূপ রামানন্দবাবু চৈত্রের 'প্রবাসী'র 'বিবিধ-প্রসঙ্গে' বলিতেছেন, 'সম্মিলনটী সাহিত্যিক, রাজনৈতিক নহে। নানা রাজনৈতিক মতের লোক ইহার সভ্য ; সরকারী কর্ম্মচারীরাও ইহার সভ্য। রাজনৈতিক বিষয় সাহিত্যিক সম্মিলনে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। আলোচ্য সাহিত্যিক বিষয়ের অভাব নাই, বরং খুব প্রাচুর্য্যই আছে। সাহিত্যিক সম্মিলনে রাজনীতি ঢুকাইলে তাহা হইতে সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে পরোক্ষ ভাবে কার্য্যতঃ তাড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহাতে লাভ নাই, ক্ষতি আছে। সাহিত্যের ভিতর সাহিত্যকে উপলক্ষ করিয়া গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরাও যদি রাজনৈতিক কর্ম্মীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া দেশের এক রকম সেবা করিবার সুযোগ পান, তাহাতে উপকার বই অপকার নাই।'

সম্মিলনটী যে সাহিত্যিক—রাজনৈতিক নহে, তাহা স্বীকার্য্য ; কিন্তু 'পথের দাবী' বইখানা ত নিছক রাজনীতি নহে। উহা সাহিত্য হিসাবেই বিদ্বজ্জন সমাজে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং এ-সম্বন্ধীয় প্রস্তাব নিছক রাজনীতির আলোচনা বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে না। বিশেষতঃ ভারতের মত পরাধীন দেশের সাহিত্য রাজনীতির নাগ-পাশে বাঁধা। সাহিত্যকে রাজনীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিবার উপায় এখানে নাই। ইংলণ্ডের মত স্বাধীন দেশে 'পথের দাবী'র মত সাহিত্য-পুস্তককে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াফ্‌ত্‌ করার কথা কেহ চিন্তা করিতে পারেন না, কিন্তু এদেশে তাহা হইবার উপায় নাই। নিছক সাহিত্যের উপরও এদেশের সরকারী রাজনীতি হস্তার্পণ করিবার অধিকার রাখে। সুতরাং এদেশের সাহিত্যের পক্ষে অল্পবিস্তর রাজনীতির সম্পর্কে না আসিয়া উপায় নাই। সুতরাং সাহিত্য-সম্পর্কিত রাজনৈতিক অনধিকারচর্চা সম্বন্ধে সাহিত্যিক সম্মিলনে আলোচনা করিবার প্রয়োজন আছে বই কি?•••

রামানন্দ বাবু 'পথের দাবী' পড়েন নাই বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁর 'পথের দাবী' পড়া না-পড়ার উপর সম্মিলনের কোন বিষয় নির্ভর করিতেছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। সুতরাং সাহিত্য-সম্মিলনের মত অনুষ্ঠানে তাঁর এই না-পড়ার কথা জাহির করার হেতু কি, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার পড়া না-পড়ার অজ্ঞতার দ্বারা সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। সুতরাং তাঁর পড়া না-পড়ার অজ্ঞতার কথা সম্মিলনে জাহির করিবার কোন দরকারই ছিল না। বাঙ্গালী কোন সাহিত্যিকের পক্ষে—বিশেষতঃ কোন সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির পক্ষে—শরৎবাবুর ন্যায় সুবিখ্যাত বাঙ্গালী সাহিত্যিকের কোন সুবিখ্যাত গ্রন্থ পাঠ না করার অজ্ঞতা নিশ্চয়ই সাহিত্য-সম্মিল-

নের মত স্থানে জাহির করিবার বিষয় নহে। সেক্‌স্‌পীয়ারের কোন গ্রন্থ পাঠ না করার অজ্ঞতা লইয়া নিশ্চয়ই কোন ইংরেজ সাহিত্যিক গর্ব অনুভব করিতে পারে না এবং তাহা কোন সাহিত্য-সম্মিলনে জাহির করিতে পারে না। অবশ্য সকল সাহিত্যিকের পক্ষে সকলের গ্রন্থ পাঠ করিবার সুযোগ-সুবিধা না ঘটিতে পারে; কিন্তু এই অজ্ঞতা সাহিত্য-সম্মিলনের মত স্থানে অযাচিতভাবে জাহির করিবার বিষয় নহে। সুতরাং রামানন্দবাবু 'পথের দাবী' পড়া না-পড়ার উপর যখন সম্মিলনের কার্য্য নির্ভর করিতেছে না, তখন তাঁহার ঐরূপ উক্তিকে কেহ অযাচিত ও ঔদ্ধত্যসূচক বলিয়া ধরিয়া লইলে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। বিশেষতঃ ইতিপূর্ব্বেও তিনি ইহার এক নজীর রাখিয়া গিয়াছেন। নাট্যরথী গিরীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর, তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া রামানন্দবাবু 'প্রবাসীতে' লিখিয়াছিলেন যে, গিরীশচন্দ্র নামক অভিনেতাটীর কোন নাটক তিনি পড়িয়া দেখেন নাই,—যদিও এই না-পড়ার অজ্ঞতা জানাইবার কারণ কিছুমাত্র ছিল না। এ অজ্ঞতার গর্ব্ব বোধ হয় কেবল এই বাঙ্গলা দেশেই সম্ভব।

কল্লোল

চৈত্রের 'কল্লোলে' শ্রীযুত বুদ্ধদেব বসুর 'অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্য' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ ঢাকার 'প্রগতি' হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রবন্ধটী অতি সুন্দর এবং বাঙ্গলার তরুণ সাহিত্যিকদের ইহা পড়া উচিত। তরুণদের রচিত বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে aristocratic-ভাবাপন্ন সাহিত্যিকের দল যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপন করেন, লেখক এই প্রবন্ধে তাহা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং আমাদের মনে হয় লেখকের সে চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের সহিত পূর্ব্বতন বঙ্গসাহিত্যের প্রভেদ কোথায়। প্রেম সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদের তুলনায় আধুনিক লেখকদের ধারণার বিশিষ্টতা কি, মানবজীবন-সমস্যার ক্রমঃবর্দ্ধমান জটিলতা ও বিচিত্রতা কি-ভাবে বর্ত্তমান সাহিত্যের রূপ বদলাইয়া দিতেছে, এসব কথা লেখক খুব সুন্দরভাবে বলিতে পারিয়াছেন। তিনি তাঁহার বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করিবার জন্য আধুনিক সাহিত্যের কোন কোন তরুণ লেখকের রচনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে বক্তব্য বিষয় অত্যন্ত সুবোধ্য ও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। লেখক উপসংহারে বলেন, 'আধুনিকের সঙ্গে পূর্ব্বতন সাহিত্যের যে মূল-গত পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তার জন্য বর্ত্তমান জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থাই সম্পূর্ণ দায়ী। এ হচ্ছে time-spirit বা যুগধর্ম্মের ফল। নইলে আধুনিকরা কেবল নূতন একটা-কিছু করবেন বলেই এই সমস্ত Uncoventional জিনিষের অবতারণা করেন নি। মর্ম্মে মর্ম্মে জীবনের প্রতি পলে তাঁরা যা অনুভব করেছেন, তাঁদের সাহিত্যেও তা-ই প্রকাশ পেয়েছে। এজন্য তাঁদের দায়ী করা সম্পূর্ণ অযুক্তিসঙ্গত। তবে একথা উঠ্‌তে পারে বটে যে, বাঙ্গালী সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা তো আর চিরকাল থাকবে না,—শতাব্দী বা অর্দ্ধ-শতাব্দী অন্তে এ-সাহিত্যের কোন মূল্য না-ও থাক্‌তে পারে। বর্ত্তমান সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত নবীন লেখকদের কথা বাদই দিলাম—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ইত্যাদি বাণীর পুরোহিতদের রচনাও কতটুকু ও কতক্ষণ বেঁচে থাক্‌বে; সে-বিষয়ে সন্দিহান হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। কাজেই সে আলোচনা বর্ত্তমান সময়ে করলে বৃথা শ্রমক্ষয় হবে মাত্র। সে বিচারের ভার অনাগত কালের হাতে তুলে দিয়ে আমরা আপাততঃ নিশ্চিত হ'তে পারি। তবে এইটুকু প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে সাহিত্য যে, বাঁচে, তা সম্পূর্ণ তার কতকগুলো artistic গুণে। পৃথিবীর সব লেখকের রচনাতেই তাঁর নিজের দেশের সমসাময়িক অবস্থাগুলি ফুটে উঠেছে; কিন্তু লেখার সৌন্দর্য্যের মহিমায় কোন কোন রচনা তৎসত্ত্বেও বেঁচে থাকে। সেই জন্য এটুকু অন্ততঃ স্বচ্ছন্দে বল্‌তে পারি যে, কোন রচনার atmospohere—তা সে যা-ই হোক না কেন—তার চির জীবন লাভের পক্ষে বাধা হয় না। বর্ত্তমান বাঙ্গলা লেখকদের রচনায় যদি কোন সর্ব্বকালের ও সর্ব্বদেশের

emotion প্রকাশ পেয়ে থাকে, তা'হলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশের বঙ্গদেশের atmosphere সত্ত্বেও একবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর মনে তা সহানুভূতি উদ্বোধিত করতে সমর্থ হবে।' লেখকের বক্তব্য যে যুক্তিযুক্ত, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমরা বাঙ্গালী তরুণ সাহিত্যসেবিগণকে এই সুন্দর রচনাটী পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।''

৫ : ১২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে **উত্তরা** — পত্রিকার আলোচনা। (লেখকের নাম নেই) :

''মোসলমান-সেবিত বাঙ্গলা সাহিত্যের কি আদর্শ ও আকার নেওয়া উচিত,—হিন্দুরা বাঙ্গলা সাহিত্যকে যে-রূপসজ্জায় সাজাইয়াছেন, তাহাই নির্ব্বিচারে বাঙ্গালী মোসলমানদের অনুকরণ করা উচিত, না তাদের পক্ষে ইহাতে একটা স্বতন্ত্র রূপ দেওয়া দরকার, ইহা লইয়া মোসলমান বাঙ্গলা সাহিত্যে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। বৈশাখ সংখ্যা 'উত্তরা'য় দেখিতেছি, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় নামক জনৈক হিন্দু সাহিত্যিকও এই আলোচনায় যোগদান করিয়াছেন। ইহা খুবই আনন্দের কথা, সন্দেহ নাই। কারণ বাঙ্গলা ভাষা হিন্দু-মোসলমান উভয়েরই মাতৃভাষা। সুতরাং উভয়ের চিন্তাধারার সঙ্গে উভয়েরই সম্যক পরিচয় থাকা অত্যাবশ্যক। কিন্তু এবিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে উভয়েরই পরস্পরের বক্তব্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।···'উত্তরা'র লেখকের মোসলমানদের বক্তব্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা আছে বলিয়া আমাদের মনে হইল না। অবশ্য সেজন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। কয়জন মোসলমানেরই-বা সে-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মিয়াছে ? মোসলমান সবেমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রে চিন্তা করিতে শিখিতেছে। অধিকাংশ মোসলমান সাহিত্যিকই এখনো গতানুগতিকতার মোহে মুগ্ধ। বাঙ্গলা সাহিত্যের হিন্দুয়ানী রূপই চিরদিন তাহাদের চোখে পড়িয়াছে। সে-সম্বন্ধে তাহাদের যে-ধারণা জন্মিয়াছে, তাহা ক্রমে সংস্কারে পরিণত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের সেই ধারণার বিপরীত কোন কথা শুনিলে তাহা তাদের সংস্কার বাঁধিবে বৈকি!

নবীন মোসলমানী চিন্তাধারার সম্বন্ধে সম্যক ধারণা না থাকার ফলে 'উত্তরা'র লেখক··· দুইজন মোসলমান লেখকের রচনা উদ্ধৃত করিয়া তিনি একজনকে বাহ্বা দিয়াছেন এবং আর একজনকে বিদ্রূপ করিয়াছেন,—যুক্তিতর্ক দ্বারা বুঝিবার ও বুঝাইবার কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। শুধু বাহ্বার সার্টিফিকেটই কোন কিছু সত্য হইয়া উঠে না, আবার শুধু বিদ্রূপের কষাঘাতেও কোন কিছু মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় না। সত্যনির্দ্ধারণের জন্য যুক্তিতর্ক দরকার। বাঙ্গলা ভাষায় 'দুর্ব্বোধ্য ও কঠিন অনাবশ্যক আরবী-ফারসী শব্দের প্রচলনের' বিরুদ্ধে যে মোসলমান লেখক মতপ্রকাশ করিয়াছেন, তাঁর কথা 'উত্তরা'র লেখকের খুব পসন্দ হইয়াছে, আর যিনি 'গায়ের ইস্‌লামী' ভাবাপন্ন হিন্দুসাহিত্য বর্জ্জন করিয়া মুসলমানী রূপবিশিষ্ট বাঙ্গলা সাহিত্য গড়িতে উপদেশ দিয়াছেন, তার কথা লেখক হজম করিয়া উঠিতে পারেন নাই ; তাই তাঁহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াই লেখক নিজের কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন।''···

৬ : ৫, অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ সংখ্যার 'পুস্তক ও পত্র পরিচয়' বিভাগে মুদ্রিত হয়েছে 'শিখা' ও 'তরুণ' পত্রিকার আলোচনা। সমালোচকের নাম নেই।

''**শিখা** [দ্বিতীয় বর্ষ]

সম্পাদক, অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, এম, এ,—মূল্য ‖০ আনা, প্রকাশক সৈয়দ ইমামুল হোসেন, ম্যানেজার—মডার্ণ লাইব্রেরী, ৭৪ নং নবাবপুর, ঢাকা।

বর্ত্তমান মুসলিম বাঙ্গলার সাহিত্য প্রচেষ্টার ইতিহাসে ঢাকার মুসলিম সাহিত্য-সমাজের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই সাহিত্য-সমাজকে কেন্দ্র করিয়া যে মুসলিম

সাহিত্যিকদল গড়িয়া উঠিতেছে, তাঁহাদের প্রত্যেকের মনে সাহিত্যের প্রতি সত্যিকার দরদ ও প্রেরণা আছে। ইঁহাদের প্রত্যেক লেখকের প্রত্যেক লেখা বা মতের সঙ্গে আমরা একমত না হইতে পারি—কিন্তু ইঁহাদের সাহিত্য প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করিবার মত অন্ধ গোঁড়ামী যেন আমাদের না হয়। প্রথম বারের শিখার সঙ্গে মুসলমান সমাজের অনেকেই একমত হইতে পারেন নাই—কিন্তু এবারকার শিখা প্রত্যেক জ্ঞানী ও রসগ্রাহী মুসলমানের প্রিয় বস্তু হইবে, সন্দেহ নাই। এবার সাহিত্য সমাজের ভক্ত লেখকবৃন্দ প্রাচীন মুসলিমের জ্ঞান, শিল্প ও স্থপতি সাধনার ইতিহাসকে যেরূপ সুন্দরভাবে জাতির সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। প্রতিভার চঞ্চল দুলাল কাজী নজরুল ইসলামের প্রাণমাতানো 'নূতনের গান' সাহিত্য-সমাজের গত বার্ষিক অধিবেশনের সভা-পতি খান সাহেব আবদুর রহমান এম-এ, বি, টি সাহেবের মূল্যবান অভিভাষণ, কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের 'বাঙলার জাগরণ', খান বাহাদুর মৌলবী কমরুদ্দীন সাহেবের 'সমবায় আন্দোলনে মুসলমানের কর্ত্তব্য', মৌলবী আবদুস সালাম এম, এ-র 'মোগলযুগে চিত্র-চর্চ্চা', অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন এম, এ-র 'মানবমনের ক্রমবিকাশ', মিস ফজিলতুননেসা এম, এ সাহেবার 'নারী জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ', 'স্থাপত্য চর্চ্চা'; মুসলমান' 'বাংলার লুপ্ত শিল্প', 'বাংলায় পীর পূজা'; 'মুসলিম ভারতে শিক্ষা চর্চ্চা', 'বৈদেশিক বাণিজ্য ও বাংলার মুসলমান' ইত্যাদি প্রত্যেকটি লেখা পড়িবার, ভাবিবার ও চিন্তা করিবার মত জিনিষ।

মোয়াজ্জিন [ত্রৈমাসিক]

ফরিদপুর খাদেমুল এনসান সমিতির মুখপত্র। সম্পাদক, সৈয়দ আবদুর রব, বার্ষিক এক টাকা।

ফরিদপুর হইতে পরিচালিত এই পত্রিকাখানির শ্রাবণ সংখ্যা, দেখিয়া আমরা খুবই আনন্দিত হইয়াছি। এই সংখ্যায় অনেক খ্যাতনামা মুসলমান লেখকই লিখিয়াছেন। কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কবি জসীম উদ্দীন, কবি সৈয়দ উদ্দীন, কবি আবদুল কাদের, চিত্তরঞ্জন আচার্য্য প্রভৃতির কবিতা, গল্পলেখক আকবরউদ্দীন সাহেবের গল্প, খ্যাতনামা প্রবীণ সাহিত্যিক রায়বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহ, মৌলবী আবদুর রশিদ বি, এ, বি, টি সাহেবের প্রবন্ধ—এই সংখ্যা মোয়াজ্জিনের অঙ্গ সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। আজ মিনারে মিনারে মোয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বর তন্দ্রালস ও নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে—আশা-করি ইসলামের এই নব মোয়াজ্জিনদের কণ্ঠে আবার জীবন্ত প্রাণবান আজান ধ্বনিয়া উঠিবে।

তরুণ [দ্বৈমাসিক]

সম্পাদক এম, মেসের আলী, তরুণ কার্য্যালয়, পোঃ গোকুল, বগুড়া। বার্ষিক দেড় টাকা।

দিকে দিকে আজ তরুণের জয়যাত্রা শুরু হইয়াছে – মোসলেম তরুণও এই জয়যাত্রার শামিল না হইয়া থাকিতে পারে না। বগুড়ার কয়েকটী তরুণ আজ নিজের চিন্তা ও সাধনা লইয়া জাতির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আমরা তাঁহাদের এই প্রচেষ্টাকে আন্ত-' রিক অভিনন্দন জানাইতেছি—তাঁহাদের 'তরুণ' দীর্ঘায়ু হইয়া জাতির তরুণকে 'সত্য', 'জ্ঞান' ও 'মুক্তি' সাধনায় উদ্বুদ্ধ করুক ইহার চেয়ে প্রার্থনা আমাদের অন্তরে আর নাই।''

১৯ : ২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে নব পর্য্যায়ে প্রকাশিত বুলবুল পত্রিকার আলোচনা :

"**বুলবুল**—সচিত্র মাসিক পত্রিকা, মুহম্মদ হবিবুল্লাহ্ ও বেগম শামসুন নাহার সম্পাদিত (কলিকাতা)।

ইতিপূর্ব্বে 'বুলবুল' ত্রৈমাসিক আকারে প্রকাশিত হইত। কিছুদিন বন্ধ থাকিবার পর বর্ত্তমান বর্ষে 'বুলবুল' পুনরায় মাসিক পত্রিকার আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বৎসরের প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ মাসের 'বুলবুল' আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই সংখ্যায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাহিত্যসেবিগণই লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন, এবং কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের রচনা ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে। আলোচ্য সংখ্যায় দুইটী গল্প, একখানা ইংরেজী উপন্যাসের তর্জ্জমা (ধারাবাহিক), সাতটী কবিতা, আটটী প্রবন্ধ এবং কলস্রোতা শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। 'কলস্রোতা'—শীর্ষ-নামটী অধুনালুপ্ত 'ছায়াবীথি'র কথা বিশেষরূপে স্মরণপথে উদিত করে। এই শীর্ষ-নামটী উক্ত পত্রিকাতেও ব্যবহৃত হইতে আমরা দেখিয়াছি। ভালজিনিষের অনুকরণ অবশ্যই দোষের নহে।

মুসলিম বঙ্গে সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা খুব বেশী নয়; প্রয়োজনের তুলনায় সরবরাহ সম্যক হইতে এখনও বহু বিলম্ব রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় 'বুলবুলের' নূতন মাসিক সংস্করণ আমাদের প্রাণে নূতন আশারই আলোকপাত করিয়াছে। পত্রিকার ছাপা, কাগজ ও প্রচ্ছদপট রুচিসম্মত; তবে মূল্য গরীব দেশ বিশেষতঃ মুসলিম সম্প্রদায়ের তুলনায় কিছু অতিরিক্ত বলিয়াই মনে হইতেছে। আমরা আশা করি পত্রিকাখানি দীর্ঘায়ু ও বহুল প্রচার লাভ করিয়া সাহিত্যের একটী স্থায়ী সম্পদেই পরিণত হইবে।"

পত্রিকা প্রসঙ্গে সর্বশেষ ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি সৈয়দ আলী আহ্সানের লেখা। প্রবন্ধের নাম '**কালিকলমের** প্রথম বর্ষ'। পত্রিকাটি লুপ্ত হলে এটি প্রকাশিত হয়। ফলে এখানে যে মূল্যায়ন আছে তা-ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধে সৈয়দ আলী আহ্সান লেখেন: "অতীতের রোমন্থন ক্রিয়াশীল মনের কৃত্য নয়, কিন্তু নিত্যই কর্ম্ম প্রবাহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত থাকা প্রাণধর্ম্ম-বিগর্হিত। অবসর ব'লে একটা বস্তু আছে, তা'কেও মর্য্যাদা দিতে হয়। সেই অবসর-মুহূর্ত্তে অতীতের চর্চ্চা একপ্রকার বিনোদনই বটে। **অন্ততঃপক্ষে** বর্ত্তমানের যথার্থ স্বরূপ নিরূপণের জন্য অতীতের সাক্ষ্যের প্রয়োজন আছে।

'কালিকলম' **পুরানো মাসিক**, অধুনালুপ্ত। যাঁরা ওতে লিখ্তেন তাঁদের অনেকেই আজ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, আবার অনেকের কথা বর্ত্তমানে একেবারেই শোনা যাচ্ছে না। অনেকেরই তখন বিকাশ-মুহূর্ত্ত, অনেকের আবার প্রতিভার পূর্ণদীপ্তি।

তখন ছিলো ১৩৩৩ সাল, আর বর্ত্তমানে হ'ল ১৩৪৯ সাল, অর্থাৎ সেদিনের সাথে এদিনের মোট ষোল বছরের ব্যবধান। একজন মানুষের জীবনে ষোল বছর অল্প সময় নয়, এবং জাতির জীবনেও এ-ব্যবধানকে তুচ্ছ ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কেননা সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যেও তো বিপুল পরিবর্ত্তন সম্ভব।

আধুনিক কবিতার পূর্ণ প্রাদুর্ভাব তখন হয়নি, গদ্য কবিতার আরম্ভ হ'য়েছে কেবল। বর্ত্তমানে আধুনিক কাব্য-কলায় যাঁর অগাধ প্রতিপত্তি, সেই জীবনানন্দ দাশগুপ্ত তখন প্রাচীন রীতি অনুসরণ ক'রে সুবোধ্য কবিতা লিখ্তেন। ভাবের দিক দিয়ে তখন তিনি অনেকটা নজরুল-অনুগ ছিলেন। প্রমাণও আছে—

'গাহি মানবের জয়!
কোটি কোটি বুকে কোটি ভগবান আঁখি মেলে জেগে রয়।

সবার প্রাণের অশ্রু-বেদনা মোদের বক্ষে লাগে,
কোটি কোটি বুকে জ্বলে কোটি দীপ—কোটি কোটি শিখা জাগে।'
[১ম বর্ষ : কার্ত্তিক, ১৩৩৩]

সে-সময়ে তাঁর রচিত কবিতায় ভাষার মন্থরতা ছিলো, ভাবের মধ্যেও অনুভূতির দীপ্তি ছিলো কম। 'পতিতা' কবিতায় তিনি লিখেছেন—

'আগার তাহার বিভীষিকা-ভরা, জীবন মরণময়!
সমাজের বুকে অভিশাপ সে যে, সে যে ব্যাধি, সে যে ক্ষয়।'

এ-ভাববিলাসিতায় প্রাণ-প্রাচুর্য্য নেই।

আরও ছ'টা কবিতা তাঁর আছে এই প্রথম বছরের 'কালিকলমে'—কবিত্বপূর্ণ নয় খুব, সাধারণ গোছের।

প্রেমেন্দ্র মিত্র অজস্র কবিতা-গল্প লিখেছেন ; একটা উপন্যাসের প্রারম্ভিক কতগুলো অধ্যায়ও আছে। কবিতাগুলির অধিকাংশ 'প্রথমা' কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। শুধু মাত্র প্রকাশরূপে নয়, ভাবের দিক দিয়েও কবিতাগুলো নূতন। আধুনিক কবিতার বাস্তব চেতনার সুরের প্রথম উদ্‌গাতা তিনিই। তাঁর কবিতায় আকুতির প্রশ্রয় আছে কিন্তু প্রত্যয়ের পরিচয় নেই। অনেক কিছু হবার আকাঙ্ক্ষা তিনি প্রকাশ ক'রেছেন, কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষার অতিরিক্ত কিছু তাঁর কাব্যে নেই। অবশ্য 'সম্রাট' গ্রন্থ এর ব্যতিক্রম, কিন্তু ওটা পরবর্ত্তী রচনা। 'কালিকলমের' যুগে ও-গ্রন্থের উন্মেষের সম্ভাবনাই ছিলো না। যে প্রার্থনা তখন কণ্ঠ-নিঃসৃত হ'ত, তা'তেও জীবনবাদের পূর্ণ-পরিচয় ছিলো—

'ফের যদি ফিরে আসি
আরো আলো চক্ষে যেন আসি নিয়ে
বুকে আরো প্রেম যেন আনি
পৃথিবীকে আরো যেন ভালো লাগে ;
এ পারের যত ভুল ভ্রান্তি
স্খলন পতন
ক্ষমায় ভুলিয়া আসি ;
আরো আনি পথের পাথেয়
আনন্দ অক্ষয়!' [১ম বর্ষ : আষাঢ়, ১৩৩৩]

জীবনের যে-পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তা' বেদনাময় হলেও পরম সত্য—

'পথ দিয়ে আসতে আসতে দেখি নিষ্কলঙ্ক শিশুর দল
ক'টা ইঁদুরছানা ধরে
তাদের বলি দিয়ে উল্লাস করছে—কি সরল পৈশাচিকতা!
সৃষ্টির মূলেই যে নির্ব্বিকার নির্ম্মমতা!
দেখি মৃত্যুর শিয়রে নেওয়া চির-বিলাপের শপথ
শাপ হ'য়ে ওঠে,
শুনি বৃদ্ধ তার যৌবনের প্রেম নিয়ে পরিহাস ক'রছে!
জীবনকে ঘিরে আছে একটি বিপুল প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ!'
[১ম বর্ষ : ভাদ্র, ১৩৩৩]

হোক্ না রুক্ষ, হোক্ না ধূসর তবু এ-পৃথিবীকে তিনি ত্যাগ ক'রতে চান না মুহূর্ত্তের জন্যও। পরিপূর্ণ ভয়াবহতা নিয়েও এ-পৃথিবী অপরূপ সুন্দর কবির চক্ষে—

'ভালবাসি ভালবাসি—
এ সুন্দরী পৃথিবীরে আমি ভালবাসি
সর্ব্ব দেহ মন প্রাণ দিয়ে——
তাই তার তুচ্ছতম জীর্ণ পাতাটিরে
ছেড়ে নাহি যেতে সরে মন:
বুক দিয়া আঁকড়িয়া থাকি;
নিশিদিন তার প্রতি অকিঞ্চিৎ বাণী
লিখে রাখি মর্ম্মের পাতায়।'

[১ম বর্ষ: আশ্বিন, ১৩৩৩]

রিক্ততার মধ্যেও, বিরহের মধ্যেও তিনি যে গানের অঞ্জলি সাজিয়েছেন তা'তেও নবজীবনের উন্মেষ ঘটেছে—

'কাঙাল কাশের গুচ্ছি লয়ে আর কাঠ-গোলাপের ফুলে,
গাঁথি গানখানি শিশিরে ভিজায়ে ঝরা শেফালির মূলে,
নূতন নীপের ব্যাকুলতা তাহে নূতন তৃণের ভাষা—
আর তাহে থাক্ নব গগনের নীল অনন্ত আশা!'

[১ম বর্ষ: আশ্বিন, ১৩৩৩]

এই গেল কবিতা সম্বন্ধে। যে সমস্ত গল্প তিনি লিখেছেন, তাতেও রয়েছে জীবনের রিক্ততার পরিচয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রায়-গল্পের শেষে একটু আশার পরিচয় দিতে তিনি ভোলেননি। ইংরাজীতে গ্রাম-কাহিনী বল্‌তে যা বুঝায় তাঁর গল্পগুলিও ঠিক তাই। সাধারণ জীবনের দুঃখ-দুর্দ্দশা ও সাধারণ আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিচয় বেশ ফুটেছে ওগুলিতে। 'পেনাঘাট পেরিয়ে', 'সায়েব-বিবি-গোলাম' এ-গল্প দুটি নিঃসন্দেহে মর্য্যাদাবান।

শৈলজানন্দের গল্পগুলিও একই পর্য্যায়ের। প্রায় সবগুলিই বস্তির কাহিনী। অস্বাভাবিকতা নেই কোথাও, যথার্থ্যের ইঙ্গিৎ ফুটেছে সর্ব্বত্র। গদ্যে হাফেজের কতকগুলি কবিতার অনুবাদ তিনি ক'রেছেন, অবশ্য তা' ভালো হয়নি খুব। 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস' নামে যে বৃহৎ গল্পটি আছে, বাংলার পল্লীর বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিচয় তা'তে পাই। প্রখর অনুভূতি নিয়ে কাহিনীগুলি রচনা করা হ'য়েছে চরিত্রস্জনেও লেখক যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তা' অনন্যসাধারণ।

প্রবোধকুমার সান্ন্যালের ছ'টা গল্প আছে। তিনি মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণেই মনোনিবেশ ক'রেছেন বিশেষভাবে। এ মনস্তত্ত্ব গ'ড়ে উঠেছে নারীমনকে কেন্দ্র ক'রে। তা'দের যৌনলিপ্সাই অধিকাংশ গল্পের প্রতিপাদ্য বস্তু। 'খাঁচার জীবন একটানা', 'মাটির ঢেলা', 'একটি কাহিনী', 'রূপান্তর'—মূলতঃ সবগুলিই একই মনোভাবের বাহক।

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে 'কানের ফুল' গল্পটিই ভালো। অমিয়া চৌধুরীর 'স্থানচ্যুত' গল্পটিতে শরৎচন্দ্রের 'দর্প-চূর্ণ' গল্পের ছাপ আছে।

জগদীশ গুপ্ত তখন যে-ধরনের গল্প লিখ্‌তেন, এখন যে তা'র চাইতে ভালো কিছু লিখ্‌ছেন তা' নয়; তবে তাঁর গল্পে একটা সরল স্বাভাবিকতা আছে যা আমাদের মুগ্ধ করে।

প্রভাতকুমারের মত শুধু গল্প বলার খাতিরেই তিনি গল্প ব'লেছেন, নেপথ্যে কোন ইঙ্গিৎ রেখে দেন্‌নি।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসিদ্ধ গল্প 'কবুলতি' প্রথম বছরের 'কালিকলমে'ই বেরিয়েছিলো। আরও অনেকের গল্প আছে, তবে সেগুলো নামে মাত্রই গল্প। কোনো বিশিষ্টতা তাঁ'দের নেই।

সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা খুবই কম। যা' আছে, তা'ও 'কালিকলমে'র নিজস্ব নয়, বিভিন্নস্থান থেকে চয়ন করা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আর্টের সহজপথ' 'উত্তরা' থেকে নেওয়া, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের 'নোণ্ডচি' 'কল্লোল' থেকে, ও অতুল প্রসাদের সব লেখা-গুলিই 'উত্তরা' থেকে। তবে এ-চয়নের মধ্যে বিশিষ্টতা আছে।

মহেন্দ্রচন্দ্র রায় নামে এক ভদ্রলোক সামাজিক সমস্যা নিয়ে 'কালিকলমে'র প্রতি সংখ্যায়ই একটি ক'রে প্রবন্ধ লিখেছেন। কিছু নাম উল্লেখ ক'র্‌লেই প্রবন্ধগুলির স্বরূপ বোঝা যাবে—'হিন্দু-মুসলমান', 'স্বামী-স্ত্রী', 'নরনারী', এই সব।

সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সাহিত্য' প্রবন্ধে সাহিত্যের রসরূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আরও দু-একজনের ভালো প্রবন্ধ আছে। মণীন্দ্রলাল বসুর 'আর্ট কি ?' প্রবন্ধটি ক্রোচের ভাব নিয়ে লেখা।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি বিভিন্ন মাসিক সাপ্তাহিক থেকে চয়ন করা হ'য়েছে। অবশ্য দুএকটা লেখার প্রথম-প্রকাশ 'কালিকলমে'ই।

এখন বাংলা সাহিত্যের দুজন প্রসিদ্ধ কবির কথা ব'ল্‌বো যাঁদের লেখা 'কালিকলমে' নিয়মিত বেরুতো। নজরুল-প্রতিভার পূর্ণবিকাশের সময় তখন, মোহিতলালও কাব্যক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। নজরুল সম্বন্ধে 'কালিকলমে'র এক সংখ্যায় সম্পাদকীয়ও লেখা হ'য়েছে। নজরুলের প্রসিদ্ধ কবিতা 'সিন্ধু' 'কালিকলমে'ই বেরিয়েছিলো।

মোহিতলালের প্রায় কবিতাগুলিই অনুবাদ। ও'দের মধ্যকার 'নাগার্জ্জুন' ও 'সৃষ্টির আদিতে' কবিতাদুটি কবির শেষ কাব্য গ্রন্থ 'হেমন্ত গোধূলিতে', স্থান পেয়েছে। 'প্রেম ও ফুল' নামক কাহিনী-কবিতা স্থান পেয়েছে 'স্মর-গরল' গ্রন্থে। অনুবাদ কবিতাগুলিতে মোহিতলাল অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। মূলের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রেও এরা স্বতন্ত্র মৌলিক সৃষ্টির মর্য্যাদা পেতে পারে।

এইতো গেল লেখকদের কথা, এখন পত্রিকার অবয়ব সম্বন্ধে কিছু বলি। আকারে 'কালিকলম' প্রবাসীর চেয়ে ছোট ছিলো। মাথায় ছিলো ইঞ্চিখানেক খাটো, আর পাশে আধ ইঞ্চি। পৃষ্ঠাও ছিলো 'প্রবাসী'র চেয়ে কম—প্রায় অর্দ্ধেক—দামওছিলো মাত্র চার আনা।

সম্পাদক ছিলেন তিনজন—মুরলীধর বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। কর্ম্মসচিব ছিলেন শিশিরকুমার নিয়োগী। বরদা এজেন্সী থেকে পত্রিকা প্রকাশিত হ'ত। প্রত্যেক সংখ্যায়ই বিদেশী লেখকদের রচনার অনুবাদ থাক্‌তো। 'চয়নিকা' অংশটি ছিলো চমৎকার। বেদনা পাই এ-কথা ভেবে যে এত চমৎকার সাহিত্য-পত্রিকাটিও শেষ পর্য্যন্ত টিকে রইলোনা।"

সমকালীন সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে সওগাতের গ্রন্থপরিচয় ও সাময়িক সাহিত্য বিভাগের রচনাসমূহ বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ, সন্দেহ নেই।

উপসংহার

মাসিক 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ ও আলোচনাসমূহের পরিচয় পূর্ববর্তী ছয়টি পরিচ্ছেদে উপস্থাপিত হল। এই পরিচয় সমকালের (১৯১৮-১৯৪৮) বাঙালীর সাহিত্যচিন্তার বৈশিষ্ট্য-চিহ্নিত, বিশেষভাবে তা বাঙালী মুসলমানের আধুনিক সাহিত্যে বিশ্বমনস্ক ও স্বদেশসচেতন পদচারণার প্রোজ্জ্বল স্বাক্ষরবহ।

তিরিশ ও চল্লিশ দশকে আধুনিক সাহিত্যচিন্তার নানা স্তর বাঙালীর রচনায় পরীক্ষিত ও পরিশীলিত হয়েছে। যেমন মৌলিক সৃষ্টিতে তেমনি আলোচনা-সমালোচনায় ঐ কালের বাঙালী মনীষা বিশ্বপ্রেক্ষাপটে অনলস অভিযাত্রী। সে অভিযাত্রায় বাঙালী মুসলমান এসেছে ধীর পায়ে, অনেক সংশয় পেরিয়ে। 'সওগাত' ছিল সেই আধুনিক অভিযাত্রীদের সিদ্ধান্তগ্রহণ, পরীক্ষা ও পরিশীলনের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র।

সওগাতের আলোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়ে তাঁরা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকলের ভাষা বাংলা। উভয়ের অবদানের পরিচয় ব্যতীত বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রদান অসম্ভব। নানা ঐতিহ্য থেকে বাংলা ভাষায় যে শব্দভাণ্ডার গড়ে উঠেছে তা ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জনসাপেক্ষ। কেবলমাত্র বাস্তবদৃষ্টিতে, মুক্তবুদ্ধির আলোকে ভাষা ও সাহিত্যের সমস্যা সমাধান সম্ভব।

তাঁরা বুঝেছিলেন, যেহেতু বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা অতি অবশ্যই বাংলা সেহেতু আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিজেদের অবদানে সমৃদ্ধ করা বাঙালী মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। মুসলিম ঐতিহ্যের চর্চা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে; এ ক্ষেত্রে গোড়ামী বা হীনমন্যতা উভয়ই বর্জনীয়।

তাঁরা জেনেছিলেন, আধুনিক বাঙালী সাহিত্যিককে একইসঙ্গে স্বদেশসচেতন ও বিশ্বমনস্ক হতে হবে। এক্ষেত্রে মুক্তজ্ঞান ও প্রয়োজনীয় সতর্কতার কথাও তাঁরা বলেছেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন, যা জীবনঘনিষ্ঠ ও বাস্তব তা সাহসের সঙ্গে উপস্থাপনই আধুনিক সাহিত্যিকের কর্তব্য।

ধনবণ্টনের সাম্য ও সাহিত্যে মার্ক্সবাদী চিন্তার প্রতিফলন প্রসঙ্গেও তাঁরা আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। এক্ষেত্রে, সন্দেহ নেই, অনেক অস্পষ্টতা আছে। তবু সওগাতের মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীনচিন্তার তা স্বাক্ষরবহ এবং সমকালের পরিবেশে ঐ সব আলোচনা বিশেষ তাৎপর্যবহ।

মনে রাখা প্রয়োজন, সওগাতের মুসলিম দৃষ্টিকোণ প্রধানতঃ উদার ও আধুনিক। সওগাতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যালোচনা ঐতিহ্যানুসন্ধানজাত এবং সে ঐতিহ্যে বিশেষভাবে মুসলমানের প্রসঙ্গ থাকলেও হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই উপস্থিত। একথা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নানা প্রাসঙ্গিক আলোচনা সম্পর্কেও প্রযোজ্য। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, কায়কোবাদ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্ম আলোচনায় সওগাতের প্রাবন্ধিকেরা বিষয়নির্বাচনে ও সিদ্ধান্ত প্রদানে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। আধুনিক সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা ও প্রসঙ্গ আলোচনাতেও তাঁরা পরিপ্রেক্ষিত-সচেতন। সওগাতেই, প্রকৃত অর্থে, আধুনিক সাহিত্য সমালোচক-রূপে বাঙালীমুসলমানের আবির্ভাব ঘটেছে।

বিশ্বসাহিত্য পর্যায়ে সওগাতের প্রাবন্ধিকেরা এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার নানা ভাষা ও ঐতিহ্যের সাহিত্যধারা ও বিশিষ্ট রচনাসমূহ বিবেচনা করেছেন। এ সব আলোচনা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি পরিচিতিমূলক প্রবন্ধসমূহও কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ।

ভাষাবিষয়ক আলোচনায় সওগাতের প্রাবন্ধিকেরা অনেকসময়ই এমন অগ্রসর ও আধুনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যা চমৎকৃত করে।

সওগাতে মুদ্রিত সাহিত্য-সম্মেলনের অভিভাষণসমূহ প্রধানতঃ বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যচর্চার সমস্যাকেন্দ্রিক হলেও এ সব আলোচনার সমকাল-সচেতনতা ও বাস্তব-দৃষ্টি এবং সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে তার তাৎপর্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সওগাতের গ্রন্থ সমালোচনাসমূহে সমকালীন সাহিত্য সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। এ বিভাগে যেমন আছে অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তেমনি আছে, বিস্তৃত বিশ্লেষণ। নানা মাত্রা সত্ত্বেও সওগাতের অভিমত ও উল্লেখ সে-কালের সাহিত্য-ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিবেচনাযোগ্য।

সওগাতের সম্পাদকীয় ও সাময়িকী বিভাগে প্রকাশিত সাহিত্যবিষয়ক মন্তব্য-সমূহ বিশেষ গুরুত্ববহ। সম্পাদক ও তাঁর সুযোগ্য সহযোগীদের সমবায়ী প্রচেষ্টায় কালের চৈতন্যস্পর্শী এসব মন্তব্যে ছিল ভবিষ্যতের দিক-নির্দেশনা।

বলা প্রয়োজন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে সওগাতে প্রকাশিত কিছু কিছু অভিমত সম্পর্কে হয়ত দ্বিমতের অবকাশ আছে তবে সে-সব ক্ষেত্রে কালের পরিপ্রেক্ষিত স্মরণ রাখা অত্যাবশ্যক।

সামগ্রিকভাবে সওগাতের অধিকাংশ লেখকের বিষয়ে অধিকার ও আলোচনায় স্বাচ্ছন্দ্য এক বিশিষ্ট উজ্জ্বল ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। এ ঐতিহ্য আমাদের জন্য গর্বের ও আনন্দের।

সওগাত বাঙালী মুসলমানের প্রথম আধুনিক মাসিক পত্রিকা। সাতচল্লিশ-পূর্ব-কালে এই পত্রিকার ভূমিকা ছিল সমাজসচেতন ও গঠনমূলক। সমাজ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্রিকা ছিল প্রগতিশীল ও ভবিষ্যৎমুখী। বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে এই পত্রিকা তাই অসামান্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। বাঙালীর সাহিত্যচর্চার ও চিন্তার বিশিষ্ট ধারক ও বাহক হিসেবে এই পত্রিকার গুরুত্ব অনন্যসাধারণ।

গ্রন্থপঞ্জী

ক. মূল পত্রিকা

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন। সম্পাদক। ১৩২৫-১৩৫৫, ১৯১৮-১৯৪৮। সওগাত। কলিকাতা [২ : ২ — ২ : ৫ এই চারটি সংখ্যার সম্পাদক : আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ও মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন]

খ. সহায়ক পত্রিকা

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন। সম্পাদক। ১৩৮৬, ১৯৭৯। অগ্রহায়ণ-পৌষ। ঢাকা : সওগাত প্রেস।

গ. সহায়ক গ্রন্থ

আনিসুজ্জামান। ১৯৬৯। মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

আবুল ফজল। ১৯৬১। সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা। ঢাকা : ইষ্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। ১৯৭০। আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ১৮৫৭-১৯২০। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন। পাণ্ডুলিপি। আত্মকথা।

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন। পাণ্ডুলিপি। বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ।

[এই গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে।]